প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।

জড়ের গুণ, গতির নিয়ম, ভার মধ্য, যন্ত্রবিজ্ঞান, বাষ্পীয় যন্ত্র।

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

হুগলি

বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
সপ্তমবার মুদ্রিত।

খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭৭।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বিজ্ঞান-শাস্ত্রের যে কি পর্য্যন্ত উন্নতি করিয়াছেন তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তাঁহাদিগের নির্ম্মিত বাষ্পীয়-যন্ত্র, তাড়িত-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি অতীব চমৎকারজনক ব্যাপার, সমস্তই তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব ক্ষমতার দেদীপ্যমান প্রমাণ হইয়া রহিয়াছে। এই পুস্তকের মুখবন্ধে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের নানা প্রকার ভেদেরও উল্লেখ করা গিয়াছে। অতএব এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাদৃশ বিস্তীর্ণ শাস্ত্রের যে অতি স্বল্পাংশ মাত্রেরই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য।

প্রথমে মানস ছিল যে, সমুদায় বাহ্য-বিজ্ঞানটী এক খণ্ডে মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করিব। কিন্তু ইংরাজী পদার্থ-তত্ত্বের ভাব সকল নিতান্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে গেলে পুস্তক অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। বিশেষতঃ বিবিধ প্রকার চিত্রের দ্বারা সেই সকল তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে হয়। চিত্র প্রস্তুত করায় ব্যয় বাহুল্য হওয়াতে, সুতরাং পুস্তকের মূল্যও অধিক হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে, জড়ের-গুণ, গতির-নিয়ম এবং ভার-মধ্য এই তিনটী প্রকরণ মাত্র একত্রিত করিয়া এই প্রথম খণ্ড প্রচারিত করিলাম। যন্ত্র বিজ্ঞান এবং বাষ্পীয় যন্ত্র সম্বলিত দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইতে লাগিল।

এই গ্রন্থের টীকা পর্য্যন্ত সমুদায় ভাগ গুলি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে হইলে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত য়ুক্লিদের ক্ষেত্র-তত্ত্ব এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রণীত পাটীগণিত সমুদায় উত্তমরূপে জানা আবশ্যক—নচেৎ টীকা গুলি পরিত্যাগ করিয়া পাঠ করিতে হইবে। মূল গ্রন্থে কোথাও দুরূহ গণিতের

সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই। অতএব বোধ হইতেছে, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা এই পুস্তক অনায়াসে পাঠ করিতে পারিবেন, আর যাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রথম পদার্থ-বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, বোধ হয়, এই পুস্তক তাঁহাদিগেরও কতক উপকারে আসিতে পারে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তক মুদ্রিত হইবার সময়ে হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্নের বিশিষ্ট সহায়তায় ইহার সংশোধন করা হইয়াছে।

এই পুস্তকের মূল্য এক টাকা স্থির করা গেল। কিন্তু কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ইহা পাঠ করিবার নিমিত্ত লইলে প্রতি কাপি বার আনা মূল্যে পাইতে পারিবেন।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ড অনেকানেক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে স্বল্পকালের মধ্যেই প্রথম বারের মুদ্রিত সহস্র খণ্ড পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। অতএব সংশোধিত করিয়া ইহা পুনর্মুদ্রিত করা গেল এবং প্রথম বারে ইহার মূল্য এক টাকা ছিল এবার দশ আনা মাত্র করা গেল।

ষষ্ঠ বারের বিজ্ঞাপন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্র-বিজ্ঞান ও বাষ্পীয় যন্ত্রের বিবরণ প্রথম খণ্ডের সহিত একত্রিত করিয়া মুদ্রিত করা গেল। সমুদায় পুস্তকের মূল্যও কিঞ্চিন্ন্যূন করিয়া এক টাকা করা গেল।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

মুখবন্ধ।

পদার্থ-তত্ত্ব বা পদার্থ-বিদ্যা এই হইয়া থাকিবে। কিন্তু উহা বলিলে কিরূপ অর্থের প্রতীতি হয়, অনুমান করি, তাহা সম্পূর্ণরূপে সকলের হৃদ্গত হয় নাই। অতএব সর্ব্ব প্রথমে পদার্থ-বিদ্যার স্বরূপ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

পদার্থ-বিদ্যা একটি সুমহান্ কল্পবৃক্ষ স্বরূপ। ইহার শাখ প্রশাখা সমুদায় জগদ্ব্যাপক। ইহার কোন কোন শাখা এমত অবনত হইয়া আছে, যে আমাদিগের পাদস্পৃষ্ট তৃণ লোষ্ট্রাদি মধ্যেও তাহার প্রসূনচয় প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে—অভিনিবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ইহার অপরাপর শাখা এমতা তুঙ্গ ও প্রশস্ত যে, অননুমেয় দূরবর্ত্তী নক্ষত্ররাশিও তাহাদিগের পুষ্পকলিকা-স্তবকরূপে প্রতীয়মান হয়। যখন আমরা উদ্ভিজ্জ-তত্ত্ব বা ভূতত্ত্ব নিরূপণে মনোযোগী হই, তখন আমাদিগের মন এই কল্পবৃক্ষের অধোগত শাখা কতিপয়কে অবলম্বন করিয়া ধরাপৃষ্ঠ স্পর্শ করে, অথবা তদ্গার্ভ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। যখন জ্যোতির্ব্বিদেরা গ্রহকক্ষার পরিমাণ, ধূমকেতুদিগের পথ নিরূপণ এবং নক্ষত্রদিগের

দূরত্বাদি অনুসন্ধান করেন, তখন তাঁহারাও এই বৃক্ষের শাখা বিশেষকে অবলম্বন করিয়া তাদৃশ দূরত্ব নির্ণয়নে সমর্থ হন। অতএব এই কল্পবৃক্ষের পরিমাণ নিশ্চয় করা সর্ব্বতোভাবে সকলেরই অসাধ্য।

কিন্তু যদিও পদার্থবিদ্যার কোন শাখা বিশেষে সম্যগ্‌ব্যুৎপত্তি লাভ করা এমত অসাধ্য ব্যাপার হয়, তথাপি সাক্ষাৎ পরিদৃশ্যমান যে ঈশ্বর-সৃষ্ট পদার্থ সকল তাহাদিগের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জানিতে অন্য কোন বিষয়ের অধিক জ্ঞান আবশ্যক করে না—প্রত্যুত তাহাই অন্য সকল জ্ঞানের মূল হয়। যাহা কিছু দেখা যায়, তাহারই কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়—এইটি এমন কেন, ঐটি কি জন্য ঐরূপ হইল —পরিদৃশ্যমান সকল বিষয়ে উন্মীলিত চক্ষে এবম্বিধ বিচার করিতে আরম্ভ করিলেই তত্ত্বজিজ্ঞাসু হওয়া যায় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে জিজ্ঞাসা করিলে অবশ্যই একপ্রকার প্রত্যুত্তর প্রাপ্তি হয়। অতএব গোটাকতক বহিবাঁধা কথা লইয়া আন্দোলন করিলেই পদার্থতত্ত্বজিজ্ঞাসু হওয়া হয় না। যথার্থ জিজ্ঞাসুর ভাব স্বতন্ত্র প্রকার। তিনি এই জগতের কোন ব্যাপারই সামান্য বোধ করিয়া অবজ্ঞা করেন না। সকল কার্য্যেরই কারণ আছে, এই সংস্কার তাঁহার মনে অতি প্রগাঢ়রূপে বদ্ধ থাকে। তিনি জানেন, অতি সামান্য ব্যাপারও যে কারণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, অতি আশ্চর্য্য অননুভূত-পূর্ব্ব ব্যাপার সকলও সেই কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে।

যখন জগদ্বিখ্যাত নিউটন্ আপনার উদ্যানস্থিত বৃক্ষ হইতে একটি ফল নিপতিত হইতেছে দেখিয়া মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ফল কি জন্য ভূমিতলে পতিত হইল?—নিউটন্ তখন পদার্থ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় গালিলিও যখন গির্জাঘরে বসিয়া একটা দোদুল্যমান ঝাড়ের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ভাবিতেছিলেন, এই ঝাড়টা প্রথমতঃ অনেক দূর ব্যাপিয়া আন্দোলিত হইতেছিল, এইক্ষণে ইহার আন্দোলন ক্রমশঃ অল্প স্থান লইয়া হইতেছে;

কিন্তু স্থানের ন্যূনাতিরেক হইলেও সকল আন্দোলনেই সময় প্রায় সমান লাগিতেছে, ইহার কারণ কি ?—গালিলিওর এই মানস প্রশ্ন যথার্থ পদার্থ-তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন। যখন সুবিজ্ঞ আর্কিমিডিস্ স্নান করিতে গিয়া জল পরিপূর্ণ টবে নিমগ্ন হইয়া মাত্র আপনাকে লঘু ভার বুঝিয়া মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, জলে পড়িলে সকল দ্রব্যই কিয়ৎপরিমাণে লঘু ভার হয় ইহার কারণ কি ?—তখন তিনি পদার্থ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন। কোন পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর হস্ত হইতে একটি পয়সা স্খলিত হইয়া গড়াইয়া যাইতেছিল। ঐ শিশু সমীপবর্ত্তী স্বীয় জনককে জিজ্ঞাসা করিল, পিতঃ পয়সা ত চেতন পদার্থ নয়, তবে গড়িয়া যায় কেন ?—ঐ শিশুও সেই সময়ে পদার্থ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য।

তবে কি এই সর্ব্বশেষোক্ত শিশুর এবং পূর্ব্বোক্ত কতিপয় মহামহোপাধ্যায়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই ? উহাঁদিগের সকলেরই কি মনের প্রকৃতি একপ্রকার ছিল ?—কদাপি নহে। উহাঁদের মানসিক প্রকৃতির পরস্পর ভেদ আছে। কিন্তু সেই ভেদের কারণ অধিক নয়। কেবল এক মাত্র কারণের নিমিত্ত উহাঁদিগের পরস্পর তারতম্য এত অধিক হইয়াছে। সেই কারণের নাম অভ্যাস। যাঁহারা দার্শনিক তাঁহারা সর্ব্বদাই আপনাদিগের মনে মনে ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অভ্যস্ত করিয়াছেন—শিশু কেবল একবার মাত্র তাদৃশ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। নিউটন, গালিলিও, আর্কিমিডিস্ প্রভৃতি মহোদয়েরা সর্ব্বদাই ঐ সকল ব্যাপারের অনুধাবন করিতেন। অতএব যখন তাঁহারা উক্ত মানসিক প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাহার সদুত্তরও পাইলেন। সুতরাং পদার্থ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইতে হইলে সর্ব্বদা ঐরূপ অভ্যাস আবশ্যক করে। যাহা যাহা দেখা যায়, তাহারই কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। যাহা যাহা শুনা যায় পরীক্ষা দ্বারা তাহাই সপ্রমাণ করিয়া লইতে হয়।

বস্তুতঃ পদার্থ-তত্ত্বানুশীলনের এই এক সুমহৎ গুণ যে, এই শাস্ত্রের সকল তথ্যই পরীক্ষা করিয়া লওয়া যায়। ইহার প্রমাণ প্রয়োগ সমস্ত প্রত্যক্ষ-মূলক। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অন্য সর্ব্ব প্রমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট—ইহাতে সন্দেহ স্থল অতি অল্প থাকে। অতএব পদার্থ বিদ্যাধ্যয়নের এক প্রধান গুণ এই যে ইহার আলোচনা করিতে করিতে বুদ্ধি-শক্তির সমধিক প্রাখর্য্য জন্মে। যাঁহারা পদার্থশাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাঁহারা কখনই কোন অপ্রামাণিক কল্পিত কথাকে প্রামাণিক বা প্রাকৃতিক বোধ করেন না—তাঁহাদিগের অনেক কুসংস্কার নিরাকৃত হইয়া যায়। যেমন বিভীষিকা-জনক রাত্রিচর সকল প্রাতরুদিত অর্কমণ্ডলের জ্যোতিঃ দর্শন মাত্র দিগ্দিগন্তরে পলায়ন করে এবং সমুদায় জীব জন্তু হর্ষোৎফুল্ল অন্তঃকরণে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, তেমনি পদার্থ-তত্ত্ব-জনিত স্বরূপ জ্ঞানালোক মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র ভ্রম প্রমাদ সমস্ত একবারে অন্তর্হিত হয়, এবং মনুষ্যের বুদ্ধি-বৃত্তিগণ স্ব স্ব নিয়োজিত কার্য্য সাধনে তৎপর হইয়া সাতিশয় আনন্দানুভব করাইতে আরম্ভ করে।

অপিচ, পদার্থ-বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা যেমন বুদ্ধিবৃত্তি সমস্তের স্ফূর্ত্তি হয়, তেমনি মনের ঔদার্য্যও জন্মে। যাহা এই বিদ্যার বিষয়ীভূত তাহা অতি বিস্তীর্ণ এবং প্রশস্ত। সেই সকলের অনুক্ষণ অনুধাবন দ্বারা মনুষ্যের মনও তাদৃশ প্রশস্ত হইবে, আশ্চর্য্য কি? যে ব্যক্তি পদার্থ-তত্ত্বগত অবিচলিত নিয়ম সমস্তের কার্য্য দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি কি ভয় লোভাদি সামান্য কারণ বশতঃ কদাপি প্রকৃত পথের বহির্ভূত হইতে পারেন?

পদার্থ-বিদ্যানুশীলন দ্বারা যেমন ধীশক্তির স্ফূর্ত্তি এবং মনের প্রাশস্ত্য জন্মে, তেমনি ইহা কর্ত্তৃক অন্তঃকরণের কোমলতা, সাধুতা এবং নির্ম্মলতাও সম্পাদিত হয়। যিনি যেমন দেখেন তিনি সেইরূপ হন। এই পরিদৃশ্যমান প্রকৃতি কার্য্যে নিয়মাতিরিক্ত ব্যাপার কিছুই

নাই। ইহার অধিকাংশই একান্ত শান্ত, সুন্দর এবং কমনীয়। অতএব যিনি সর্ব্বদা ইহার সহিত পরিচয় করেন, তাঁহার চিত্তও ইহার গুণ সকলকে আকর্ষণ করিয়া অবশ্যই শান্ত সুধীর এবং বিশুদ্ধ হয়।

অপিচ, পদার্থ-বিদ্যা সমস্তের অভ্যাস দ্বারা জগতের নিয়ম সকল অবগত হওয়া যায়। নিয়ম কি?—এই প্রশ্নের উত্তর করিবার চেষ্টা করিলেই বোধ হইবে, যাহাকে নিয়ম বলিতেছি তাহাকে সর্ব্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের ইচ্ছা বিশেষ বলিলেও বলা যায়। অতএব যে শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা জগদীশ্বরের ইচ্ছা জানিতে পারা যায় তাহা কি ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে অভিন্ন নহে?

[বিষয়ভেদ দ্বারা পদার্থ-বিদ্যার বিভাগ—জড়পদার্থ কি?—তাহা কয় প্রকার?—প্রাকৃতিক-কার্য্য কি?—তাহা কয় প্রকার?—তত্ত্বদ্বিষয়ক শাস্ত্র কি কি?]

কোন প্রশস্ত বা অপ্রশস্ত স্থলে বহির্গত হইয়া একবার চতুর্দ্দিগ্ নিরীক্ষণ করিলেই কত সংখ্যাতীত পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়! কিন্তু তন্মধ্যে কে সর্ব্বাগ্রে মনোযোগার্হ কিছুই নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। যেমন অপরিজ্ঞাত এবং বিশৃঙ্খলরূপে সম্বদ্ধ কোন পুস্তক হস্তে পড়িলে তাহা খুলিয়া তাহার কোথায় আদি কোথায় অন্ত কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া মৌনভাবে এবং ম্লানমুখে সেই পুস্তক রাখিয়া দিতে হয়, পরিদৃশ্যমান এই প্রকৃতি পুস্তকের প্রতি হঠাৎ অবলোকন করিলেও ঠিক সেইরূপ ঘটে। অতএব যদি এই পুস্তকের অধ্যায়, কল্প, কাণ্ড, ইত্যাদি বিভাগ থাকে, তাহা প্রকাশ করিতে পারিলে, ইহা পাঠ করণে কিঞ্চিৎ সাহস জন্মে; নচেৎ এতাবৎ প্রকাণ্ড বিষয় একবারে আয়ত্ত করা একান্ত অসম্ভব প্রযুক্ত সম্পূর্ণ

হতাশ হইতে হয়। কিন্তু এই জগৎরূপ গ্রন্থ মনুষ্যকৃত কোন গ্রন্থ অপেক্ষা যে বিশৃঙ্খল হইবে এমত সম্ভব নয়। ইহার প্রাকৃতিক বিভাগ অবশ্যই থাকিবে; অতএব সেই বিভাগ কি তাহা জানিতে চেষ্টা করা উচিত।

ঐ বিভাগ এইরূপে করা যাইতে পারে। দর্শন ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা অতি স্পষ্টজ্ঞান জন্মে। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেও যখন ভ্রম হয়, তখন আমরা স্পর্শ দ্বারা সেই ভ্রম সংশোধন করিয়া লই। বিশেষতঃ যাহাকে স্পর্শ করিতে পারি তাহা যেমন সসার এবং অনলীক বোধ হয়, অন্য কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুকে তাদৃশ সসার বা অনলীক বোধ হয় না। দেখ, কোন শিশুর সমক্ষে এক-খানি দর্পণ রাখিলে শিশু মুকুরে আপন শরীরের প্রতিবিম্ব দেখিয়াই নিবৃত্ত হয় না, শীঘ্র উহার পশ্চাৎ দিকে হস্তার্পণ করিয়া ঐ প্রতি-কৃতির স্পর্শানুভব করিতে চেষ্টা করে। অতএব যে সকল পদার্থ কেবল দর্শন-গ্রাহ্য না হইয়া স্পর্শেন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য হয়, তাহাদিগের একটি স্বতন্ত্র নাম কল্পনা করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ বোধ হইতেছে। ফলতঃ ঐ সকলেরই নাম জড় পদার্থ। যদি বল, বায়ুকে স্পর্শমাত্র করিতে পারি, উহাকে দেখিতে পাই না, এবং জ্যোতিষ্ক সমস্তকে কেবল দেখিতে পাই, স্পর্শ করিতে পারি না, তবে বায়ু এবং জ্যোতি-ষ্কাদি কি জড় পদার্থ নয়? তাহার উত্তর এই যে, উহারা উভয়ে-ন্দ্রিয়ের গোচর-যোগ্য এমত প্রমাণ হয় বলিয়াই উহারা পরিশেষে জড় পদার্থের মধ্যে বিবেচিত হইয়া থাকে।

যাহা স্পর্শেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, অপর কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, অথবা কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়-মাত্রের গ্রাহ্য, তাহাকে জড় পদার্থ না বলিয়া প্রাকৃতিক-কার্য্য বলা যায়। অলোক, শব্দ, তাপ ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেবল দর্শনের, কেহ কেবল শ্রবণের, কেহ বা কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, অতএব উহারা জড় পদার্থ নয়—প্রাকৃতিককার্য্য।

এই প্রকারে বিষয় ভেদ করিয়া পদার্থ-বিদ্যাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ইহার যে ভাগে জড়পদার্থ সমস্তের প্রকৃতি নির্ণীত হয় তাহার নাম প্রাকৃতিক-ইতিবৃত্ত, আর যে অংশ পাঠ করিলে প্রাকৃতিক কার্য্য বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান কহে।

পুনশ্চ, বিবেচনা করিতে হইবে যে জড় পদার্থের মধ্যে কোন প্রকার-ভেদ আছে কি না। যদি থাকে, তবে প্রাকৃতিক-ইতিবৃত্তও অনেক অংশে বিভক্ত হইবে। মৃত্তিকা বা অন্য কোন অকৃত্রিম জড়-পদার্থ লইয়া বিবেচনা কর। দেখ, এই মৃত্তিকা যে প্রকার, এবম্প্রকার সকল মৃত্তিকার গুণই ইহাতে আছে। এই অর্দ্ধ তোলা পরিমিত গৈরিকের যে গুণ, গৈরিকময় পর্ব্বতেরও সেই সমুদায় গুণ আছে। এই উপল-খণ্ডের যে প্রকৃতি, এতাদৃশ অতি বৃহৎ শিলা রাশিরও সেই প্রকৃতি। যে ব্যক্তি এক বিন্দু পরিমিত এই সকল দ্রব্যের গুণ পরীক্ষা করিয়াছে, সে ইহার পর্ব্বত পরিমাণ রাশিরও সমুদায় গুণ জানিয়াছে। ইহাদিগের সমুদায় শরীর সম-প্রকৃতিক।

কোন বৃক্ষের একটি পত্র লইয়া তাহার আকার প্রকার সমুদায় পরীক্ষা করিয়া ঐটি যে বৃক্ষের পত্র সেই বৃক্ষের মুল কেমন, তাহার কাণ্ড কেমন, তাহার পুষ্প কি প্রকার, তাহার ফল কীদৃশ ইত্যাদি কোন প্রশ্নের উত্তর করিতে পারা যায় না। অতএব পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকা, প্রস্তর, গৈরিকাদি হইতে ইহাদিগের এই প্রভেদ সপ্রমাণ হইতেছে যে, উহারা যেমন সম-প্রকৃতিক, পত্র পুষ্পাদি তদ্রূপ নহে—অর্থাৎ উদ্ভিজ্জদিগের যেমন নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, পূর্ব্বোক্ত পার্থিব জড় সমস্তের তাদৃশ কিছুই নাই।

অপিচ দেখ, পশু পক্ষ্যাদি প্রাণী সর্ব্বদা এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে না, শীঘ্র শীঘ্র স্থান পরিবর্ত্তন করে। যদি তাহাদিগকে ধরিতে যাই তাহারা ভীত হইয়া পলায়ন করে। কিন্তু কোন বৃক্ষের পুষ্পচয়ে

করিয়া আনিতে গেলে উহা কদাপি পলায়নের চেষ্টা করে না। বস্তুতঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সত্ত্বেও উহা সর্ব্বতোভাবে চলৎশক্তি বিহীন।

অতএব, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রহিত প্রস্তর গৈরিকাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট, কিন্তু গতি-শক্তি-বর্জ্জিত বৃক্ষাদি, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গতি-শক্তি সম্পন্ন পশু পক্ষ্যাদি, এই ত্রিবিধ দ্রব্য আমাদিগের দর্শন এবং ত্বক্ উভয়েন্দ্রিয়ের গোচর হইতেছে—সুতরাং জড় পদার্থ তিন প্রকার হইল।

প্রাকৃতিক-ইতিবৃত্তও এইরূপ বিষয় ভেদানুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার যে অংশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রহিত এক প্রকৃতিক জড় সমস্তের বিবরণ থাকে, তাহার নাম খনিজ-বিদ্যা। ধাতু—স্বর্ণ, লৌহ, রজতাদি; প্রস্তর—মাণিক্যাদি;—পার্থিব—মৃত্তিকা, খড়ি গৈরিকাদি;—এই সমস্ত দ্রব্য খনিজ-বিদ্যার বিষয়ীভূত। উদ্ভিজ্জ সমস্তের বর্ণন ও বিবরণ যে শাস্ত্রে থাকে, তাহার নাম উদ্ভিজ্জ-বিদ্যা; এবং স্বেচ্ছা-গতি সম্পন্ন জড় সমস্তের বিবরণ যে শাস্ত্র দ্বারা অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম প্রাণি-বিদ্যা।

যেমন প্রাকৃতিক-ইতিবৃত্ত ত্রিধা হইল, সেইরূপ বিষয় ভেদবশতঃ প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান ও ত্রিবিধ হইয়াছে। কোন কোন প্রাকৃতিক-কার্য্য এমত যে, যাহা হইতে উহারা উৎপন্ন হয়, ঐ উৎপত্তি-নিবন্ধন সেই সকল বস্তুর প্রকৃতির অন্যথাভাব হয় না। স্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করিয়া আলোকের গমন, হস্ত স্খলিত দ্রব্যাদির ভূমিতলে পতন, বস্তুদ্বয়ের পরস্পর অভিঘাত দ্বারা শব্দের উৎপত্তি, ইহারা এইরূপ কার্য্য। এতাদৃশ কার্য্যসমস্ত বস্তুর আন্তরিক কোন ভাবের পরিবর্ত্ত করিয়া ঘটে না, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে বাহ্য-কার্য্য কহে। এই হেতু যে শাস্ত্র দ্বারা ইহাদিগের প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার নাম বাহ্য-বিজ্ঞান।

আর কতকগুলি কার্য্য এরূপ যে, তাহাদের উৎপত্তি নিবন্ধন প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। যথা পারদ এবং গন্ধক এই ধাতুদ্বয়ের মিশ্রণে

হিঙ্গুল বা কজ্জলি উৎপন্ন হয়—অগ্নি সংস্কারে কাষ্ঠাদি দাহ্য পদার্থ সকল আলোক এবং তাপ বিকাশিত করিয়া ভস্মমাত্রাবশেষ হইয়া যায়—এবং বায়ু বিশেষ * যোগে লৌহ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়া চূর্ণনীয় হয়, অর্থাৎ লৌহে মড়িচা পড়ে। এতাদৃশ কার্য্য দ্বারা দ্রব্য সমস্ত রসান্তর বা গুণান্তর প্রাপ্ত হয়, এই জন্য এমত সকল কার্য্যকে রাসায়নিক কার্য্য কহে। যে বিজ্ঞান-কাণ্ড দ্বারা এমত কার্য্য সকলের প্রকৃতি অবধারিত হয়, তাহার নাম রাসায়নিক-বিজ্ঞান।

সজীব পদার্থ সমস্তের শরীরে যে সকল রাসায়নিক বা অতি-রাসায়নিক কার্য্য লক্ষিত হয় তাহাদিগের নাম শারীর-কার্য্য। যথা মূল দ্বারা রস গ্রহণ করিয়া উদ্ভিজ্জগণ বর্দ্ধিত হয়—আহার গ্রহণ দ্বারা প্রাণি সমস্ত পরিপুষ্ট হয়—নিশ্বাস-গৃহীত বায়ুর কিয়দংশ † আমাদিগের শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে লোহিতবর্ণ করে এবং প্রাণি-শরীরের কোন ভাগ ক্ষত হইলে তাহা পুনর্ব্বার সংশোধিত হয়, ইত্যাদি শরীরগত কার্য্য যে বিজ্ঞান শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তাহার নাম শারীর-শাস্ত্র। সেই শাস্ত্র দুই প্রকার, উদ্ভিজ্জ-শারীর এবং প্রাণি-শারীর।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, প্রথমে জড় পদার্থের যে প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, কি খনিজ, কি উদ্ভিজ্জ, কি প্রাণিশরীর, জড় পদার্থ মাত্রেরই কতকগুলি ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণ এবং কতকগুলি গুণ পরস্পর বিভিন্ন। সুতরাং বিশেষ বিশেষ গুণের পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে সাধারণ গুণ সমস্তের ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। সেইরূপ, প্রাকৃতিক-কার্য্য মাত্রেরও কতকগুলি ধর্ম্ম ব্যাপক এবং কতকগুলি ধর্ম্ম

* অম্লকর বায়ু—ইংরাজি আক্সিজেন।

† অম্লকর বায়ু।

ব্যাপ্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব প্রাকৃতিক-কার্য্য মাত্রের ব্যাপক ধর্ম্মগুলির বিবরণ অগ্রে অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ফলতঃ এই জন্যই জড় পদার্থের নির্বিশেষ গুণ সমস্ত এবং প্রাকৃতিক-কার্য্য মাত্রের অন্তর্নিবিষ্ট প্রতিরূপ সাধারণ ক্রিয়া, পদার্থ বিদ্যাধ্যয়নের উপক্রমেই অধীত হইয়া থাকে। ঐ দুই বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ না করিলে কি প্রাকৃতিক-ইতিবৃত্তের, কি প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের, তাহারও শাখা বিশেষ অধ্যয়নে সম্যক্ অধিকার হয় না।

পদার্থবিদ্যা এই যে সমস্ত অংশে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা উত্তম রূপে স্মৃতিগোচর করিবার অভিপ্রায়ে নিম্নে উহার কতিপয় শাখা প্রশাখা সমেত একটী আদর্শ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

পদার্থ বিদ্যা।

জড়ের গুণ এবং গতির নিয়ম।

প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত।	প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান।	প্রাকৃতিক বিজ্ঞানশাখা।
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিরহিত সমপ্রকৃতিক জড়-পদার্থ-বিদ্যা, অথবা খনিজ-বিদ্যা।	বস্তুর-প্রকৃতির-বিকার না জন্মায়-এমত প্রাকৃতিক কার্য্য-বিজ্ঞান অথবা বাহ্য-বিজ্ঞান।	(১) যন্ত্রবিজ্ঞান। (২) তারল্যবিজ্ঞান। (৩) বায়বীয়বিজ্ঞান। (৪) শব্দ বিজ্ঞান। (৫) তাপ বিজ্ঞান। (৬) দৃষ্টি বিজ্ঞান।
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট কিন্তু স্বেচ্ছা-গতি-শক্তি-বর্জ্জিত জড়-পদার্থ-বিদ্যা, অথবা উদ্ভিজ্জ বিদ্যা।	বস্তুর-প্রকৃতির-বিকার জন্মায় এমত-প্রাকৃতিক কার্য্য-বিজ্ঞান, অথবা রাসায়নিক-বিজ্ঞান।	(১) অব্যূঢ়-পদার্থ-রসায়ন। (২) ব্যূঢ়-পদার্থ-রসায়ন।
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট এবং স্বেচ্ছা-গতিশক্তি বিশিষ্ট পদার্থ বিদ্যা অথবা প্রাণিবিদ্যা।	সজীব-জড়পদার্থের শরীরগত কার্য্য-বিজ্ঞান, অথবা শারীর বিজ্ঞান।	(১) উদ্ভিজ্জ শারীর। (২) প্রাণি শারীর।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

প্রথম অধ্যায়।

[ইন্দ্রিয়দ্বারা কি জানা যায় ? জড় পদার্থ আছে কি প্রকারে সিদ্ধ হয় ?
জড়ের স্বতঃসিদ্ধগুণ কি কি ? পরীক্ষাসিদ্ধগুণ কি কি ?
অনুমান সিদ্ধগুণ কি কি ?]

আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা দ্রব্যের গুণ জানিতে পারি। চক্ষুদ্বারা কাহার কিরূপ, স্পর্শ দ্বারা কে বন্ধুর কে মসৃণ এবং কে উষ্ণ কে শীতল, ইহা সমুদায় অবগত হওয়া যায়। সেইরূপ, শ্রবণ দ্বারা কাহা হইতে কেমন শব্দ হয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা কাহার কেমন ঘ্রাণ ও রসনা দ্বারা কাহার কেমন স্বাদ ইত্যাদি জ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয় দ্বারা এই মাত্র জানা যায়—ইহার অতিরিক্ত কিছুই জানা যায় না।

কিন্তু যে ইন্দ্রিয় দ্বারা হউক না কেন, যখন আমরা কোন গুণের প্রত্যক্ষ করি সেই সময়েই ঐ গুণের আধার যে কিছু অবশ্যই আছে এমত প্রতীতি জন্মে। কি জন্য যে ঐ প্রকার প্রতীতি জন্মে তাহা বলিতে, এবং ঐ প্রতীতি যে অবশ্যই সত্য হইবে ইহাও বিচার দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারা যায় না। কিন্তু বিচার দ্বারা সিদ্ধ না হউক, ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা জানা যায় সেই গুলি কেবল গুণ মাত্র এবং ঐ সকল গুণের অবশ্যই কোন আশ্রয় আছে, এতাদৃশ বোধ আমাদিগের প্রকৃতি-সিদ্ধ-সংস্কার-মূলক বলিতে হইবে। সুতরাং সহস্র যুক্তি মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু এই প্রতীতির যে কদাপি অন্যথা হইবে এমত বিশ্বাস হয় না।

ফলতঃ আমরা ঐ সর্ব্বজনীন নৈসর্গিক সংস্কার বশতঃ যে যে আধারে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ সমস্ত আছে বোধ করিয়া থাকি, সেই আধারেরই নাম জড়। অতএব এমত বলা যাইতে পারে যে, জড় স্বয়ং কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, ইহার গুণ সমস্তই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য।

জড় পদার্থের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-গুণ তিন প্রকার *। তাহার মধ্যে প্রথম প্রকারের অন্তর্গত যে দুইটী গুণ আছে তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এমন কি, সেই দুইটী গুণ নাই, অথচ কোন্ জড় পদার্থ আছে ইহা মনেও ভাবনা করিতে পারা যায় না। এই হেতু ঐ দুই গুণকে জড়ের স্বতঃসিদ্ধগুণ বলা গিয়া থাকে। তাহার একটীর নাম বিস্তৃতি। সকল জড় পদার্থেরই বিস্তার অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং বেধ থাকে। কেবল দীর্ঘ অথবা দীর্ঘ এবং প্রস্থমাত্র, কিঞ্চিন্মাত্রও বেধ-বিশিষ্ট নয় এমত জড় পদার্থ কিছুই নাই, এবং এমন যে কোন জড় থাকিতে পারে তাহা অনুভব করাও যায় না। জড়ের স্বতঃসিদ্ধ দ্বিতীয় গুণের নাম স্থানাবরোধকতা। এই গুণ থাকাতে জড় পদার্থ যে স্থানে থাকে সেই স্থান সমুদায় রুদ্ধ করিয়া রাখে। সুতরাং দুইটী জড় পদার্থ কোন রূপেই এক সময়ে এক স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে না। ভাবিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, কদাপি জড়ের এই গুণের অন্যথাভাব হওয়া সম্ভব নহে।

জড়ের দ্বিতীয় প্রকার যে সকল গুণ তাহা এমন সহজে বোধগম্য হয় না। যদি আমাদিগের কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় মাত্র থাকিত এবং আমরা সচেষ্ট হইয়া জড় পদার্থের প্রতি স্ব স্ব দৈহিক বল-প্রয়োগ করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে কদাপি এই সকল গুণ অবধারিত হইত না। যেমন চক্ষু না থাকিলে কোন্ দ্রব্যের কেমন

* স্বতঃ সিদ্ধ, পরীক্ষা সিদ্ধ ও আনুমানিক

বর্ণ কিছুই বুঝা যায় না, তেমনি সমুদায় ইন্দ্রিয় সত্বেও যদি আমাদিগের দৈহিক বল না থাকিত (অথবা আমরা কার্য্য বিশেষে দৈহিক বলের প্রয়োগ করিতেছি এমত বুঝিতে না পারিতাম) তবে কোন প্রকারেই এই গুণ গুলির পরীক্ষা হইতে পারিত না। এই হেতু এই সকল গুণকে জড়ের পরীক্ষা-সিদ্ধ গুণ বলা যায়।

তাহার মধ্যে প্রথম গুণের নাম নিশ্চেষ্টত্ব। জড় পদার্থ স্থানাবরোধক—অর্থাৎ উহা যে স্থানে থাকে, সেই স্থান রুদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু আমরা বল দ্বারা তাহাকে পূর্ব্বস্থানচ্যুত করিয়া স্থানান্তরিত করিতে পারি। তাহা করিলেই উহার গতি হয়। অর্থাৎ জড়কে নাড়িলে নড়ে। সকল জড় পদার্থেরই যে এই গুণ আছে ইহাতে আমাদিগের এমত দৃঢ় প্রতীতি হইয়া গিয়াছে যে, যদিও কদাচিৎ দেখিতে পাই যে, বল প্রয়োগ করিয়া আমরা কোন জড়ের গতি জন্মাইতে পারিলাম না, তথাপি বিবেচনা করি যে, কোন শক্ত্যন্তর ঐ স্থলে আমাদিগের প্রতিকূল হইয়াছে, নচেৎ অবশ্যই গতি জন্মিত।

যেমন আমরা বল দ্বারা জড় পদার্থের গতি উৎপাদন করিতে পারি, তেমনি উহার গতি আরম্ভ হইলে আবার প্রতিকূল বল দ্বারা সেই গতির নিবারণ করিতেও পারি। এই হেতু এমত সংস্কার হইয়া গিয়াছে যে, জড়ের গতি উৎপাদন করিতে বলের যেমন আবশ্যকতা উহার গতি নিবারণার্থেও বলের সেই রূপ প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ জড় পদার্থ মাত্রই নাড়িলে নড়ে এবং থামাইলে থামে। কিন্তু তাহারা আপনা হইতে, অর্থাৎ অপরের বল প্রয়োগ ব্যতিরেকে, সচল বা স্থির হইতে পারে না।

জড় পদার্থ মাত্রেরই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বিস্তৃতি আছে। কিন্তু আমরা নানা প্রকারে বল প্রয়োগ করিয়া কখন তাহার আয়তন হ্রস্ব ও কখন বা বর্দ্ধিত করিতে পারি। জড়ের যে গুণ থাকাতে উহার প্রতি কোন প্রকার বল পয়োগ করিলে জড় স্বল্পায়তন

হইয়া যায়, সেই গুণের নাম সঙ্কোচ্যতা, আর যে গুণ থাকাতে বল প্রয়োগ দ্বারা উহার আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত হয়, সেই গুণের নাম বিস্তার্য্যতা।

কোথাও কোথাও জড় পদার্থকে বল দ্বারা সঙ্কুচিত অথবা বিস্তৃত করিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা পুনর্ব্বার আপনার পূর্ব্বায়তন প্রাপ্ত হয়। যে গুণের দ্বারা এইরূপ হয়, তাহার নাম স্থিতিস্থাপকতা।

যথোপযুক্ত বল-প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জড় পদার্থের যেরূপ আকৃতি পূর্ব্বে ছিল, সেরূপ থাকে না। যেমন পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে উহা কোথাও বিস্তৃত হয়, কোথাও বা সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু স্থলবিশেষে বল-প্রয়োগ করিলে উহা নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। জড় পদার্থের এই গুণের নাম বিভাজ্যতা।

এই সকল গুণ থাকাতে আমরা সহজেই জড় পদার্থকে সচ্ছিদ্র বোধ করি। কারণ, সচ্ছিদ্র না হইলে উহা কদাপি সঙ্কুচিত বা কোন বস্তু দ্বারা বিদ্ধ হইতে পারিত না। কিন্তু উহা সঙ্কুচিত এবং বিদ্ধও হইয়া থাকে, অতএব ইহার এই একটী স্বতন্ত্র গুণ অবধারিত হইল। এই গুণের নাম সচ্ছিদ্রতা।

জড়ের তৃতীয় প্রকার গুণ আমাদিগের অনুমানসিদ্ধ। কিন্তু অনুমানসিদ্ধ বলিয়া যে ঐ গুণগুলি সত্য নয়, এমত নহে। এই অনুমান সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ-মূলক এবং সর্ব্ব প্রকার পরীক্ষা দ্বারা সুসিদ্ধ। বিশেষতঃ ঐ সকল অনুমান দ্বারা জড়ের যে যে গুণ কল্পনা করা গিয়াছে, সেই সকল কল্পনা দ্বারা বহুবিধ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ব্যাপারের অতি সহজে মীমাংসা হইতেছে এবং ঐ সকল কল্পনা করিবার পূর্ব্বেও যাহা জানা না ছিল সেই সকল প্রকৃতিকার্য্যের কারণ অনায়াসে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—তাহার সহিত পূর্ব্ব কল্পনার কোন বিরোধ হইতেছে না, সুতরাং এই কল্পনা সমস্ত ভ্রমমূলক হইবে এমত কদাপি সম্ভবপর নহে।

জড়ের এই রূপ কল্পিত গুণ দুই। তাহার প্রথমটীর নাম পরমাণু-সংহতি, অর্থাৎ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু একত্রিত হইয়া স্থূল জড় সমুদায় জন্মায়, এই নিমিত্ত ইহাকে জড়ের স্বরূপ বলিলেও বলা যায়। কিন্তু জড় যে পরমাণু-সংহতি ইহা, অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই ইহাকে জড়ের অনুমান-সিদ্ধগুণ বলা গেল। অনুমান-সিদ্ধ দ্বিতীয় গুণের নাম আকর্ষণ। এই গুণ থাকাতে উক্ত পরমাণু সমস্ত অন্যোন্যের প্রতি স্ব স্ব অভিমুখে বল প্রয়োগ করে।

এই দুই গুণের প্রকৃতি ক্রমশঃ সবিশেষ কথিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[পরমাণুর অনুমান কি প্রকার ?—পরমাণুর আকার কেমন ?।]

কোন জড় পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিলেই বোধ হয় তাহাকে অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক খানি কাগজ কাটিয়া দুই খানি করিতে পারা যায়, আবার সেই অর্দ্ধেরও অর্দ্ধাংশ করা যায়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ কর্ত্তন করিয়া তাহাকে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে যে, সেই অংশ সমস্ত দৃষ্টির অগোচর হয়। কিন্তু দৃষ্টির অগোচর হয় বলিয়াই তাহারা যে অবিভাজ্য হয়, এমত নহে। বোধ হয়, তাদৃশ দৃষ্টি-শক্তি এবং তাদৃশ যন্ত্রাদি সম্পন্ন হইলে আমরা ঐ সূক্ষ্মাংশ সকলকে আরও সূক্ষ্মতর করিতে পারিতাম।

কিন্তু এই রূপে বিভাগ করিয়া যাইতে যাইতে অবশ্যই ইহার পরিণাম প্রাপ্ত হইতে হয়, অর্থাৎ জড় পদার্থ এমত সূক্ষ্ম অংশে

বিভক্ত হইয়া যায় যে, তাহা আর বিভাগ্য যোগ্য হয় না। কোন ব্যক্তি কোন কালে কোন দ্রব্যের তাদৃশ সূক্ষ্ম অংশ পর্য্যন্ত বিভাগ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু জড়-পদার্থ আছে এমত স্বীকার করিতে হইলেই ঐ প্রকার বিভাগেরও একটী পরিসীমা আছে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ইহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, কোন নির্দ্দিষ্ট আয়তন-বিশিষ্ট জড়কে যদি অনন্ত অংশে বিভাগ করা যাইত, তবে ঐরূপ বিভাগ করিতে করিতে উহার শেষে কিছুই থাকিত না *। কিন্তু যদি পূর্ব্বে কিছুই না থাকে তবে পরেও কিছু থাকিতে পারে না। সুতরাং জড়ের উৎপত্তিই অসম্ভব হইয়া উঠে। এইরূপ বিবেচনা দ্বারা পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সকল জড়-পদার্থই অতি বহুসংখ্যক অংশে বিভাজ্য বটে, কিন্তু কেহই অনন্ত অংশে বিভাজ্য নয়। তাঁহারা জড়-পদার্থের ঐ সকল অতি সূক্ষ্ম অবিভাজ্য অংশকে পরমাণু কহেন।

কিন্তু ঐ সকল পরমাণু যে কত ক্ষুদ্র এবং তাহাদিগের আকারই বা কি, ইহা কোন প্রকারে প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। কেমন করিয়া পারা যাইবে? স্বর্ণ কষিবার সময় কষ্টি পাথরে স্বর্ণের যে দাগ পড়ে তাহারও অসংখ্য অংশ হইতে পারে। সেই সকল অংশ কোন প্রকারেই আমাদিগের ত্বগিন্দ্রিয় গোচর হয় না। কিন্তু তাহারাও এক একটী অনেক পরমাণু সমষ্টি।

ত্বক অপেক্ষা দর্শনেন্দ্রিয় সূক্ষ্ম, আবার দর্শন অপেক্ষাও ঘ্রাণে-ন্দ্রিয় অধিক সূক্ষ্ম। অর্থাৎ যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না তাহা-

* গণিতে যে প্রকারে বিচার করা যায় এস্থলে সেইরূপ বিচার করিলে কিছু সহজে তাৎপর্য্যার্থ বোধ হইতে পারে। অর্থাৎ ভাগক্রিয়ায় ভাজক যত বৃদ্ধি পায় ভাগফল ততই ন্যূন হয়, সুতরাং ভাজক যার পর নাই এমত বৃদ্ধি পাইলে অর্থাৎ অনন্ত হইলে ভাগফল যার ন্যূন নাই এমত হইবে, অর্থাৎ শূন্য হইবে তাহার সন্দেহ কি?

রও ঘ্রাণ গ্রহণ করা যায়। বস্তুতঃ দ্রব্যের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ আসিয়া আমাদিগের নাসা রন্ধ্রস্থিত কতকগুলি স্নায়ু স্পর্শ করিলেই দ্রব্যের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। আতর, গোলাব, মৃগনাভি প্রভৃতি সুগন্ধি সামগ্রীর যে ঘ্রাণ পাওয়া যায়, তাহার এই কারণ। অতএব এক বিন্দু প্রমাণ আতর বস্ত্রে মাখিলে যদি তাহার গন্ধ দুই তিন দিন অবধি একটী গৃহ আমোদিত করিয়া রাখে, তবে বিবেচনা কর সেই আতর বিন্দু কত অসংখ্যভাগে বিভক্ত হইয়াছে, কিন্তু সেই সকল ভাগের এক একটী যে এক একটী পরমাণু তাহারও প্রমাণ নাই, সুতরাং তাহারাও এক একটী পরমাণুপুঞ্জ হইতে পারে। কোন কোন শিল্প কার্য্যে দ্রব্যের যেরূপ সূক্ষ্ম বিভাগ করা যায় তাহাও বিবেচনা করিয়া বুঝিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। পূর্ব্বে ঢাকা প্রদেশীয় তন্তু-বায়েরা ৫০০ | ৬০০ নম্বরের সূত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বস্ত্র নির্ম্মাণ করিত। কথিত আছে, ঐ সকল বস্ত্র এমত সূক্ষ্ম হইত যে, প্রাতঃ-কালে শিশির সিক্ত ঘাসের উপর তাহার এক খণ্ড বিস্তৃত করিয়া দিলে সহজে দৃষ্টিগোচর হইত না।

সূক্ষ্ম কাচের নলের দুই দিক ধরিয়া সাতিশয় অগ্নির উত্তাপে কোমল করত ক্রমে ক্রমে টানিতে থাকিলে উহাকে এমত সরু করা যায় যে, সেই কাচনল ঠিক এক গাছি রেসমের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং কোমল হয়। কিন্তু জল দিয়া দেখিলেই বোধ হয় তাহারও ভিতর ছিদ্র থাকে। ঐ নল যদি কোমল না হইত তবে উহাকে লোমকূপ দিয়া অনায়াসে শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করা যাইত—তাহাতে বেদনা বা ক্ষত হইত না।

প্লাটিনুম নামক এক প্রকার ধাতু আছে। ঐ ধাতুর অতি সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা এমত সূক্ষ্ম হয় যে, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দর্পণের ভিতর দিয়া দেখিলেও উর্ণাভের সূত্র অপেক্ষা অধিক স্থূল দেখায় না। উলাষ্টন সাহেব ঐ তার প্রস্তুত করিবার রীতি প্রকাশ

করেন। স্বর্ণকারেরা যে প্রকারে গুণো টানিয়া স্বর্ণ রৌপ্যাদির তার প্রস্তুত করে ঐ সাহেবও প্রথমে সেই প্রকারে প্লাটিনমের তার প্রস্তুত করিতেন। তাহার পর ঐ সূক্ষ্ম তারকে দ্রব রৌপ্যে মগ্ন করিলেই উহার চতুর্দ্দিকে রৌপ্য লাগিয়া উহা কিঞ্চিৎ স্থূল হইত। পুনর্ব্বার সেই রৌপ্য মণ্ডিত তার লইয়া গুণো টানিয়া তাহাকে আরও সূক্ষ্ম করিতেন। বারম্বার এইরূপ করিলেই ভিতরের প্লাটিনম তার ক্রমে অত সূক্ষ্ম হইত। পরিশেষে ঐ তারকে লইয়া মহা-যবক্ষারাম্ল * নামক এক প্রকার দ্রাবকে মগ্ন করিলেই উহার উপরকার রৌপ্য দ্রব হইয়া ভিতরের প্লাটিনম তার প্রকাশ হইত। ঐ তার এমত সূক্ষ্ম যে, তেমন দেড় শত তার একত্রিত করিলে এক গাছি সূক্ষ্ম রেসমের সূত্রের ন্যায় স্থূল হয় এবং আড়াই সের প্লাটিনমের ঐরূপ তারে সমুদায় পৃথিবীর পরিধি পরিবেষ্টিত হইতে পারে।

কিন্তু প্রকৃতি-কার্য্যেই এই বিষয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অণুবীক্ষণ দ্বারা এমত সকল কীটাণু দৃষ্ট হইয়াছে যে, তাহাদিগের ১০ লক্ষকে একত্র করিলে এক বালুকারেণু অপেক্ষা বড় দেখায় না। কিন্তু ঐ সকল জীবেরও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সমুদায় আছে, তাহারাও পানভোজন করে। সুতরাং তাহাদিগেরও অন্ত্র, পাকস্থলী, ইন্দ্রিয়-দ্বার সমুদায় আছে। তাহারাও আমোদ প্রমোদ করে অন্যান্য কীটাণুকে ভক্ষণ করে, এবং আমাদিগের শরীরের রক্তে যেরূপ কীটাণু সমস্ত বাস করে উহাদিগের শোণিতেও সেই রূপ তদপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর অণু-কীট সকল বাস করে! উহারা কেমন ক্ষুদ্র ?—কিন্তু উহারাও বহু পরমাণুর সমষ্টি !।

যদি পরমাণু এমত ক্ষুদ্র হইল তবে সেই পরমাণুর আকার প্রকার কখনই প্রত্যক্ষ গোচর হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব এমত

* ইহাকে ইংরাজীতে নাইট্রিক্ আসিড্ বলে।

নয় যে, কোন বৈষম্য দেখিয়া একেবারে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। যতই কেন কঠিন বিষয় হউক না, মনুষ্যেরা তাহার এক প্রকার মীমাংসার চেষ্টা অবশ্যই করেন। এই বিষয়েও সেইরূপ করিয়া এক প্রকার সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সমুদায় স্পষ্ট বুঝিতে হইলে গণিত এবং রাসায়নিক বিজ্ঞানে সমীচীন ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। অতএব এই স্থলে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য মাত্র প্রকাশ করা যাইতেছে।

দেখ, স্থপতিরা কোন নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যাপৃত হইবার অগ্রে সেই নির্ম্মাণকর্ম্মের উপযুক্ত দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া থাকে। যদি গোলাকার স্তম্ভ গ্রথিত করিবার আবশ্যকতা হয়, তবে তাহারা প্রথমে ইষ্টকগুলিকে কাটিয়া গোল গোল করিয়া লয়। অপিচ ঐ প্রকার ইষ্টকে যে স্তম্ভ গ্রথিত হয়, সেই স্তম্ভ ভাঙ্গিতে গেলেও উহা সহজেই গোল গোল হইয়া ভাঙ্গে—অন্য কোন প্রকারে তেমন সহজে ভাঙ্গে না। অতএব যদি কি প্রকার ইষ্টকে কোন্ স্তম্ভ নির্ম্মাণ হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে জানা না থাকে, তথাপি যদি দেখিতে পাই যে, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিলে প্রত্যেক খণ্ডই গোলাকার হয়, তবে অবশ্যই অবধারিত করিতে পারি যে, ঐ স্তম্ভ গোল গোল ইষ্টকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আবার দেখ, মনুষ্যেরা ইষ্টকের আকার ঘন-চতুষ্কোণ করিয়া থাকে; সর্ব্বদা ঐরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশাকার ইষ্টক দ্বারা ঘন-চতুষ্কোণ প্রাচীরাদির নির্ম্মাণ অতি অনায়াসেই নির্ব্বাহিত হয়। প্রাচীর সমস্ত ভাঙ্গিলেও কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ যত খণ্ড হয় সকলই ঘন-চতুষ্কোণের ন্যায় হয়।

অতএব নিশ্চিত হইল, যদি কোন দ্রব্য সর্ব্বদা আপনা হইতেই কোন নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে, এবং যদি তাহাকে ভাঙ্গিলে তাহার সকল খণ্ডই উক্ত নির্দ্দিষ্ট আকার সম্পন্ন হয়, তবে ঐ দ্রব্য যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশের সংযোগে নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই সকল সূক্ষ্মভাগও তদাকার হইবে।

পণ্ডিতেরা এই সাংদৃষ্টিক ন্যায়ের অনুগামী হইয়া কোন্ দ্রব্যের পরমাণুর কি আকার তাহা অনুমান করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রকার কঠিন ও তরল এবং অনেকানেক বায়বীয় পদার্থের বিশেষ বিশেষ আকারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানা জম্মে। চিনি লবণ অথবা অন্য কোন দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা কর। প্রথমে ঐ দ্রব্যের অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া উহাকে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেও। পরে সেই জলে জ্বাল দিয়া ক্রমে ক্রমে শুষ্ক করিতে থাক। যদি লবণ লইয়া পরীক্ষা কর তবে দেখিতে পাইবে যে, জল শুষ্ক হইয়া গেলে ঐ লবণের প্রতি অণু ঘন-চতুষ্কোণ হইবে। অতি সূক্ষ্ম সূচীর মুখে ঐ লবণের যে ভাগ উঠে, তাহাও অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে অনেকগুলি ঘন-চতুষ্কোণ বোধ হইয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্ব দ্রব্যেরই নির্দ্দিষ্ট রূপ দানা হয়। ইহা এমত স্থির নিশ্চিত হইয়াছে যে, পণ্ডিতেরা কোন দ্রব্যের নাম শুনিলেই তাহার দানার কি আকার হইবে বলিতে পারেন। সেই দানার যে আকার, ঐ দ্রব্যের পরমাণুরও সেই আকার অবধারিত হয়। *

এক্ষণকার অনেকেরই এইরূপ মত বটে, কিন্তু কোন কোন পদার্থ-বিৎ পণ্ডিত কহেন যে সকল দ্রব্যের পরমাণুরই আকার এক প্রকার, অর্থাৎ পরমাণু মাত্রেই গোল।

---

* পরমাণু শব্দটীর ব্যবহার অস্মদ্দেশীয় নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই হেতু তাঁহারা পরমাণুর আকার সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা এই স্থলে প্রকটিত করিতে হইল।

নৈয়ায়িকেরা কহেন ত্র্যসরেণুক গুলির অবয়ব আছে এবং তাহারা চক্ষুর্গোচর হয়। কিন্তু তাঁহাদিগের মতে দুইটী পরমাণুতে একটী দ্যণুক এবং তিনটী দ্যণুকে একটী ত্র্যসরেণু হয়। তবে প্রতি ত্র্যসরেণুতে ছয়টী মাত্র পরমাণু থাকে। যদি ত্র্যসরেণুক দৃষ্টি-গ্রাহ্য হয় তবে অতি সামান্য চসমা দ্বারা দেখিলে পরমাণুরাও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। কিন্তু দ্রব্য সমস্ত যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইতে পারে বলা গিয়াছে তাহা স্মরণ করিলেই বোধ হইবে যে, একটী ত্র্যসরেণুকের কথা দূরে থাকুক লক্ষ লক্ষ ত্র্যসরেণুক সমষ্টিও

তৃতীয় অধ্যায়

—।

[পরমাণুর সংহতি কি প্রকারে হয়—? প্রাচীনদিগের মত—নব্যদিগের মত—
পরমাণুর আকর্ষণ—তাহার নাম ভেদ—বিপ্রকর্ষণ—
এই বিষয়ে মতভেদ।]

পরমাণু সমস্ত অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এবং সেই সকল অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থের যোগেই স্থূল জড় সমুদায় জন্মে, প্রাচীন পণ্ডিতেরাও এইরূপ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐ পরমাণু সকল কি হেতু পরস্পর সংযুক্ত হয় এবং তাহাদিগের সংযোগের নিয়মই বা কি, তাঁহারা ইহার বিশেষ সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই।

বস্তুতঃ তাঁহারা যেরূপে কল্পনা মাত্রকে অবলম্বন করিয়া পদার্থ তত্ত্বানুসন্ধান করিতেন তাহাতে পরমাণু সংযোগের কারণ নির্দ্দিষ্ট করা অনায়াসেই হইত। তাঁহারা দেখিতেন কোন দ্রব্যের শুষ্ক চূর্ণ কিঞ্চিৎ জল দিয়া প্রক্ষণ করিলে অনেকস্থলেই ঐ চূর্ণ পিণ্ডাকার হয়। এই মাত্র দেখিয়াই তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে জলই পরমাণু সংযোগের কারণ—আর তাঁহারা বলিতেন যে, জল সকল দ্রব্যেই আছে, সুতরাং উহা কর্ত্তৃক পরমাণু সকল সংযুক্ত হইয়া স্থূল স্থূল জড় পদার্থ জন্মিয়াছে।

কিন্তু এক্ষণে আর ঐরূপ কথা যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হইতে পারে না। পণ্ডিতেরা পরমাণু-সংহতির কারণান্তর অবধারিত করিয়াছেন।

দৃষ্টি গ্রাহ্য হয় না। যে সকল কীটাণু দশ লক্ষ মিলিত হইয়া একটী অতি ক্ষুদ্র বালুকা রেণুর প্রমাণ হয় তাহাদিগের এক একটীও ত্র্যসরেণুক অপেক্ষা ক্ষুদ্র তথাপি তাহারা এক একটী অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি। অতএব নৈয়ায়িকদিগের পরমাণু বাস্তবিক পরমাণুর সহিত তুলনা করিলে পর্ব্বতাকার বোধ হয়, অথচ তাঁহারা উহার অবয়ব নাই বলেন।

তাঁহারা ঐ কারণকে পারমাণবাকর্ষণ কহেন। তাঁহাদিগের মতে পরমাণু সমস্তের এমন একটী প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ আছে যে, তাহারা অন্যোন্যকে অন্যোন্যের অভিমুখে আকর্ষণ করে। দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষ ভাগে লবণচূর্ণ করিয়া পরীক্ষা করিবার যেরূপ প্রথা বর্ণিত হইয়াছে এবং উক্ত প্রকার করিলে যেরূপ লবণের দানা জন্মে বলা গিয়াছে, তাহা অভিনিবেশপূর্ব্বক বুঝিলেই নিশ্চয় হইবে যে, লবণের অণুগুলি অবশ্য পরস্পর আকর্ষণ করিয়া মিলিত হয়; নচেৎ তাহারা চূর্ণাবস্থা হইতে কদাপি স্বয়ং সম্বদ্ধ হইতে পারিত না। উহাদিগের যে পরস্পর আকর্ষণ আছে, তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে পারা যায়। সৈন্ধব লবণ এবং সোরা দুই একত্র চূর্ণ করিলে উভয়ে সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়া যাইবে। তাহার পর যদি দুইকেই জলে গুলিয়া জ্বাল দিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় জল শুষ্ক করিয়া ফেলা যায়, তবে দেখিতে পাইবে যে, লবণের দানা স্বতন্ত্র এবং সোরার দানা স্বতন্ত্র হইয়াছে—লবণ এবং সোরায় যে প্রকার মিশ্রণ হইয়াছিল, আর সেরূপ নাই। যদিও সোরার দানার ভিতরে লবণের দানা জন্মিতে পারে, কিন্তু উভয়ে মিলিয়া কখন একটী দানা জন্মে না।

এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহারা কি হেতু ভিন্ন ভিন্ন হইল। যদি জলের সংযোগেই মিশে এমত হয়, তবে সোরা এবং লবণ দুই একত্র থাকিল না কেন?। অতএব পরমাণুদিগের পরস্পর আকর্ষণ আছে ইহা স্বীকার করিতে হইল। এইক্ষণে এমত বলা যাইতে পারে যে, যদিও সর্ব্বপ্রকার লবণ ও মৃত্তিকা এবং ধাতু ও তরল পদার্থদিগের কোন রূপে কোন রূপে দানা জন্মাইতে পারা যায় বটে, কিন্তু বায়বীয় পদার্থ মাত্রেরই উহা হওয়া অসম্ভব। বস্তুতঃ এইরূপ বিবেচনা করিয়াই কোন কোন প্রাচীন পদার্থবিৎ পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে বায়বীয় পরমাণুদিগের উক্ত প্রকার আকর্ষণ শক্তি নাই বরং তাহাদিগের পরমাণু সমস্তের বিপ্রকর্ষণ শক্তি আছে।

তাঁহারা কহেন, "চোঙ্গার ভিতরে বায়ু থাকিলে ঐ চোঙ্গার মুখে একটা অর্গল ঠিক করিয়া বসাইয়া যদি বলপূর্ব্বক প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তবে চোঙ্গার ভিতরের বায়ু সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু চাপ ছাড়িয়া দিলেই পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বিস্তৃত হইয়া উঠে। অতএব বায়ুর পরমাণু সকলে পরস্পর আকর্ষণ শক্তি নাই।" কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতেরা কহেন যে, "কোন বিশেষ কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক কোন কোন বায়বীয় পদার্থের * উপর চাপ দিয়া উহাদিগেরও দানা প্রস্তুত করাগিয়াছে। আর সকল প্রকার বায়ুতেই আকর্ষণ শক্তির কোন কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এই হেতু যদিও সকল প্রকার বায়বীয় পদার্থের অদ্যাপি দানা জন্মাইতে পারা যায় নাই বটে, তথাপি উহাদিগেরও যে কঠিন দানা হইতে পারে, এমত বিশ্বাস করা যায়। ইহাঁরা বলেন যে সকল প্রকার পরমাণুরই দুই গুণ আছে। একটী গুণ থাকাতে তাহারা পরস্পরকে টানে, অপর গুণ দ্বারা তাহারা পরস্পরকে দূরবর্ত্তী করে। আমরা নানা উপায় দ্বারা ঐ দুই শক্তির কখন একটীকে কখন অপরটীকে স্বেচ্ছাক্রমে হ্রস্ব বা সম্বর্দ্ধিত করিতে পারি। কোন কারণ বশতঃ বায়বীয় পদার্থে বিপ্রকর্ষণ শক্তি অধিক হইয়া আছে। সেই আধিক্য নিবারণের উপায়াবধারণ হইলেই উহাদিগের সকলকেই অনায়াসে ঘন করিতে পারা যাইবে। পরন্তু যাঁহারা বায়বীয় দ্রব্যের পরমাণুতে কেবল বিপ্রকর্ষণ শক্তি কল্পনা করেন, তাঁহারাও অন্য সর্ব্ব স্থলে পরমাণবাকর্ষণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

এই পরমাণবাকর্ষণ নানা স্থলে নানারূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যানুসারে ইহার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞাও হইয়াছে। ক্রমশঃ সেই সকল সংজ্ঞার উল্লেখ করা যাইতেছে।

* অঙ্গারাম্ল বায়ু যাহাকে ইংরাজিতে কার্বনিক আসিড্ বলে, তাহার এইরূপ হয়।

১।—যে স্থলে অনেকগুলি পরমাণু পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া স্থূল জড় পদার্থের উৎপাদন করে, সেই স্থলে ঐ আকর্ষণকে যোগাকর্ষণ বলা যায়। এই যোগাকর্ষণের প্রাদুর্ভাব বশতঃ কোন কোন দ্রব্য অত্যন্ত কঠিন হয়; বিশিষ্ট বল প্রয়োগ ব্যতিরেকে তাহাদিগের আকর্ষণ বিনাশ করিয়া খণ্ড খণ্ড করা যায় না। লৌহ, প্রস্তরাদি যে এত কঠিন তাহার কারণ কেবল উহাদিগের পরমাণু সমস্তে যোগাকর্ষণের আধিক্য মাত্র।

২।—যে স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরমাণু পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া এমত মিলিত হইয়া যায় যে, তাহারা কদাপি বিভিন্ন ছিল ইহা কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, এবং তজ্জন্য উহাদিগের গুণান্তর উৎপন্ন হইয়া উঠে; সেই সকল স্থলে পরমাণবাকর্ষণের নাম রাসায়নিক আকর্ষণ হয়। পারা এবং গন্ধকে মিলিত হইয়া যে একটী স্বতন্ত্র পদার্থ হিঙ্গুল জন্মে, এই রাসায়নিক আকর্ষণই তাহার কারণ।

৩।—পরমাণু সকলের প্রত্যেকের যেরূপ আকর্ষণ আছে উহাদের সমষ্টি হইলে তাহাদেরও সেইরূপ পরস্পর আকর্ষণ হইয়া থাকে। এইরূপ আকর্ষণের নাম মাধ্যাকর্ষণ। চন্দ্র ও সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে সমুদ্রে এবং তথা হইতে নদীতে জলোচ্ছ্বাস হইতেছে—পৃথিবীর প্রবল মাধ্যাকর্ষণ বশতঃ ইহার সমীপস্থ সকল জড় পদার্থ ইহাতে বদ্ধ আছে এবং সেই হেতু সকল দ্রব্যকেই ভারী বোধ হইতেছে।

এই সকল আকর্ষণের প্রকৃতি ক্রমশঃ সবিস্তার কথিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

[পাঞ্চভৌতিক মত কি ?—পাঞ্চভৌতিক মতের খণ্ডন হওয়াতে চিকিৎসা এবং কৃষি বিদ্যার কিরূপ উপকার দর্শিয়াছে।]

অতি প্রাচীনকালাবধি সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতবর্গের অনুভব ছিল যে, পৃথিবীতে যে নানাবিধ জড়পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সকলে পরস্পর ভিন্ন নয়। তাঁহারা দেখিতেন, প্রাণিশরীর এবং উদ্ভিজ্জাদি মৃত্তিকাসাৎ হইলে ক্রমে ক্রমে পচিয়া মৃত্তিকা হইয়া যায়। সেই সময়ে উহা হইতে জলবৎ রস নির্গত হয়, বুদ্বুদ্ সহকারে বায়ু উঠে, এবং প্রায় সকলই কিছু কিছু উষ্ণ হয়। এইরূপ দেখিয়াই তাঁহারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, জগতের তাবৎ দ্রব্যই মৃত্তিকা, জল, বায়ু এবং বহ্নি এই চারিটীর যোগে জন্মে—আর আকাশ সকলের মধ্যে আছে। তাঁহারা ঐ পাঁচটীকে ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, সুতরাং তদ্ঘটিত সমুদায় বস্তুকেই পাঞ্চভৌতিক পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন।

এক্ষণে এই পাঞ্চভৌতিক মতকে পণ্ডিতেরা আর যুক্তিসিদ্ধ বোধ করেন না। তাঁহারা নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভূতের সংখ্যা পঞ্চ নহে, উহার সংখ্যা সমুদায়ে ষড়্-ষষ্টি।

তাঁহারা যে দ্রব্যে যে যে প্রকার পরমাণু আছে বলেন; ঐ দ্রব্য হইতে সেই সেই প্রকার পরমাণু বাহির করিতে পারেন। আর তাঁহারা বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য হইতেও বিশেষ পরমাণু কতকগুলি সঙ্কলন করিয়া অপরাপর অনেক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন। তাহার কতিপয় উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। নব্য রসায়নবেত্তাদিগের মতে জল

ভৌতিক পদার্থ নয়—উহা মিশ্র পদার্থ। অর্থাৎ উহা দুইটীর মিশ্রণে জন্মে। তাঁহারা জলকে দুই ভাগ করিয়া ঐ দুই ভাগের যে ভিন্ন ভিন্ন গুণ আছে, ইহা স্পষ্টরূপে দেখাইতে পারেন। আবার তাঁহারা বলেন যে, জল যে দুইটী পদার্থের যোগে জন্মিয়াছে, তাহার একটী লৌহের মলে * এবং অপরটী মৃদঙ্গারে † আছে। তাঁহারা ঐ দুই দ্রব্য হইতে উক্ত দুইটী পদার্থ সংগ্রহ করিয়া জল প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন।

যেমন জল মিশ্র-পদার্থ, বায়ুও সেইরূপ। ইহাও দুই প্রকার পদার্থের মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে। রসায়ন-শাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা বায়ুকে বিভাগ করিয়া ঐ দুই প্রকার পদার্থের পরস্পর বিভিন্ন গুণ প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন। আবার বায়ুর মৌলিক উক্ত দুই দ্রব্য যাহাতে যাহাতে আছে, তাহা হইতে (যথা সোরা ‡ এবং জল § হইতে) সেই দুই দ্রব্য লইয়া বায়ু প্রস্তুত করিতে পারেন। রসায়ন-শাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা ঘন কঠিন পদার্থ মাত্রকেই, মৃত্তিকার বোধ করেন না। তাঁহারা বলেন যে, উহাদিগের মধ্যে যাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হইতে পারে তাহারাই এক, অপর সকলে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ। স্বর্ণ হইতে রৌপ্য হয় না, রৌপ্য হইতে স্বর্ণ হয় না, আর উহাদিগের কাহা হইতেও প্রস্তর জন্মে না, অতএব উহারা সকলেই এক একটী স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গণ্য হয়।

এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা এইক্ষণে নিশ্চিত হইয়াছে যে, পরমাণু সমস্ত পরস্পর মিলিত বা বিযুক্ত হইয়া অন্যোন্যের বিকার জন্মাইতেছে—বিনা কারণে তাহাদিগের কাহারও বিকৃতি হইতেছে

* অম্লকর বায়ু।

† জলকর বায়ু, ইহার ইংরাজী নাম হাইড্রোজেন্।

‡ যবক্ষার জনক বায়ু, ইংরাজী নাম নাইট্রোজেন্।

§ অম্লকর বায়ু।

না—আর তাহাদিগেরই সংযোগ বিয়োগ বই জগতে অন্য কোন বাহ্য-ক্রিয়াও নাই।

সুতরাং যদি সংযোগ বিয়োগ ব্যতিরেককে অপর কোন ক্রিয়া না থাকে, তবে পরমাণুর উৎপত্তিও নাই এবং ধ্বংসও নাই। লোকে বোধ করে যে, কোন দ্রব্যকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলে, সেই দ্রব্য আর থাকে না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোন দ্রব্যকে দগ্ধ করিলে তাহার পরমাণু সমস্তের সংযোগ শিথিল হইয়া যায় মাত্র, উহার একটীও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। কোন উপযুক্ত পাত্রে কাষ্ঠচূর্ণ রাখিয়া পাত্রের মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করত যদি জ্বাল দেওয়া যায়, তবে ঐ কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া তাহার পরমাণু সকল শিথিল হওয়াতে কতক ভাগ কঠিন ভস্ম, কতক ভাগ জলবৎ তরল, আর কিয়দংশ বায়বীয় আকার ধারণ করিয়া থাকে। পাত্রের মুখ খুলিয়া দিলে বায়বীয় অংশ বাহির হইয়া যায়, এই জন্য তাহার পর ঐ পাত্র পূর্ব্বাপেক্ষা লঘু হইয়া পড়ে।

বস্তুতঃ পরমাণুর উৎপত্তিও নাই বিনাশও নাই। যে দ্রব্য মাটিতে পড়িয়া পচিতেছে তাহার পরমাণু সমস্ত কতক বায়ুতে আর কতক পৃথিবীতে থাকে। আবার সেই সকল পরমাণুই সংযুক্ত হইয়া অন্য দ্রব্যে মিশ্রিত হয়। যে স্থলে শবদাহ হয় সেই স্থানের মৃত্তিকাতে ঐ শবশরীরের কতক পরমাণু থাকে—ঐ স্থানে যে উদ্ভিজ্জ জন্মে তাহার মূল দ্বারা ঐ সকল পরমাণু কতক উঠিয়া আইসে, এবং তদ্দ্বারা উদ্ভিজ্জ শরীর পুষ্ট হয়; সেই উদ্ভিজ্জ ভক্ষণ দ্বারা যে পশু স্বীয় দেহ রক্ষা করে, তাহার শরীরেও ঐ পরমাণু প্রবিষ্ট হয়। আবার সে মরিলে ঐ সকল পরমাণু অন্য নানা প্রকারে অপর প্রাণিশরীরে আসিয়া থাকে। জগতে অনুক্ষণ এইরূপই হইতেছে। পুষ্করিণীর জল শুষ্ক বায়ু সংযোগে বাষ্প হইয়া বায়ুতে উঠিতেছে। কিন্তু ঐ বাষ্পই আবার ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীতে বৃষ্টি বা শিশিরের আকারে

পড়িতেছে, তাহার কণামাত্র জলেরও বিনাশ হইতেছে না—কেবল উহার স্থানান্তরতা এবং অন্যোন্য সংযোগে রূপান্তরতা মাত্র ঘটিতেছে। আমরা যে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছি তাহার সহিত আমাদিগের রক্ত হইতে একটী পদার্থ * নির্গত হইয়া যাইতেছে। উদ্ভিজ্জেরা সমস্ত দিবস সেই পদার্থ গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইতেছে, অতএব যখন আমরা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া আপনাদিগের শোণিত সম্বর্দ্ধন করিতেছি, তখন যে পরমাণু গুলি আমাদিগের শরীর হইতে নির্গত হইয়াছিল, তাহাদিগকেই পুনর্ব্বার ফিরিয়া পাইতেছি।

আমরা যাহা ভক্ষণ করি তাহাই আমাদিগের মজ্জা, শোণিত, মাংস, মেদ, অস্থি প্রভৃতি সমুদায় ধাতু হয়। উদ্ভিজ্জগণ যে ভূমিতে জন্মে তাহার রস, এবং বায়ু হইতে উহারা যে যে প্রকার পদার্থ গ্রহণ করিতে পায় তাহা, এই সকলে মিলিয়া উহাদিগের মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, ফল, পুষ্পাদিরূপে পরিণত হয়। প্রাণী বা উদ্ভিদ শরীরে যে আশ্চর্য্য কৌশল সংস্থাপিত হইয়াছে তদ্দ্বারাই এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্ত সকল সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু ইহা বলিয়া যে, উক্ত শরীরিদিগের মধ্যে কোন নূতন প্রকার পদার্থের উৎপত্তি হইতেছে এমত নহে। যন্ত্র-পাক বিশেষ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সংযোজন ও বিয়োজন হয়, নূতন কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রাণী এবং উদ্ভিদ শরীর একটী অদ্ভুত যন্ত্র মাত্র। নূতন কিছু প্রস্তুত করণে ইহারও সামর্থ নাই। যাহা আহার করা যায় তাহারও এক অণুমাত্র নষ্ট হয় না। মল, মূত্র, ঘর্ম্ম এবং প্রশ্বাসাদি দ্বারা আমাদিগের ভক্ষিত দ্রব্য সকল পুনর্ব্বার পৃথিবীতে এবং বায়ুতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, আর শরীরের সহিত যাহা থাকিয়া যায় তাহাও মৃত্যু হইলে আর স্বতন্ত্র থাকে না; পৃথিবীতেই ফিরিয়া যায়। অতএব প্রাণী বা উদ্ভিদ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলেই যে কিছু নষ্ট হয়, এমত নহে।

* অঙ্গারাম্ল বায়ু।

চিকিৎসা, কৃষি প্রভৃতি অনেক শাস্ত্র, এই রাসায়নিক আবিষ্ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া, ইদানীং সমূহ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বায়ুপিত্ত কফাদির বিকার অনুসন্ধানার্থ তর্জনী মধ্যমা এবং অনামিকার উপাসনা না করিয়া পীড়িত ব্যক্তির শরীরে বাস্তবিক কোন্ ধাতুর অভাব, তাহা নানা লক্ষণ দ্বারা নিরূপিত করিতে পারেন, এবং যে ঔষধ বা পথ্য সেবন দ্বারা সেই অভাব নিবারিত হইতে পারে তদুপযুক্ত উপদেশ দেন।

এইরূপ কৃষিকার্য্যেও কোন্ উদ্ভিজ্জে কি প্রকার পরমাণু অধিক থাকে তাহা পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত করিয়া কোন্ মৃত্তিকাতে সেই পরমাণুর ভাগ অধিক ইহা নিশ্চিত করিতে হয়, সুতরাং সেই স্থানে তাদৃশ উদ্ভিজ্জ রোপণ করিলে, উহা অত্যন্ত সতেজঃ হইয়া থাকে। আর যে সকল উদ্ভিজ্জে একই প্রকার পরমাণুর ভাগ অধিক থাকে, সেই সকল উদ্ভিদ পুনঃ পুনঃ এক স্থানে রোপণ করিলে অধিক ফল হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া কাহার পর কোন্ প্রকার উদ্ভিজ্জ রোপণ করা বিধেয় ইহাও নিরূপিত হইয়াছে—কোন্ গাছে কেমন সার দেওয়া আবশ্যক তাহাও এই উপায় দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

দেখ, পাঞ্চভৌতিক মতাবলম্বীরা ভ্রম-নিমগ্ন হইয়া নিকৃষ্ট ধাতু সমস্ত হইতে স্বর্ণ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে বিস্তর নিরর্থক কাল হরণ করিয়া গিয়াছেন—এমন কি, এই দেশে অদ্যাপি অনেকে তাহা করিতেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ মত সংস্থাপিত হইয়া অবধি ইউরোপীয় লোক সকল যথোচিত যত্ন সহকারে স্বদেশীয় উষর মৃত্তিকাকেও কেমন উর্ব্বরা এবং রত্ন-প্রসবা করিয়াছেন। অতএব ভ্রমাত্মক মত যেমন বিবিধ অনর্থের মূল, বিশুদ্ধ মতও সেইরূপ নানা সুখের নিধান।

পঞ্চম অধ্যায়।

[ভৌতিক পদার্থ কত প্রকার ?—সামান্য মিশ্র-পদার্থ কিরূপে জন্মে ?—
নির্দ্দিষ্ট ভাগ-পরিমাণ কি ?—যৌগিক-মিশ্র পদার্থ কি ?—
রাসায়নিক আকর্ষণের প্রকৃতি কেমন ?]

রসায়ন শাস্ত্র বেত্তারা ষড়্-ষষ্টি প্রকার পরমাণুর নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক এপর্য্যন্ত জগতের সমুদায় বস্তু নিঃশেষে পরীক্ষিত হয় নাই, অতএব কখনই এমত বলা যাইতে পারে না যে, জগতে এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকার পরমাণু আর নাই। অপিচ, তাঁহারা যে সকল উপায় দ্বারা দ্রব্য সমস্তের পরীক্ষা সাধন করিতে-ছেন, কালে তদপেক্ষাও অনেক উৎকৃষ্টতর উপায় সৃষ্ট হইতে পারে। সুতরাং সেই সকল উপায় দ্বারা ঐ ষড়্-ষষ্টি প্রকার পরমাণু এক্ষণে যেমন পরস্পর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বোধ হইতেছে, তাহা না হইবারও সম্ভা-বনা আছে। অর্থাৎ ষড়্-ষষ্টি প্রকারের অধিকও হইতে পারে, এবং অল্পও হইতে পারে *। কিন্তু এইক্ষণে তাহাদিগের ঐ মাত্র পরিমাণই সর্ব্ববাদি সম্মত হইয়া আছে।

এই ষড়্-ষষ্টি প্রকার পরমাণুর যোগেই সকল জড় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু কতক গুলি জড় উহাদিগের মধ্যে সম-প্রকৃতিক পরমাণুর সংযোগে জন্মে। আর কতক গুলি দুই বা তিন বা তদধিক বিভিন্ন প্রকৃতিক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকার পরমাণুর যোগে উৎপন্ন হয়। যাহারা এক-প্রকৃতিক পরমাণুর যোগে জন্মে তাহাদিগকে 'ভৌতিক পদার্থ বলা যায়, এবং যাহারা বিষম-প্রকৃতিক পরমাণুদিগের সংযোগ

---

* সম্প্রতি একটী নূতন ভৌতিক পদার্থ আবিষ্কৃত হওয়াতে এক্ষণে ভৌতিক পদার্থের সংখ্যা ষড়্-ষষ্টি নির্দ্দিষ্ট হইল। পূর্ব্ব সংস্করণে পঞ্চ-ষষ্টি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল।

যারা জন্মে তাহাদিগকে মিশ্র পদার্থ কহে। যদি পরমাণু সর্ব্ব সমেত ষড়্-ষষ্টি প্রকার হয়, তবে ভৌতিক পদার্থও ষড়্-ষষ্টি প্রকার হইবে। কিন্তু মিশ্র-পদার্থের সংখ্যার পরিসীমা নাই। যেহেতু ঐ ষড়্-ষষ্টি প্রকার পরমাণুর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যত গুলি একত্রিত হইবে, ততই বিভিন্ন রূপ মিশ্র পদার্থের উৎপত্তি হইবে—আবার ঐ সকলের পরস্পর পরিমাণের তারতম্যও ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উৎপাদক হইবে। এই সমুদায় ব্যাপার এস্থলে সবিস্তাররূপে বলিবার যোগ্য নহে, ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

পারদ একটী ভৌতিক পদার্থ। অতএব উহার সকল পরমাণুই এক-প্রকৃতিক, কেবল পরস্পর নিকটবর্ত্তী হওয়াতে যোগাকর্ষণ গুণে বদ্ধ হইয়া আছে। যদি ঐ পারদ-পরমাণু সকলের সহিত অন্য কোন প্রকার পরমাণুর যোগ না হয়, তবে আমরা ইহাতে কোন রাসায়নিক কার্য্য অনুভব করিতে পারি না, এবং ঐ পারদেরও কদাপি কোন বিকার ঘটে না।

সেইরূপ গন্ধকও একটী ভৌতিক পদার্থ। গন্ধকের মধ্যে গন্ধক-পরমাণু বই আর কোন প্রকার পরমাণু নাই। সুতরাং অন্য দ্রব্যের সংযোগ ব্যতিরেকে এই গন্ধকেরও কোন বিকৃতি ঘটিতে পারে না। কিন্তু যদি পারদ এবং গন্ধককে একত্রিত করিয়া যথোচিত রূপে মর্দ্দন করা যায়, তবে ঐ পারা ও গন্ধক স্ব স্ব প্রকৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিলিয়া কজ্জলী হইবে। সেই কজ্জলীতে ঐ পারদ এবং গন্ধক পরমাণু এমত সন্নিবেশিত হইয়া যাইবে যে, অতি উত্তম অনুবীক্ষণ দিয়া দেখিলেও পারদ এবং গন্ধককে স্বতন্ত্ররূপে দেখা যাইবে না। আবার যদি ঐ কজ্জলীতে তাপ দেওয়া যায়, তবে তাহার পারদ এবং গন্ধক রাসায়নিক আকর্ষণ প্রভাবে উভয়ে মিলিয়া হিঙ্গুল হইবে। সেই হিঙ্গুলেও পারা এবং গন্ধক স্বতন্ত্র দেখা যাইবে না।

কিন্তু, যেমন পারদ এবং গন্ধক সংযোগে হিঙ্গুল উৎপন্ন হয়,

তেমনি প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা ঐ হিঙ্গুলকে বিযুক্ত করিয়া তাহা হইতে গন্ধক এবং পারা বাহির করিতে পারা যায়। তাহার রীতি এই প্রকার। পারার পরমাণুর সহিত গন্ধকের পরমাণুর যেমন আকর্ষণ, যদি গন্ধকের বা পারার সহিত অন্য কোন দ্রব্যের তদপেক্ষা অধিক আকর্ষণ থাকে, তবে সেই দ্রব্য যোগ করিলে তাহার সহিত পারা বা গন্ধক আসিয়া মিলিত হয়, সুতরাং অপরটী বিমুক্ত হইয়া পড়ে। লৌহের সহিত গন্ধকের যেমন সম্বন্ধ পারার সহিত তেমন নয়, এই জন্য হিঙ্গুল হইতে পারা বাহির করিতে হইলে হিঙ্গুল এবং লৌহ চূর্ণকে একত্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপ দিলেই পারা স্বতন্ত্র হয় এবং গন্ধক লৌহের সহিত মিলিত হইয়া আর একটী মিশ্র-পদার্থ উৎপন্ন করিয়া থাকে—তাহার নাম দ্ব্যম্ল গন্ধক-লৌহ। *

দুই প্রকার দুইটী পরমাণুর পরস্পর রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা যেরূপে একটী ভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি হয় তাহা লিখিত হইল। এক্ষণে ঐ প্রকার পরমাণুর এক প্রকারের একটী এবং অপর প্রকারের দুইটী বা তিনটীর যোগেও যেরূপে ভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক—এবং তাহা হইলেই কেবল ষড়্‌ষষ্টি প্রকার পরমাণুর পরস্পর যোগে কি প্রকারে এতাদৃশ বিচিত্র জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে তাহাও বোধ হইতে পারিবে। অম্লকর-বায়ু বলিয়া এক প্রকার ভৌতিক পদার্থ আছে, তাহার এক ভাগের সহিত যদি গন্ধকেরও এক ভাগ মিলিত হয়, তবে একাম্ল-গন্ধক-দ্রাবক বলিয়া এক পদার্থ উৎপন্ন হয়, যদি গন্ধক এক ভাগ এবং অম্লকর বায়ু দুই ভাগ মিলিত হয়, তবে দ্ব্যম্ল-গন্ধক-দ্রাবক প্রস্তুত হয়, ইহার গুণ পূর্ব্বোক্ত একাম্ল-গন্ধক-দ্রাবক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অপরন্তু তিনভাগ অম্লকর বায়ু এবং একভাগ গন্ধক একত্রিত হইলে ত্র্যম্ল-গন্ধক-

* অম্লকর বায়ুর দুই ভাগ বায়ু হইতেই আইসে।

দ্রাবক, অথবা মহা-গন্ধক-দ্রাবক জন্মে। ইহাও পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার দ্রাবক হইতে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত। ইহাই স্পষ্টার্থ নিম্ন ভাগে সঙ্কেতে লিখিত হইল।

একাম্ল-গন্ধক দ্রাবক।	দ্ব্যম্ল-গন্ধক দ্রাবক।	ত্র্যম্ল-গন্ধক বা মহা-গন্ধক-দ্রাবক।
(গ)	(গ)	(গ)
(অ)	(অ) (অ)	(অ) (অ) (অ)

কিন্তু এই প্রকার মিশ্রণ যথেচ্ছাক্রমে হইতে পারে না। ইহারও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। পারা এবং গন্ধকে হিঙ্গুল হয় বটে, কিন্তু যত ইচ্ছা হয়, তত পারা এবং যত ইচ্ছা হয় তত গন্ধক দিলেই কিছু দুয়ের পরিমাণ যত, তত হিঙ্গুল হইবে না। ১০০ তোলা পারা এবং ১৬ তোলা গন্ধক একত্রিত করিয়া জ্বাল দিলেই ১১৬ তোলা হিঙ্গুল হইবে। যদি ১০১ তোলা পারা এবং ১৬ তোলা গন্ধক দেওয়া যায়, তবে ঐ এক তোলা পারা অবশিষ্ট রহিয়া যাইবে, হিঙ্গুলের সহিত মিশ্রিত হইবে না। সেইরূপ যদি ১৭ তোলা গন্ধক দেওয়া যায়, তবে ১ তোলা গন্ধক অবশিষ্ট থাকিবে।

যেমন দুইটী ভৌতিক পদার্থের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণানুসারে সংযোগ হইলে এক একটি স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র মিশ্রপদার্থ জন্মে, সেইরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণানুসারে তিনটী ভৌতিক পদার্থের সংযোগ দ্বারাও ভিন্ন ভিন্ন মিশ্র-পদার্থ উৎপন্ন হয়। যথা চিনিতে ৬ ভাগ অঙ্গার * ৫ ভাগ অম্লকর বায়ু এবং ৫ ভাগ জলকরবায়ু একত্রিত আছে। জলকর-বায়ু, অঙ্গার এবং অম্লকর-বায়ু ইহারা প্রত্যেকে পূর্ব্বোক্ত যষ্ঠ-যষ্টি প্রকার ভৌতিক পদার্থের মধ্যে গণ্য। অতএব চিনি একটি মিশ্র-পদার্থ।

* অঙ্গারের ইংরাজী নাম কার্ব্বন্।

এই প্রকার চারি পাঁচ বা তদধিক ভৌতিক পদার্থের বিশেষ বিশেষ পরিমাণানুসারে সংযোগ হওয়াতে নানা প্রকার মিশ্র-পদার্থ উৎপন্ন হয়; পরন্তু যেমন ভৌতিক পদার্থের পরস্পর সংযোগ হয়, তেমনি মিশ্র-পদার্থেরও সংযোগ হইয়া থাকে, এবং তৎকর্তৃক অনেক যৌগিক-মিশ্র-পদার্থ জন্মে। এবম্প্রকারে দ্বিমিশ্র, ত্রি-মিশ্র, চতুর্মিশ্র প্রভৃতি পদার্থের উৎপত্তি হয়।

কোথাও কোথাও এমত হয় যে দুইটি বা তিনটি মিশ্র-পদার্থ একত্রিত করিলে তাহাদিগের মধ্যে কাহার ভৌতিক পদার্থের সহিত অপর কাহার ভৌতিক পদার্থের রাসায়নিক আকর্ষণ অধিক থাকাতে এবং কাহার সহিত সেইরূপ আকর্ষণ অধিক না থাকাতে কোন একটি মাত্র মিশ্র-পদার্থ না জন্মিয়া দুইটি বা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মিশ্র-পদার্থ জন্মে। মহা-দ্রাবক * বা ত্র্যম্ল-গন্ধক-দ্রাবক প্রস্তুত করণে দ্ব্যম্ল গন্ধক দ্রাবক † এবং পঞ্চাম্ল-যবক্ষার দ্রাবক ‡ এই দুই মিশ্র-পদার্থ সংযুক্ত করিতে হয়। দ্ব্যম্ল-গন্ধক দ্রাবকে এক ভাগ গন্ধক এবং দুই ভাগ অম্লকর-বায়ু আছে, পঞ্চাম্ল যবক্ষার দ্রাবকে একভাগ যবক্ষারজনক-বায়ু এবং পাঁচ ভাগ অম্লকরবায়ু আছে। কিন্তু ঐ দুই পদার্থ একত্রিত হইলে দ্ব্যম্ল-গন্ধক-স্থিত গন্ধক, পঞ্চাম্ল-যবক্ষারস্থিত পাঁচ ভাগ অম্লকর-বায়ুর এক ভাগকে আকর্ষণ করিয়া লয়, গন্ধক পঞ্চ ভাগ সমুদায় অম্লকর-বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না। ঐ ভাগ লইলেই দ্ব্যম্ল-গন্ধক-দ্রাবকটী ত্র্যম্ল-গন্ধক বা মহা-দ্রাবক হইয়া উঠে, কিন্তু পঞ্চাম্ল যবক্ষার-দ্রাবকের এক ভাগ অম্লকর-বায়ু নিঃসৃত হইয়া যাওয়াতে সে আপনার পূর্ব্বধর্ম্ম এবং পূর্ব্ব নাম পরিত্যাগ

* ইংরাজী সল্‌ফুরিক্ আসিড্।

† ইরাজী সল্‌ফুরস্ আসিড্।

‡ ইংরাজী নাইট্রিক্ আসিড।

করিয়া চতুরস্র-যবক্ষার দ্রাবক * হইয়া থাকে। স্পষ্টার্থ নিম্নভাগে সঙ্কেতে লিখিত হইল।

অ অ　　অ অ অ অ অ　　অ অ অ　　অ অ অ অ
০ ০ +　　০ ০ ০ ০ ০ =　　০ ০ ০ +
০ গ　　০ য　　০ ০ গ　　০ ০ য

পূর্ব্বে যাহা যাহা কথিত হইল তদ্দ্বারা রাসায়নিক আকর্ষণের এই প্রকৃতি বোধ হইয়া থাকিবে যে, ইহার প্রভাবে, পরমাণু সকল পরস্পর মিলিত হইয়া ভিন্ন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় আর এই আকর্ষণ বিভিন্ন প্রকৃতিক পরমাণুদিগের মধ্যেই দৃষ্ট হয়; কিন্তু কোন প্রকার পরমাণু কাহাকে অধিকতর আকর্ষণ করে কাহাকে তদপেক্ষা অল্পবলে আকর্ষণ করে। অপিচ, ইহাও বোধ হইয়া থাকিবে যে, ঐ সকল পরমাণুর মিশ্রণে নির্দ্দিষ্ট ভাগ-পরিমাণ আছে, সুতরাং সেই পরিমাণের আধিক্য বা অল্পতা হইলে এই আকর্ষণের কার্য্য হয় না। অপরন্তু এস্থলে ইহাও জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে, রাসায়নিক আকর্ষণ হইলেই তাপ নির্গত বা অন্তর্হিত হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[মাধ্যাকর্ষণ এবং যোগাকর্ষণে বিশেষ কি?—রাসায়নিক আকর্ষণে এবং যোগাকর্ষণে বিশেষ কি?—পরমাণুর অসন্নিকর্ষণ দ্বারা যোগাকর্ষণের হ্রাস কিরূপে হয়?—তাপ সংযোগে যোগাকর্ষণে কিরূপের হ্রাস হয়?]

কোন পাত্রে জল রাখিয়া দেখ, যদি তাহাতে জল ঢালিবার সময় বুদ্‌বুদ্ জন্মিয়া থাকে, তবে তাদৃশ দুইটী বুদ্‌বুদ্ কেমন অল্পে অল্পে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হয়; নিকটবর্ত্তী হইয়া ক্ষুদ্রটী কিঞ্চিৎ কাল

* [illegible]

বৃহৎটীর গাত্র স্পর্শ করিয়া থাকে, অল্পক্ষণ পরেই ঐ ক্ষুদ্রটীর যে দিক্ বৃহৎটীর গাত্রস্পর্শ করিয়াছে, সেই দিক্ ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়, এবং বিস্তৃত হইয়া পরে দুইটীতে মিলিয়া এক হইয়া যায়।

এই কার্য্যে মাধ্যাকর্ষণ এবং যোগাকর্ষণ উভয় শক্তিরই প্রকৃতি অনুভূত হইতেছে। যে গুণ দ্বারা ঐ দুই বুদ্‌বুদ্ পরস্পর অন্তর থাকিয়াও ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল তাহাকে উহাদিগের মাধ্যাকর্ষণ বলা যায়, এবং যদ্দ্বারা তাহারা একবার সংলগ্ন হইয়া উভয়ে মিলিয়া গেল, তাহাকে যোগাকর্ষণ কহে।

বস্তু সমস্ত পরস্পর অতি সন্নিকৃষ্ট হইলেই যোগাকর্ষণ শক্তি আপনার প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে। দূরস্থিত দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে ইহার কার্য্য-কারিতা দৃষ্ট হয় না। বিষম প্রকৃতিক বিশেষ বিশেষ পরমাণু সকলের যে আকর্ষণ তাহাকে যেমন রাসায়নিক আকর্ষণ কহে, তেমনি সম বা বিষম প্রকৃতিক পরমাণু মাত্রের যে পরস্পর আকর্ষণ তাহাকেই যোগাকর্ষণ কহা যায়। রাসায়নিক আকর্ষণ না থাকিলে গন্ধকে এবং পারদে মিলিয়া কখন হিঙ্গুল হইতে পারিত না, কিন্তু যোগাকর্ষণ না থাকিলে গন্ধক পরমাণু সকল বা পারদ পরমাণু সকল কখন একত্রিত থাকিত না। অতএব রাসায়নিক আকর্ষণ এবং যোগাকর্ষণে প্রভেদ এই যে, যোগাকর্ষণ দ্বারা অনেক গুলি পরমাণু একত্রিত হইয়া থাকে, রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা উহারা এমত মিলিয়া যায়, যে তাহাদিগের পূর্ব্ব প্রকৃতি থাকে না।

ফলতঃ যেমন, সকল জড় পদার্থই অসঙ্খ্য পরমাণুর সমষ্টি তেমনি সেই পরমাণু সমস্তের সমষ্টীকরণ বন্ধনের নামই যোগাকর্ষণ। সুতরাং যদি সেই বন্ধন না থাকে তবে পরমাণুগণ কি জন্য পরস্পর সংযুক্ত থাকিবে? যে পরিমাণে তাহাদিগের বন্ধন শিথিল হইবে তৎপরিমাণেই তাহাদিগের পরমাণু সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে। যদি পার্থিব পরমাণু সমস্ত কোন কারণে এক্ষণ অপেক্ষা শিথিল-

বন্ধন হয়, তবে এই প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড পৃথিবী ক্রমে ক্রমে স্ফীত হইয়া আরও অধিক স্থান ব্যাপক এবং সুতরাং জলবৎ তরল হইয়া পড়ে। যদি ইহার পরমাণু সমস্তের যোগাকর্ষণ শক্তি আরও হ্রস্ব হয়, তবে সেই প্রকাণ্ড তরল-রাশি তদপেক্ষাও আসন্নিকৃষ্ট পরমাণু হইয়া অতি প্রকাণ্ড বাস্প রাশির ন্যায় অনুভূত হইবে। এইরূপ ক্রমে ক্রমে যোগাকর্ষণ শক্তি সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইলে, সেইরূপ বাস্পরাশিও আর থাকিবে না। পরমাণু সমস্ত দিগ্দিগন্তরে প্রস্থান করত অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে।

কিন্তু পৃথিবীস্থ সমুদায় পরমাণুর ঐ প্রকারে যোগাকর্ষণ গুণ পরিত্যাগ হওয়া যদিও কেবল অনুভবসিদ্ধ মাত্র হয়, এবং কোন রূপেই প্রত্যক্ষ হইবার নহে, তথাপি অত্রস্থ কোন দ্রব্যের খণ্ড লইয়া প্রক্রিয়া দ্বারা তাদৃশ ব্যাপার এক প্রকার পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারা যায়। দেখ, এই ইষ্টক খণ্ড কেমন দৃঢ় এবং কঠিন রহিয়াছে। কিন্তু ইহা বহুসঙ্খ্যক পরমাণুর সমষ্টি, সুতরাং ইহার কাঠিন্যের কারণ সেই পরমাণুদিগের পরস্পর যোগাকর্ষণ মাত্র বলিতে হইবে। যদি ঐ সকল পরমাণুর যোগাকর্ষণ হ্রস্ব করিবার ইচ্ছা হয়, তবে তাহারা পরস্পর যত নিকটবর্ত্তী আছে, তাহা না থাকিতে দিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। যেহেতু যোগাকর্ষণের ধর্ম্মই এই যে, উহা পরস্পর অতি সন্নিকৃষ্ট পরমাণু সমস্তের মধ্যেই আপন প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে। ইষ্টকের যোগাকর্ষণ হ্রস্ব করিলে ইষ্টকচূর্ণ প্রস্তুত হইল। তাহার অতি সূক্ষ্মতম রেণু ও বাস্তবিক পরমাণু নহে, তাহারও এক একটী বহু পরমাণু সমষ্টি। উহাদিগের পরস্পর যোগাকর্ষণ বিনাশ করা যায় নাই—এবং তাহা যায় নাই বলিয়াই ঐ ইষ্টকচূর্ণ জলবৎ তরল হয় নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত হইয়াছে তাহাতেই উহার প্রকৃতি অনেক অংশে তরল পদার্থের প্রকৃতির সদৃশ দেখা যাইতেছে। দেখ, ইষ্টক খানি হাত হইতে ফেলিলে যেরূপে একে-

বারে পড়িত, ইহা আর সেইরূপে পড়ে না, প্রত্যুত জলের মত নিঃসৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে পতিত হয়। ইষ্টকখানি কোন পাত্রের উপর রাখিলে তাহার কোন স্থান ঐ পাত্রের তলভাগ স্পর্শ করিয়া থাকিত, আর কোন স্থান স্পর্শ করিত না, এবং তাহার উপরিভাগও সেইরূপ বন্ধুর থাকিত। ইষ্টক চূর্ণের আর সেইরূপ হয় না। বরং যেমন জল, গ্লাসে ঢালিতে ঢালিতে একেবারে সেই গ্লাসের সর্ব্ব স্থান ব্যাপক হয়, ঐ চূর্ণও প্রায় সেই রূপ হইয়া থাকে। অপিচ ইষ্টকের মধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিতে পারা যায় না, জলে পারা যায়, আর ঐ চূর্ণেও পারা যায়। পুনশ্চ, জলে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া দিলে যেমন জল উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে, ঐ চূর্ণেও অবিকল সেই প্রকার হয়। আর জল অঙ্গুলিতে লাগে অর্থাৎ অঙ্গুলিকে আর্দ্র করে, ঐ চূর্ণও সেইরূপ অঙ্গুলিতে লাগে। যদি ইষ্টকের প্রত্যেক পরমাণুকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বিভাগ করা যাইতে পারিত, তবে জলের যেমন বিন্দু হয় এই চূর্ণেও সেইরূপ হইত।

কিন্তু কর্ত্তন, পেষণ, চাপন প্রভৃতি যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা বস্তুর যোগাকর্ষণ বিনাশ করা যায়, সে সকল অপেক্ষায় তাপ সংযোগ অধিক কার্য্যকারী। তাপ এবং যোগাকর্ষণ ইহাদিগের পরস্পর বৈর সম্বন্ধ। কোন্ জড় পদার্থে অধিক তাপ দিলেই তাহার পরমাণু সমস্তের পরস্পর যোগাকর্ষণ শিথিল হইয়া যায়। দেখ, সুবর্ণ কেমন কঠিন, কিন্তু উহাতেও যথোচিত পরিমাণে তাপ সংযোগ করিলে উহা জলবৎ তরল হইয়া যায়। যদি তদপেক্ষা আরও অধিক তাপ দেওয়া যায়, তবে ঐ তরল সুবর্ণ বাষ্পরূপ ধারণ করিতে পারে।

অতএব দ্রব্য মাত্রের যে কাঠিন্য বা তারল্য অথবা বায়বীয় ভাব তাহা কেবল যোগাকর্ষণেরই তারতম্যের ফল। দৃঢ় করিয়া বন্ধন করিলে যেমন তৃণের গুচ্ছ কঠিন হয়, শিথিল বন্ধন করিলে যেমন সেই গুচ্ছ তাদৃশ শক্ত হয় না—তৃণ গুলি অল্প অল্প সরিতে পারে, সেই

প্রকার দ্রব দ্রব্যের পরমাণু সমস্ত শিথিল ভাবে বদ্ধ এবং কঠিন পদার্থের পরমাণু সকল তদপেক্ষা দৃঢ়তর রূপে সম্বন্ধ। অতএব যেমন যোগাকর্ষণ হ্রস্ব করিয়া কঠিন সামগ্রী সমুদায়কে তরল করা যায়, তেমনি যদি যোগাকর্ষণ বৃদ্ধি করিবার কোন উপায় থাকে, তবে বায়বীয় পদার্থকে তরল এবং তরল দ্রব্যকে কঠিন করা যাইতে পারে। ফলে তাহাই হয়। কতকগুলি বালুকা রেণুক লইয়া যদি মুষ্টির মধ্যে দৃঢ়তররূপে চাপ দেওয়া যায়, তবে ঐ সমস্ত রেণু পরস্পর নিকটবর্ত্তী হওয়াতে বর্দ্ধিত-যোগাকর্ষণ হইয়া পিণ্ডাকার ধারণ করে। কিন্তু তাদৃশ পিণ্ড কদাপি সুদৃঢ় হয় না। তাহার কারণ, সামান্য চাপ দ্বারা আমরা তত্রস্থ বালুকারেণু সমস্তকে যথেষ্ট সন্নিকৃষ্ট করিতে পারি না। যদি কোন যন্ত্র দ্বারা অধিক বলে চাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে নীলের বারুদের গুঁড়ার যে প্রকার কঠিন পিষ্টক প্রস্তুত হয়, অথবা বড়ি যে প্রকার দৃঢ় হয়, ঐ বালুকারও সেইরূপ হইতে পারে।

কিন্তু যেমন তাপ দ্বারা পরমাণু সমস্তের পরস্পর যোগাকর্ষণ হ্রস্ব হয়, সেইরূপ কোন দ্রব্য হইতে তাপ বিনির্গত করিতে পারিলেই যোগাকর্ষণ-শক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে। দেখ, জল অতি তরল পদার্থ, যদি ইহার অন্তর্গত তাপ-ভাগ অনেক বিনির্গত হইয়া যায়, তবে ইহা কঠিন হইয়া বরফ হয়। বাষ্প বায়বীয় পদার্থ, কিন্তু উহা ঘন হইলেই জল হয়।

যদি বল, দ্রব্য সকল পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইলেই যদি তাহাদিগের যোগাকর্ষণ অধিক হয়, তবে যে দুইটী দ্রব্য হউক উপর্য্যুপরি সংস্থিত হইলেই উভয়ে সংযুক্ত হয় না কেন ?। ইহার উত্তর এই যে, সকল বস্তুই বন্ধুর। কেহই সর্ব্বতোভাবে সমতল নহে। অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলেই প্রমাণ হয় যে, যে সকল দ্রব্য অত্যন্ত মসৃণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহারাও বস্তুতঃ অত্যন্ত বন্ধুর। এই হেতু দুইটী দ্রব্য উপরে উপরে রাখিলেও তাহাদিগের অতি অল্প ভাগ মাত্র পরস্পর সন্নিকৃষ্ট

হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে দুই দ্রব্যের অধিকাংশ বাস্তবিকই সন্নিকৃষ্ট হয়, তথায় যোগাকর্ষণের কার্য্যকারিতা অবশ্য প্রতীয়মান হইবে। একখানি পীঁড়া জলের উপর ভাসমান করিয়া দিয়া একেবারে তাহার দুই ধার ধরিয়া তুলিতে গেলে কেমন বল প্রকাশ করিতে হয়? জল যেন ঐ কাষ্ঠপীঠের সকল স্থান আঠা দিয়া বান্ধিয়া রাখিয়াছে, এমত অনুভব হইতে থাকে। দুইটী পয়সার মধ্যে কিঞ্চিৎ জল বা তৈল দিয়া তাহাদিগের বন্ধুরত্ব মোচন করত যদি উপরে উপরে বসাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহারা যোগাকর্ষণ গুণে এমত সম্বন্ধ হয় যে একটী পয়সা ধরিয়া একেবারে দুইটীকেই উত্তোলন করা যাইতে পারে। এরূপ হইবার অন্যতম কারণ বায়ুর চাপ—কিন্তু এস্থলে সে কথার বিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, কোন দ্রব্যের পরমাণু যোগাকর্ষণ গুণে দৃঢ়রূপে সম্বন্ধ না হইলেই উহা আপনা হইতে গোলাকার ধারণ করে। বৃষ্টির জল ফোটা ফোটা হইয়া পড়ে; অশ্রু জল গলিত হইয়া বিন্দুরূপে নির্গত হয়, রাত্রি নীহার প্রাতে মুক্তার ন্যায় গোলাকার দেখায়; মিঠাইয়ের বুঁদি সমস্ত এবং দ্রব সীসকের ছিটা গুলি সকল এই জন্য গোল হয়—আর পৃথিব্যাদি গ্রহগণ এই কারণেই গোলাকার ধারণ করিয়া আছে।

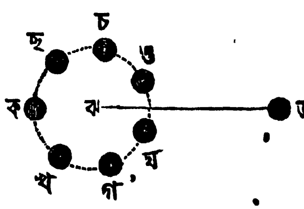
সপ্তম অধ্যায়।

[মাধ্যাকর্ষণ কি?—এই আকর্ষণের নাম মাধ্যাকর্ষণ হইয়াছে কেন?—ইহা কি হেতু দূরেও কার্য্যকারী হয়?—কত দূরে ইহার কেমন বল থাকে?]

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, যে গুণ দ্বারা পরস্পর বিভিন্ন প্রকার পরমাণুগুলি মিলিত হইয়া একটী স্বতন্ত্র পদার্থের উৎপত্তি করে, তাহারই নাম রাসায়নিক আকর্ষণ—আর যে গুণ থাকাতে একাধিক

পরমাণু একত্রিত হইয়া থাকে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়ে তাহার নাম যোগাকর্ষণ; কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ পরমাণু-সমষ্টিদিগের পরস্পর যে আকর্ষণ তাহাকে মাধ্যাকর্ষণ নামে উক্ত করা হইয়াছে।

শেষোক্ত আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অনেক গুলি পরমাণু একত্রিত হইয়া যে আকর্ষণ করে তাহা ঐ পরমাণু সমষ্টির মধ্যস্থল হইতে কার্য্যকারী হইতেছে এমত অনুভব হয়। ইহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে। এইক্ষণে এই মাত্র বক্তব্য যে, দুই তিন বা তদধিক ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ একেবারে উপস্থিত হইলে তাহাদিগের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন দিকে না হইয়া এক দিকেই হয়। যেমন এক ব্যক্তিকে দুই বা তিন জনে, একেবারে ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে টানিলে সেই ব্যক্তির গতি, উহাদিগের মধ্যে কোন একজনের দিকে পৃথক্রূপে না হইয়া সকলেরই মধ্যস্থলে হয়, পরমাণুদিগের আকর্ষণেও ঠিক তদ্রূপ ঘটে। ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিবার জন্য নিম্ন-ভাগে প্রতি-কৃতি প্রদত্ত হইল।



এই স্থলে 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' 'ঙ' 'চ' 'ছ' এই সাতটী পরমাণু 'জ' নামক অপর একটী পরমাণুকে আকর্ষণ করিতেছে। 'ক'-এর আকর্ষণে 'জ' 'ক' এর দিকে যাইতে চাহে, কিন্তু 'খ' এর আকর্ষণে উহাকে 'খ'-এর দিকে আসিতে হয়; এইরূপ 'গ'-এর আকর্ষণে 'গ'-এর দিকে এবং 'ছ'-এর আকর্ষণে 'ছ'-এর দিকে যাইতে হয়। সুতরাং সকলগুলির আকর্ষণ মিলিয়া 'জ'-কে 'ঝ'-এর অভিমুখে নীত করে। 'ঝ' স্থানে কোন পরমাণু না থাকিলেও 'জ'-এর গতি ঐ স্থানের অভিমুখেই হয়। সুতরাং এমত বলা যাইতে পারে যে 'ক' 'খ' প্রভৃতি সকল

পরমাণুর আকর্ষণ যেন তাহাদিগের সকলের মধ্যবর্ত্তী 'ধা' স্থান হইতেই কার্য্যকারী হইতেছে। এইরূপ হয় বলিয়াই এই আকর্ষণের নাম মাধ্যাকর্ষণ।

যোগাকর্ষণ, যেমন পরমাণু সকল পরস্পর অতি সন্নিকৃষ্ট হইলেই আপনার প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে, মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃতি সেরূপ নহে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দূরেও কার্য্যকারী হয়। না হইবেই কেন? আকর্ষণ শক্তি সকল পরমাণুরই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। সকল পরমাণুই সকল পরমাণুর সহিত আকর্ষণরূপ সূত্র দ্বারা সম্বদ্ধ আছে। সুতরাং যেখানে তাহারা অনেকে একত্রিত হয়, অবশ্য চতুর্দ্দিকস্থ সকল পরমাণুই সেই অভিমুখে আকৃষ্ট হইবে। একটি পরমাণুর আকর্ষণ কখনই অধিক দূর হইতে কার্য্যকারী হইতে পারে না,—কিন্তু উহারা অনেকে একত্রিত হইলে অবশ্যই দূর হইতেও উহাদিগের কার্য্য অনুভূত হইতে পারে। এইরূপ বিবেচনা করিলে যোগাকর্ষণ এবং মাধ্যাকর্ষণ বস্তুতঃ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না। একটি পরমাণুর আকর্ষণ অল্প, দুইটীর তদপেক্ষা অধিক, তিনটীর আরও অধিক এইরূপে যে বস্তু যত অধিক পরমাণুর সমষ্টি তাহার আকর্ষণও তত অধিক, সুতরাং তত অধিক দূর হইতে কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

কিন্তু ইহাও সহজে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ আকর্ষণ যত দূর হইতে হইবে ততই উহার বল ক্রমশঃ হ্রসমান হইয়া যাইবে। তদ্বিষয়ে পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে, মাধ্যাকর্ষণের হ্রাস দূরত্বের বর্গানুসারে হইয়া থাকে। অর্থাৎ এক হাত দূরে কোন দ্রব্য অপর দ্রব্যকে যত আকর্ষণ করে দুই হাত অন্তরে উহার আকর্ষণ তাহার অর্দ্ধেক না হইয়া দুইয়ের বর্গ যে চারি সেই চারি ভাগের এক ভাগ হইবে—৩ হাত অন্তরে তিনের বর্গ যে নয় সেই নয় ভাগের এক ভাগ হইবে—৪ হাত অন্তরে, ষোল ভাগের এক ভাগ হইবে, ইত্যাদি।

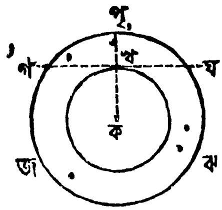
পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, যে দ্রব্য অধিক পরমাণুর সমষ্টি তাহার মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিও তত অধিক। সুতরাং পৃথিবী ইহার সমীপবর্ত্তী সর্ব্ব বস্তু অপেক্ষা অনেক বৃহৎ বলিয়া তাদৃশ অন্য কোন পদার্থের মাধ্যাকর্ষণ আমাদিগের স্পষ্ট প্রত্যক্ষ গোচর হয় না। পৃথিবীর সকল বস্তু তাহার প্রবলতর মাধ্যাকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত আছে ইহাই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া, লোষ্ট্র খণ্ড, বৃহৎ অট্টালিকা, গণ্ড শৈল বা পর্ব্বত-শ্রেণী ইহারা যে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি-বিরহিত এমত নহে। তবে যে উহারা আপন আপন সমীপস্থ বস্তু সমস্তকে টানিয়া লইতে পারে না, পৃথিবীর প্রবলতর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রতিবন্ধকতাই তাহার এক মাত্র কারণ। দুইটি শিশুকে যদি কোন বলবান্ ব্যক্তি দুই হস্তে ধরিয়া রাখে, তাহা হইলে ঐ শিশুদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করিলেও যেমন কৃতকার্য্য হইতে পারে না, সেইরূপ পৃথিবীস্থ সকল দ্রব্যের পরস্পর মাধ্যাকর্ষণ উক্তরূপ কারণ বশতঃ স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম হইয়া ব্যর্থ-প্রায় হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন স্থলে অন্যান্য দ্রব্যেরও মাধ্যাকর্ষণ প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। কোন নির্ব্বাত স্থলে যদি এক পাত্র জলে দুই খণ্ড শোলা ভাসাইয়া রাখা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঐ শোলা দুই খানি ক্রমে ক্রমে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইতেছে। পর্ব্বত শিখর হইতে যদি ওলন দড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া যায়, তবে সেই দড়ি পর্ব্বত কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তদভিমুখে কিঞ্চিৎ গমন করে, ঠিক সরল রেখা ক্রমে লম্বমান হইয়া পৃথিবী স্পর্শ করে না। দুইটি জলবিন্দু কোন অতি মসৃণ পাত্রে পরস্পর সন্নিকৃষ্ট করিয়া রাখিলে তাহারাও অনতিবিলম্বে মিলিত হইয়া যায়। আর দেখ, পৃথিবী বৃহৎ বলিয়া উহাতে অন্য বস্তুর আকর্ষণ কার্য্যকারী হয় না, কিন্তু তদ্বৎ বৃহৎ পিণ্ড চন্দ্র সূর্য্যাদির মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে পৃথিবীস্থ সমুদ্রের জল কখন কখন উহাদিগের অভিমুখে গমন করে তাহাতেই

'জোয়ার' হয়। অতএব পরমাণু সমষ্টি মাত্রেরই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সপ্রমাণ হইল।

এইক্ষণে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে যে যে কার্য্য হয় তাহার কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ পৃথিবীর আকর্ষণ গুণে সকল দ্রব্যই স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত থাকে। নচেৎ সকলেই পরস্পর মাধ্যাকর্ষণের বশীভূত হইয়া একত্রিত হইত। দ্বিতীয়তঃ যেমন দুই খানি শোলা জলে ভাসাইয়া দিলে তাহারা পরস্পর সংলগ্ন হয় তেমনি কোন দ্রব্য পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইলেই সে এবং পৃথিবী উভয়ে পরস্পের সংলগ্ন হয়, কিন্তু পৃথিবী অতি বৃহৎ বলিয়া ইহা যে ঐ ক্ষুদ্র দ্রব্যের অভিমুখে যায় তাহা অনুভব হয় না—পরন্তু সকল সামগ্রীই পৃথিবীতে পড়িতেছে, অর্থাৎ ইহার মধ্যাভিমুখগামী হইতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। অপিচ, যখন পূর্ব্বোক্ত দুই খানি শোলা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে তখন যেমন তাহাদিগের দুইটীর একটীকে একগাছি কেশ বা তাদৃশ কোন অল্প প্রতিবন্ধক দ্বারা নিবারণ করিয়া রাখা যায় না, সেইরূপ যখন কোন দ্রব্য পৃথিবীর মধ্যাভিমুখে যাইতে থাকে, তখন বিশিষ্ট প্রতিবন্ধক ব্যতিরেকে তাহার বেগ নিবারিত হয় না। যে পরিমাণ বল দ্বারা উহার গমন নিবারণ হইতে পারে তাহাকেই ঐ দ্রব্যের 'ভার' কহে। অতএব পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে কোন দ্রব্যেরই ভার থাকিত না। ইহাতেই বোধ হইবে, দ্রব্যের ভার মাধ্যাকর্ষণের ফল; ইহা বস্তুর কোন স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে। যদি জগতে একটী বই দ্রব্য না থাকিত তাহা হইলে সেই দ্রব্যের কিছুমাত্র ভার থাকিত না।

অপিচ, যে দ্রব্য পৃথিবীর উপরে এক সের ভারী, কোন উচ্চ পর্ব্বতের অধিত্যকায় তাহার ভার এক সের অপেক্ষা ন্যূন হয়। তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, মাধ্যাকর্ষণ দূরত্বের বর্গানুসারে হ্রস্ব

হইয়া থাকে *। আর যদি সেই দ্রব্য লইয়া ভূগর্ভ মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া যায় তাহা হইলেও উহার ভার অল্প হয়। ইহার কারণ নিম্ন-লিখিত চিত্র দর্শনে বিশেষরূপে বোধ হইবে।



'পৃ' চিহ্নিত ভূমণ্ডলের উপরিভাগে যে দ্রব্য সংস্থিত আছে, তাহা পৃথিবীর সকল পরমাণু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ইহার 'ক' চিহ্নিত কেন্দ্রাভিমুখগামী হইতেছে। কিন্তু যখন ঐ দ্রব্যকে ভূগর্ভমধ্যে 'খ' স্থানে লওয়া যাইবে, তখন 'গ ঘ' রেখার ঊর্দ্ধ-স্থিত তাবৎ পরমাণু উহাকে 'ক' নামক কেন্দ্রের অভিমুখে আকর্ষণ না করিয়া তাহার বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিবে। সুতরাং 'খ' স্থানে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অধিক না হইয়া অনেক অল্প হয়—অর্থাৎ, চিত্রের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র গোল পিণ্ডটীর যে আকর্ষণ হইতে পারে তাহাই হয়, তদধিক হয় না †। এইরূপ বিবেচনা করিলে

---

* পৃথিবী হইতে কোন দ্রব্যকে ঊর্দ্ধে লইয়া গেলে তাহার ভার কিরূপ লাঘব হয়, তাহা নিম্নলিখিত অনুপাতানুসারে প্রক্রিয়া করিলেই স্পষ্ট বোধ হইবে। 'ব্যা' যদি পৃথিবীর ব্যাস 'মা' অর্থে মাইল সংখ্যা এবং 'ম' অর্থে ব্যক্ত-মণ-পরিমাণ, আর 'ক' অব্যক্ত ভার হয়, তবে

$$\left[\frac{\text{ব্যা}}{২}+\text{মা}\right]^{২} : \left[\frac{\text{ব্যা}}{১}\right]^{২} = \text{ম} : \text{ক},$$ অথবা পৃথিবীর ব্যাস পরিমাণ ৮০০০ মাইল ধরিয়া

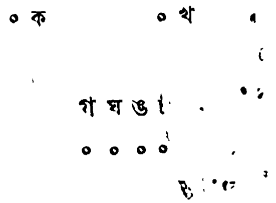
$$[৪০০০+\text{মা}]^{২} : [৪০০০]^{২} = \text{ম} : \text{ক}$$

$$\text{ক} = \frac{[৪০০০]^{২} \times \text{ম}}{[৪০০০+\text{মা}]^{২}}$$

† কত নিম্নে গমন করিলে কত ভার থাকে তাহা এই নিয়মানুসারে প্রকাশিত হইবে। যথা $$\left[\frac{\text{ব্যা}}{২}\right]^{৩} : \left[\frac{\text{ব্যা}}{২}-\text{মা}\right]^{৩} = \text{ম} : \text{ক},$$

$$[৪০০০]^{৩} : [৪০০০-\text{মা}]^{৩} = \text{ম} : \text{ক}$$

$$[৪০০০-\text{মা}]^{৩} \times \text{ম}$$



'গ ঘ ঙ চ' চারিটী পরমাণুর সমষ্টি। উহারা সম-দূরস্থিত 'ক' এবং 'খ' উভয়কেই সমান বলে আকর্ষণ করিতেছে। সুতরাং 'ক' যতক্ষণে উহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইবে 'খ' ও ততক্ষণে উহাদিগের নিকটে আসিবে। সুতরাং যদি 'ক' এবং 'খ' ইহারা পরস্পর যত দূরে আছে, তত দূরে না থাকিয়া পরস্পর নিকটে থাকে বা দুইয়ে মিলিয়া একটী স্থূলতর অণু হয়, তাহা হইলেই বা পতন কাল কি হেতু বিভিন্ন হইবে? 'ক' যতক্ষণে আসিবে 'খ'ও ততক্ষণে আসিবে আর 'ক খ'ও সেই সময়ে আসিবে।

অষ্টম অধ্যায়।

[পরমাণুর সংযোগ বিয়োগ ব্যতিরেকে দ্রব্যের গুণান্তরোৎপত্তি—উদাহরণ—তাহার হেতু—জড়ের সঞ্চারী গুণ।]

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরমাণুর সংযোগ বিয়োগ দ্বারা দ্রব্যের গুণান্তরোৎপত্তি হয়, ইহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। কিন্তু কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক প্রকার পরমাণু একই প্রকার ভাগ-পরিমাণে মিলিত হইয়াও বিভিন্ন গুণ সমূহের উৎপাদন করে। (১) পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, 'লেবুর আরকে এবং টার্পিণ তৈলে একই প্রকার পরমাণু একই প্রকার ভাগ-পরিমাণে মিলিত হইয়া আছে। অতএব ঐ দুই পদার্থের উপাদান সর্ব্বতোভাবে সমান। কিন্তু তথাপি ঐ দুইয়ের গুণ পরস্পর অতিশয় বিভিন্ন। উক্ত আরকের ঘনত্বে, গন্ধে, বর্ণে, টার্পিনের

কিঞ্চিন্মাত্র সাদৃশ্য নাই। (২) অতি অল্প তাপমানে সৈন্ধব লবণের দানা প্রস্তুত করিলে দেখা যায়, যতক্ষণ ঐ সকল দানা পাত্রে থাকে, ততক্ষণ অতি স্বচ্ছ থাকে, কিন্তু যদি একবার স্পর্শ করা যায় তবে তৎক্ষণাৎ উহা দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইয়া পড়ে। স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে ঐ দানাতে যে যে পরমাণু ছিল পরেও তাহাই থাকে; কোন নূতন প্রকার পরমাণু আসিয়া উহাতে সংযুক্ত হয় এমন নহে; তথাপি কি আশ্চর্য্য! ঐ দ্রব্য একেবারে অস্বচ্ছ হইয়া উঠে। (৩) লৌহকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া শীঘ্র শীতল জলে মগ্ন করিলে ঐ লৌহে কোন পরমাণু সংযুক্ত বা বিযুক্ত হয় না, তাহার প্রমাণ উহার ভার ঠিক পূর্ব্বের সমান থাকে; কিন্তু পূর্ব্বে লৌহকে যেমন টিপিয়া নোয়াইতে এবং পিটিয়া বিস্তৃত করিতে পারা যাইত, পরে আর সেরূপ পারা যায় না; তখন উহাকে পিটিলে বা টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু দেখ ঐ উষ্ণ লৌহকে যদি শীঘ্র শীতল না করিয়া ক্রমে ক্রমে শীতল হইতে দেওয়া যায় তবে উহার পূর্ব্বের কোনগুণের অন্যথা হয় না—পূর্ব্বেও যেমন পিটিলে বিস্তৃত হইত পরেও সেইরূপ হইতে পারে। (৪) পারা এবং গন্ধককে একত্র করিয়া যদি জ্বাল দিয়া রাখা যায় এবং সেই জ্বাল যদি ক্রমশঃ আপনা হইতে নিবিয়া ঐ দ্রব্য শীতল হয়, তাহা হইলে লোহিত বা হিঙ্গুল জন্মে। কিন্তু জ্বাল নির্ব্বাণ করিয়া উহাকে শীঘ্র শীতল করিয়া ফেলিলে হিঙ্গুলের বর্ণ লোহিত না হইয়া অত্যন্ত কাল হয়। তাহাকেই কজ্জলী * কহে। সুতরাং ঐ কজ্জলী এবং হিঙ্গুলে কোন প্রভেদ নাই। উহাদিগের উপাদানও এক এবং ভাগ-পরিমাণও ঠিক সমান। তথাপি উহাদিগের বর্ণের সম্পূর্ণরূপে ভেদ হইয়া পড়ে।

এইরূপ সহস্র সহস্র স্থলে নূতন প্রকার পরমাণুর সংযোগ বিয়োগ

* কজ্জলী কাঁচা পাকা দুই প্রকার হয়। গন্ধক এবং পারায় মাড়িয়া যে পদার্থ জন্মে তাহাকে কাঁচা কজ্জলী বলে, আর উক্তরূপে তাপ দিয়া যাহা হয়, তাহার নাম পাকা কজ্জলী।

অসত্ত্বেও দ্রব্যের গুণান্তরোৎপত্তির উদাহরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা কহেন যে, ঐ সকল স্থলে দ্রব্যের পরমাণু সমস্ত অন্য সর্ব্ব-প্রকারে পূর্ব্ববৎ থাকিয়াও, বিভিন্নরূপে বিনিবেশিত হয় বলিয়াই দ্রব্যের গুণান্তর জন্মে। তাঁহারা কহেন (১) লেবুর আরকে যে যে প্রকার পরমাণু যত গুলি আছে, টার্পিন তৈলেও সেই সেই পরমাণু তত গুলি আছে বটে, কিন্তু আরকে ঐ সকল পরমাণুর যাহার পর যেটী আছে টার্পিনে ঠিক তাহার পর সেইটী নাই। তাঁহারা ইহাও বলেন, দেখ, যখন কোন দ্রব্য সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্বীয় আকর্ষণ শক্তি প্রভাবে স্বজাতীয় অন্য বস্তু লইয়া স্থূল হইতে থাকে, তখন উহার অণু সকল যথা তথা বসিয়া যায় না—ফিরিয়া ঘুরিয়া যেন আপনাদিগের নিয়-মিত স্থান গ্রহণ করিয়া লইতে থাকে, এবং সেই জন্যই তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ আকারের দানা জন্মে, কিন্তু যদি কোন কারণ বশতঃ ঐ সকল অণু আপনাপন যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে না পায়, তবে উহাদিগকে যথা তথা বসিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলেও ঐ দ্রব্য স্থূল হয় বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃতাকার দানা জন্মিতে পারে না, সুতরাং তাদৃশাবস্থায় উহাদিগের পূর্ব্ব গুণের অন্যথা হইবে, আশ্চর্য্য কি?

এইরূপ কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। ইহাকে অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ব্যাপারের সহজেই মীমাংসা করিতে পারা যায়। (২) যখন স্বচ্ছ সৈন্ধব লবণের দানাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা যায় তখন যতই ঈষৎ স্পর্শ হউক না কেন, উহার পরমাণু সকল পূর্ব্বে যে প্রকারে সন্নিবেশিত ছিল, পরে সেরূপ থাকে না, সেই জন্যই উহার স্বচ্ছত্ব গুণ গিয়া শুভ্রবর্ণতা জন্মে। যাঁহারা রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা জল যথাট করিয়া বরফ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন যে, কখন কখন জলকে যথোচিত শীতল করিলেও জল সংযত হয় না। কিন্তু সেই সময়ে যদি ঐ জল কিঞ্চি-মাত্র নাড়া পায়—এমন কি, যদি উহাতে অণুমাত্র বালুকা পড়ে—তবে

উহা তৎক্ষণাৎ সংযত হইয়া যায়। ইহাতে বোধ হইতেছে, যেন জলের পরমাণু সমস্ত সংযত হওনে উন্মুখ হইয়া থাকে, কিঞ্চিন্মাত্র নাড়া পাইলেই তাহারা দুইটী তিনটী চারিটী করিয়া সকলে মিলিত হইতে পারে—কিঞ্চিৎ নাড়া না পাইলে স্ব স্ব স্থান হইতে সরিতে পারে না। বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত লবণের দানাতেও সেইরূপ ঘটে। লবণের অণু সকল এক প্রকারে নিবেশিত হইয়া আছে—কিন্তু হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র তাহারা অন্য প্রকারে সন্নিবেশিত হয়। (৩) সেইরূপ লৌহকে উত্তপ্ত করিলে উহার পরমাণু সকল শিথিল হয়, উহাকে ক্রমে ক্রমে শীতল হইতে দিলে সেই সকল পরমাণু পুনর্ব্বার যে যাহার আপন আপন স্থানে আসিতে পারে, কিন্তু শীঘ্র শীতল করিলে উহারা ঠিক আপনাপন স্থানে আসিতে পারে না—যথা তথায় থাকিয়া যায়, সুতরাং পরমাণু সমস্তের বিভিন্ন সন্নিবেশ বশতঃ ঐ লৌহের গুণান্তর জন্মে। (৪) পারায় এবং গন্ধকে মিলিয়া কখন যে অতি কৃষ্ণবর্ণ কজ্জলী হয়, আর কখন অতি লোহিত বর্ণ হিঙ্গুল হয়, তাহারও এইরূপ কারণ। জ্বাল শীঘ্র নির্ব্বাণ করিলে উহাদিগের পরমাণুগুলি যে রূপে সন্নিবেশিত হয়, ক্রমে ক্রমে তাপ নির্গম করিয়া দিলে সেইরূপে সন্নিবেশিত হয় না।

ফলতঃ যেখানে যেখানে নূতন প্রকার কোন পরমাণুর সংযোগ বিয়োগ ব্যতিরেকে এবং তাহাদিগের ভাগ-পরিমাণের তারতম্য অসত্ত্বেও দ্রব্যের গুণান্তর উৎপত্তি হয়, সেই সেই স্থলে ঐ সকল পরমাণু বিভিন্ন প্রকার সন্নিবেশিত হইয়াছে, এমত কল্পনা করা আবশ্যক। এইরূপে যে সকল গুণের সঞ্চার হয় বা এইরূপে যাহাদিগের সঞ্চার হইয়াছে এমত বোধ হয়, সেই সকল গুণকে সঞ্চারীগুণ কহে।

সঞ্চারী-গুণ অসংখ্য প্রকার; তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটীর নাম ক্রমশঃ উল্লিখিত হইতেছে।

১।—ঘনত্ব—যাহার পরমাণু সমস্তের সন্নিবেশ নিবিড় সেই দ্রব্য অধিক ঘন। কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্থানের মধ্যে কোন কোন দ্রব্যের অধিক পরমাণু থাকিতে পারে, কাহারও বা তত অধিক থাকিতে পারে না। একটা বোতলের মধ্যে যত পারা থাকে, সেই বোতলের মধ্যে জল তত থাকিতে পারে না—আর জল যত থাকিতে পারে তৈল তাহা অপেক্ষাও অল্প থাকে। অতএব ইহা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ঐ তিন দ্রব্যের মধ্যে পারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘন, তাহার নীচে জল, তাহার নীচে তৈল। এক ঘন ইঞ্চি প্রমাণ স্বর্ণ যত ভারী, সেই প্রমাণ তাম্র তত ভারী নয় এবং লৌহ তাহা অপেক্ষাও অল্প ভারী। অতএব স্বর্ণের পরমাণু সমস্ত যত নিবিড়, তাম্রের তেমন নয় এবং লৌহের তাহা অপেক্ষাও অল্প। সুতরাং ঐ তিন ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘন, তাম্র তাহার দ্বিতীয় এবং লৌহ তৃতীয়।

(ঘনত্বের বিপরীত গুণ বিরলত্ব।)

২।—কাঠিন্য—যাহার পরমাণু সমস্ত এমত রূপে সন্নিবেশিত আছে যে, সেই অবস্থায় তাহাদিগের পরস্পরের আকর্ষণ অধিক প্রবল, সুতরাং বিশিষ্ট বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকে তাহাদিগকে পরস্পর বিভিন্ন করা যায় না, তেমন দ্রব্যকে কঠিন বলে। জল, বায়ু অপেক্ষা কঠিন—কাষ্ঠ, জল অপেক্ষা কঠিন—এবং লৌহ, কাষ্ঠ অপেক্ষাও কঠিন। অধিক কঠিন হইলেই যে অধিক ঘন হয় এমত নহে। পারদ, রৌপ্য অপেক্ষা ঘন কিন্তু কঠিন নয়—শোলা জল অপেক্ষা কঠিন কিন্তু অধিক ঘন নয়।

(কাঠিন্যের বিপরীত গুণ মৃদুতা।)

৩।—ভঙ্গ-প্রবণতা—যাহাদিগের পরমাণু সমস্ত এমত কোন বিশেষ প্রকারে সন্নিবেশিত হইয়া আছে যে, তদ্দ্বারা দ্রব্যটি অত্যন্ত কঠিন হইয়াও অল্প আঘাতেই খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় সেই সকল দ্রব্যকে ভঙ্গ-প্রবণ কহে। কাচ অতিশয় ভঙ্গ-প্রবণ।

(ভঙ্গ-প্রবণতার বিপরীত গুণ ঘাত-সহত্ব।)

৪।—ঘাত-সহত্ব—যে সকল দ্রব্য এমন যে, অল্পমাত্র আঘাত পাইলেই ভাঙ্গিয়া যায় না, পার্শ্বের দিকে বাড়িয়া বিস্তৃত হয়, তাহাদিগকে ঘাত-সহ বলা যায়। স্বর্ণ অতিশয় ঘাত সহ। স্বর্ণের অতি সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত হইতে পারে।

(ঘাত-সহত্বের বিপরীত গুণ ভঙ্গ-প্রবণতা।)

৫।—তান্তবতা—যে সকল দ্রব্যকে টানিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করা যায় তাহাদিগকে তান্তব কহে। প্লাটিনম, স্বর্ণ, ইস্পাত প্রভৃতি অনেকগুলি ধাতু অতিশয় তান্তব।

(তান্তবতার বিপরীত গুণ ছেদ-প্রবণতা।)

৬।—ভারসহত্ব—কোন কোন দ্রব্য পার্শ্বের দিকে ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু দৈর্ঘ্যের দিকে সহজে ছিন্ন হয় না। তাদৃশ বস্তু সকলকে ভারসহ বলে। একখানি সরু কাচের দুই দিক্ ধরিয়া তাহার মধ্যভাগে কোন বস্তু চাপাইয়া দিলে, ঐ কাচ সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেই ভার ঐ কাচের এক দিকে বান্ধিয়া ঝুলাইয়া দিলে কাচ ছিন্ন হয় না; অতএব কোন দ্রব্য ভঙ্গ-প্রবণ, কেহ বা ছেদ-প্রবণ; যে ছেদ-প্রবণ নয় তাহাকেই ভারসহ বলা গিয়া থাকে। বস্তুতঃ যে ভঙ্গপ্রবণ নয় তাহাকেও ভারসহ বলা যাইতে পারে।

জড় পদার্থের যে সকল পরীক্ষা-সিদ্ধ গুণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে তাহারাও প্রায় সকলেই এই স্থলে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। ইহা সহজেই বোধ হয় যে, বিস্তার্য্যতা, সঙ্কোচ্যতা, স্থিতিস্থাপকতা, বিভাজ্যতা এবং সছিদ্রতা প্রভৃতি গুণের তারতম্য কেবল পরমাণু সমস্তের বিশেষ বিশেষ প্রকার বিনিবেশ বশতঃই জন্মিতে পারে। পরমাণুদিগের বিভিন্ন প্রকার বিনিবেশ হওয়াতে বিবিধ দ্রব্যের যে সমস্ত সঞ্চারী গুণ জন্মে তাহার মধ্যে যেগুলি কথিত হইল তৎসমুদায়ই বলপ্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষিত হয়। অন্যান্য প্রকারে উহাদিগের

যে আরও নানাবিধ গুণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই স্থলে সমুদায় বলা বাহুল্য হয়। কিন্তু সমুদায় বলা না যাউক, তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

১।—মিশ্রতা—কতক গুলি দ্রব্য এমত যে, তাহারা সহজেই জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। চিনি জলের সহিত মিশে। বালুকা কদাপি মিশে না, উহা একবার মিশ্রিত করিয়া দিলে আবার নীচে গিয়া সংযত্র হইয়া অবস্থিত হয়। অতএব চিনি যেমন মিশ্র বালুকা তেমন নয়।

২।—উদ্বেয়তা—কোন কোন দ্রব্যকে বায়ুতে রাখিলে উহারা শীঘ্র বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। সকল সুগন্ধি দ্রব্য এইরূপ। ঐ সকল দ্রব্য যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রের মুখ খুলিয়া রাখিলে উহারা উড়িয়া যায়। কর্পূর অত্যন্ত উদ্বেয়।

৩।—দাহ্যতা—কোন কোন দ্রব্য সামান্য অগ্নি সংযোগেই দগ্ধ হয় কেহ বা কিঞ্চিৎ ঘর্ষণেই জ্বলিয়া উঠে। এই সকল দ্রব্যকে দাহ্য বলে। শুষ্ক তৃণকাষ্ঠাদি দাহ্য পদার্থ বলিয়া পরিগণিত।

৪।—দীপ্যতা—কোন কোন দ্রব্য অগ্নি সংযোগে যেমন দগ্ধ হইতে থাকে তেমনি উহা হইতে অত্যন্ত আলোক নির্গত হয়। সেই সকল পদার্থকে দীপ্য বলা যায়। কর্পূর ও বিলাতি দীপশলাকার মুখে যে পদার্থ * থাকে তাহাও অত্যন্ত দীপ্য।

৫।—স্বচ্ছতা—কোন কোন দ্রব্য এমত যে তাহাদিগের ভিতর দিয়া আলোক আসিতে পারে—সুতরাং সেই সকল দ্রব্য দ্বারা চক্ষু আবৃত করিলে দৃষ্টি রোধ হয় না। এমত সকল পদার্থকে স্বচ্ছ বলা যায়। পরিষ্কার কাচ জল ও বায়ু অতিশয় স্বচ্ছ।

৬।—বন্ধুরত্ব— কোন দ্রব্যই সর্ব্বতোভাবে সমপৃষ্ঠ নহে। যাহাকে অতি মসৃণ বোধ হয় তাহাকেও অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে অত্যন্ত

* ঐ পদার্থের নাম দীপক, উহাকে ইংরেজীতে 'ফসফরস্' বলে।

বন্ধুর দেখা যায়। ফলতঃ পারমাণু সমস্ত যদি পরস্পর কিছু কিছু অন্তর থাকে তাহা হইলেই দ্রব্যের বন্ধুরত্ব গুণ জন্মিবে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে। বন্ধুরত্বের বিপরীত গুণ মসৃণত্ব।

৬।—দ্রাব্যতা—কোন কোন দ্রব্য তাপ সংযোগে দ্রব হইয়া তরল হয়। যেমন মম, সীসক, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি। ইহাদিগকে দ্রাব্য বলা যায়।

৮।—বর্ণ—বর্ণও সঞ্চারী গুণের মধ্যে পরিগণিত। যে দ্রব্য আলোকের যেরূপ রশ্মিকে প্রতিহত করে তাহার সেই বর্ণ বোধ হয়। শুভ্র দ্রব্য হইতে সকল আলোক রশ্মিই প্রতিহত হয়, কৃষ্ণ বর্ণ দ্রব্যে তাহারা সকলেই শোষিত হয়।

এই সকল ও অপরাপর সঞ্চারী গুণের সবিশেষ বর্ণন ক্রমশঃ অন্যান্য বিজ্ঞান কাণ্ডের যথাযোগ্য স্থানে করা যাইতে পারে।

গতি।

প্রথম অধ্যায়।

[গতির কারণ বল—গতির বেগ, কাল এবং দূরত্বাদির পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ।]

কোন বস্তুর এক স্থান হইতে স্থানান্তর হওয়ার নাম গতি। বল প্রয়োগ ব্যতিরেকে কোন জড় পদার্থের গতি উৎপাদন করা যায় না। কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জড় পদার্থের প্রতি অধিক বল প্রয়োগ

করিলে তাহার গতি অধিক দূর পর্য্যন্ত হয়, এবং অল্প বল প্রয়োগ করিলে অল্প দূর হয়। এই হেতু বলকেই গতির কারণ বলিয়া বিবেচনা করা যায়।

যেমন জড় পদার্থ মাত্রেই স্থান-ব্যাপক তেমনি ক্রিয়া মাত্রই কাল-ব্যাপক। অর্থাৎ যেমন কোন জড় পদার্থ আছে, ইহা ভাবিতে গেলেই উহা কিয়ৎ পরিমাণ স্থান ব্যাপক হইয়া আছে বোধ হয়, তেমনি কোন ক্রিয়া হইতেছে এরূপ অনুমান করিতে গেলেই ঐ ক্রিয়া কিয়ন্মিত কাল ব্যাপক হইয়া আছে, ইহা আপনা হইতেই প্রতীত হয়। গতিও একটী ক্রিয়া। সুতরাং অমুক দ্রব্যের গতি হইতেছে বা অমুক দ্রব্য চলিতেছে এমত বলিলেই ঐ গতি কি পরিমাণ কালে হইতেছে ইহা সহজেই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে।

যদি অল্প কালের মধ্যে অধিকদূর গতি হয় তবে ঐ গতির বেগ অধিক বলা যায়। যদি অধিক কালে অল্প দূর গতি হয় তবে গতির বেগ অল্প বলা যায়। অতএব গতির দূরত্ব এবং তাহার কাল, এই দুয়ের পরস্পর সম্বন্ধ যেরূপ তাহাতেই গতির বেগ নিশ্চয় হয়।

যদি কোন ঘোটক ৪ ঘণ্টা কাল মধ্যে ৩২ ক্রোশ পথ গমন করে তবে তাহার বেগ কত ইহা নিরূপণ করিতে হইলে ৩২ এবং ৪ এই দুই সংখ্যার পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক। দেখা যাইতেছে যে, বত্রিশ চারির আট গুণ—অতএব ঐ ঘোটকের গতির বেগ ৮ অবধারিত হয়—অর্থাৎ ঐ ঘোটক প্রতি ঘণ্টায় আট ক্রোশ পথ যায়। গতির দূরত্ব, কাল এবং বেগ এই তিনের মধ্যে যদি দুইটী জানা থাকে তাহা হইলে অপর অব্যক্তটীও জানা যায়। যথা যে ঘোড়ার গতির বেগ ৮ সে ৪ ঘণ্টায় কত দূর যাইবে? এমত জিজ্ঞাস্য হইলে বিবেচনা করা আবশ্যক যে যদি দূরত্বকে কাল দ্বারা বিভাগ করিলে বেগ পাওয়া যায়, তবে বেগকে কাল দ্বারা পূরণ করিলে অবশ্য দূরত্ব পাওয়া যাইবে। অতএব ৮ × ৪ = ৩২

অর্থাৎ ঐ ঘোটক ৪ ঘণ্টায় ৩২ ক্রোশ যাইবে। আবার, যে ঘোড়ার গতির বেগ ৮ সে, যদি ৩২ ক্রোশ পথ গিয়া থাকে, তবে কতক্ষণ চলিয়াছিল? এমত জিজ্ঞাস্য হইলে বিবেচনা করা উচিত যে, বেগকে কাল দ্বারা পূরণ করিয়া দূরত্ব জানা যায়, তবে দূরত্বকে বেগ দ্বারা হরণ করিলেই কাল জানা যাইবে। সুতরাং এ স্থলে ৩২ ÷ ৮ = ৪; অর্থাৎ ঐ ঘোটক চারি ঘণ্টায় ৩২ ক্রোশ গিয়াছিল।

যদি 'দূ' 'কা' এবং 'বে' এই সাঙ্কেতিক বর্ণে দূরত্ব, কাল এবং বেগ বুঝায় তবে গণিত শাস্ত্রের সঙ্কেতানুসারে ঐ তিনের পরস্পর সম্বন্ধ সঙ্ক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতে পারে; যথা—

(১) দূ : কা = বে, অথবা দূ ÷ কা = বে, যথা, $\frac{৩২}{৪}$ = ৮

(২) বে × কা = দূ যথা, ৮ × ৪ = ৩২

(৩) দূ ÷ বে = কা যথা, $\frac{৩২}{৮}$ = ৪

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[গতির প্রথম নিয়ম—দ্বিতীয় নিয়ম—গতি-সঙ্ঘাত—গতি-বিভাগ—দোলন—চক্রভ্রমণ—কেন্দ্রাভিমুখ এবং কেন্দ্রবিমুখ-বল।]

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, জড়পদার্থের স্থানান্তর হওয়ার নাম গতি এবং সেই গতির কারণ বল। 'স্থানান্তর' বলিলেই যে স্থানে জড়পদার্থ প্রথমে অবস্থিত ছিল এবং পরে উহা যে স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল এই দুইটী স্থানই অনুভূত হয়। ঐ দুই স্থানের পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া গতির নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে, যে দিক হইতে জড়পদার্থের প্রতি বল প্রয়োগ হয়, উহা তাহার বিপরীত দিকে সরল রেখা ক্রমে চলিয়া যায়। কিন্তু জড় নিশ্চেষ্ট। সুতরাং যদি কোন জড় পদার্থ একবার চলিতে আরম্ভ করে, তবে সে কদাপি স্বয়ং ঐ গতি নিবারণ করিয়া

স্থির হইতে পারে না। অতএব জড়ের সচল হইতেও যেমন বল প্রয়োগের প্রয়োজন, নিশ্চল হইতেও সেই রূপ, অন্যথা সে কদাপি আপন গতির বেগাহ্রস্ব বা সম্বর্দ্ধিত করণে সমর্থ হয় না।

এইরূপ বিবেচনা করিয়া নিশ্চিত হইতেছে যে, "জড় পদার্থের প্রতি বল প্রযুক্ত হইলে উহা সেই বলের অভিমুখে সরল রেখা ক্রমে চিরকাল সমান বেগে চলে"। ইহাই গতির প্রথম নিয়ম। এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে এইরূপ নিয়ম হইলে চালিত বস্তুর চির-সচলতা কোথাও দেখিতে পাইনা কেন? শর নিক্ষেপ করিলে, ভাঁটা গড়াইয়া দিলে, লাঠিম ঘুরাইলে, কেহ নিবারণ না করিলেও যে উহারা আপনা হইতেই স্থির হয়, ইহার কারণ কি?। তাহার উত্তর এই যে, বায়ুর প্রতিবন্ধকতা, ভূমির ঘর্ষণ এবং পৃথিবীর আকর্ষণ ঐ সকল স্থলে প্রতিবন্ধকতা করিয়া গতি নিবারণ করে। যদি ঐ সকল প্রতিবন্ধকতা না থাকিত, তবে উৎক্ষিপ্ত শর চিরকাল সমবেগে উর্দ্ধে উঠিত, ভাঁটা ক্রমাগত গড়াইয়া যাইত এবং লাঠিমও যাবৎকাল ঘূর্ণিত হইত।

এই সিদ্ধান্ত কেবল অনুমানসিদ্ধ হইলেও অপ্রমাণ নহে, কারণ এই অনুমান প্রত্যক্ষ-মূলক; দেখ কোন সমতল ঘরের মেজ্যায় ভাঁটা গড়াইয়া দিলে উহা যত দূর যায়, সেই বলে সেই ভাঁটাকে ঘাসের উপর ছাড়িয়া দিলে ততদূর যাইতে পারে না, বিষমতল ঘাসের ঘর্ষণ উহার গতির অধিকতর প্রতিবন্ধক হয়। এবম্প্রকার যন্ত্র আছে যে, তাহা দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে প্রায় সমুদায় বায়ু বাহির করিয়া লওয়া যায়। তখন ঐ স্থানে একখানি চক্র ঘুরাইয়া দিলে সেই চক্র বহুক্ষণ ঘুরে; সুতরাং বায়ু যে গতির প্রতিবন্ধক তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইতেছে। পৃথিবীর নিকটে থাকিয়া ইহার অতি প্রবল তর আকর্ষণ-শক্তির বশবর্ত্তী না হইয়া থাকিবার যদি কোন উপায় থাকিত, তবে গতির এই নিয়ম একেবারেই প্রত্যক্ষ করা যাইত। কিন্তু-

তাহা না হউক, যে স্থানে ঘর্ষণ নাই—বায়ুর প্রতিবন্ধকতা নাই, এবং পৃথিবীর আকর্ষণও অধিক কার্য্যকারী হয় না, সেই সকল অতি দূরবর্ত্তী গ্রহ নক্ষত্রাদি স্থলে জড় পদার্থের চিরসচলতার সম্যক্ উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; সেই সকল পদার্থ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেও যেমন চলিতেছিল অদ্যাপি তাহারা সেইরূপ চলিতেছে।

গতির দ্বিতীয় নিয়ম—গতি সঙ্ঘাত।

কোন জড় পদার্থের প্রতি একটী মাত্র বল প্রদত্ত হইলে যেরূপ ঘটে তাহা কথিত হইল। যদি একেবারে একাধিক দুই তিন বা তদধিক বল প্রযুক্ত হয় তাহা হইলেও পূর্ব্ব নিয়মের কিছু মাত্র অন্যথা হয় না, "জড়ের প্রতি যত বল কেন একেবারে দেওয়া যাউক না, সকল বল গুলি স্ব স্ব অভিমুখে সরল রেখাক্রমে উহার গতি উৎপাদন করে"। এইটী গতির দ্বিতীয় নিয়ম।

এই স্থলে বিবেচনা করা উচিত যে জগতে কাহারও বিনাশ হয় না। যেমন এক প্রকার জড় পদার্থের সহিত অন্য প্রকার জড়ের সংযোগ হওয়াতে তাহার রূপান্তর মাত্র হয়, কিন্তু তাহার একটী পরমাণুরও ধ্বংশ হয় না, বলেরও সেইরূপ ঘটিতেছে; একটী বলে যে প্রকার কার্য্য হইত অন্য বলের যোগে সেই কার্য্যের কিছু ভিন্ন ভাব মাত্র দৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু কোন বল যে একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে তাহার সম্ভাবনা নাই।

ফলতঃ কোন জড় পদার্থের প্রতি একেবারে দুইটী বল প্রযুক্ত হইলে যে প্রকার গতি হয় তাহাতে দুইটী বলেরই কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত একটী প্রতিরূপ প্রদত্ত

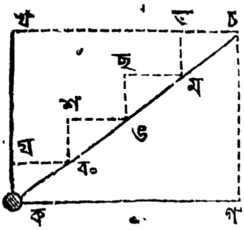


হইল, 'ক' নামক কোন কন্দুকের প্রতি এক সময়ে এমত দুই বল প্রদত্ত হইয়াছে যে, তাহার একটীর প্রভাবে উহা কোন নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে 'ক' হইতে 'গ' পর্য্যন্ত এবং অপরটীর প্রভাবে উহা সেই কালের মধ্যে

'ক' হইতে 'খ' পর্য্যন্ত যায়। 'ক' ঐ দুই বলেরই অধীন হইয়া কার্য্য করে —অর্থাৎ ঐ দুই গতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইলেও 'ক' যে স্থানে যাইত উহা সেই স্থানেই যায়। কারণ, বিবেচনা করিতে হইবে যে প্রথমতঃ উহার গতি যদি 'কগ' বলের প্রভাবে 'গ' পর্য্যন্ত হয় তবে দ্বিতীয় 'কখ' গতি ঐ 'গ' স্থান হইতে অবশ্য হইবে এবং 'ক' যে অভিমুখে এবং যত দূর পর্য্যন্ত আছে 'গ' হইতে ঠিক সেই মুখে তত দূর অর্থাৎ 'চ' পর্য্যন্ত যাইবে। একেবারে দুই বলের কার্য্য হওয়াতেও তাহাই হইবে। অর্থাৎ 'ক' 'চ' স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইবে।

'কখ' যে অভিমুখে, 'গচ' সেই অভিমুখে, 'কখ' যত দূর, 'গচ' ঠিক তত দূর ; ইহা বিবেচনা করিলেই বোধ হইবে যে 'খ' এবং 'চ' একটী সরল রেখা দ্বারা যোগ করিলে 'কখগচ' একটী সমান্তরাল চতুর্ভুজ-ক্ষেত্র হইবে, তাহার পরস্পর সম্মুখীন দুই দুই ভুজ সমান এবং 'কচ' তাহার কর্ণরেখা। সুতরাং ঐ কর্ণরেখা ক্রমেই আহত দ্রব্যের গতি হয়।

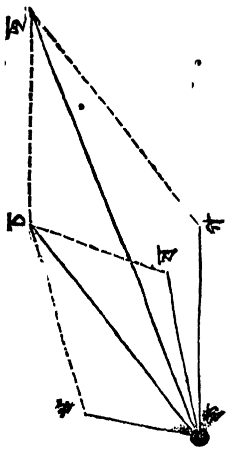
পূর্ব্বে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা অভিনিবেশপূর্ব্বক বিবেচনা করিলেই দুই গতির যোগে যে কর্ণ রেখাক্রমে গতি জন্মে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। নিম্নলিখিত আদর্শে 'কঘ' প্রভৃতিকে 'কখ' প্রভৃতির



সূক্ষ্মতম অংশ বিবেচনা করিয়া লইয়া দেখ, যখন 'ক' উহার 'কখ' রেখায় যে গতি হওয়া আবশ্যক, সেই গতির অনুসারে 'ক' হইতে 'কখ'র কিয়দংশ 'ঘ' পর্য্যন্ত যায় সেই কালে উহাকে 'কগ' অভিমুখ গতির প্রভাবে 'ঘব' রেখায় আসিতে হয়। পুনর্ব্বার যখন উহা 'বশ' রেখায় যায় সেই সময় দ্বিতীয় গতির প্রভাবে 'শঙ' রেখানুসারেও আসিতে হয়। সুতরাং এইরূপ ক্ষণেক 'ঙছ' ক্ষণেক 'ছম' ও তাহার পর 'মভ' এবং 'ভচ' এইরূপে যাইয়া 'ক' নামক দ্রব্য 'চ'

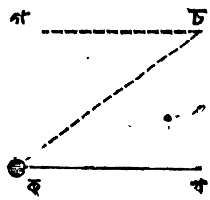
স্থানে উপনীত হয়। 'কচ' নামক কর্ণরেখা 'কখ' এবং 'কগ' এই দুই গতির-সঙ্ঘাত-ফল বলিয়া উহার নাম "গতি-ফল" রাখা গিয়াছে।

তিনটী চারিটী বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন বল একেবারে প্রযুক্ত হইলেও তজ্জন্য যে 'গতি-ফল' উৎপন্ন হয়, তাহাও এই প্রকারে জানা যাইতে পারে।



পার্শ্ববর্ত্তী আদর্শে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে যে 'ক' নামক কোন দ্রব্যের প্রতি তিনটী বল প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার একটীর প্রভাবে উহার গতি 'ক' হইতে 'খ' পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় দ্বারা 'ঘ' পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় দ্বারা 'গ' পর্য্যন্ত হয়। ঐ তিন বলের গতি-ফল কোথায় হইবে? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইলে প্রথমতঃ বিবেচনা করিতে হইবে যে, এই স্থলে যেন দুইটী মাত্র বল প্রদত্ত হইয়াছে। সেই দুইটী যেন 'কখ' এবং 'কঘ'। তবে ঐ দুয়ের গতি-ফল নিশ্চয় করিতে হইলে 'খ' হইতে 'কঘ' এর সমান্তরাল এবং সমান 'খচ' রেখা টানিয়া 'কচ' যোগ করিয়া দিলে ঐ 'কচ' উক্ত দুই বলের গতি-ফল বলিয়া অবধারিত হইবে। এক্ষণে এমত বলা যাইতে পারে যে 'কচ' গতি 'কখ' এবং 'কঘ' এই দুই গতির কার্য্য করিতেছে। পরে 'গ' হইতে 'কচ' এর সমান্তরাল এবং সমান 'গছ' রেখা টানিয়া 'কছ' সংযুক্ত করিয়া দিলে 'কচ' এবং তৃতীয় গতি 'কগ' ইহাদিগের গতি-ফল নির্দ্ধারিত হইবে। সুতরাং 'কছ'ই প্রযুক্ত তিনটী গতির গতি-ফল। এই প্রকারে করিয়া চারিটী হউক বা পাঁচটী হউক সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন গতির গতি-ফল অবধারিত হইতে পারে।

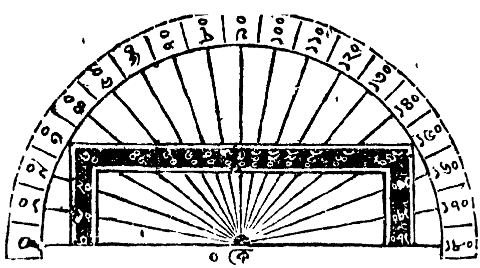
একখানি ক্ষুদ্র গজ্ * থাকিলে অতি অ[ল্প]ায়াসেই গতি-ফল নিরূপিত করা যায়। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, যদি উত্তর এবং পূর্ব্ব উভয় দিক হইতে ঠিক এক সময়ে কোন একটী দ্রব্যের প্রতি এমন দুইটী আঘাত হইয়া থাকে যে উত্তর দিকের আঘাত প্রভাবে ঐ দ্রব্য যে সময়ে ৪ হাত দক্ষিণদিকে যায়, পূর্ব্বদিকের আঘাত দ্বারা উহা সেই সময়ে ৩ হাত পশ্চিমদিকে যায়, তাহা হইলে প্রথমে গজ ধরিয়া ৪ হাতকে, ৪ ইঞ্চি কল্পনা করিয়া একটী রেখা পাত কর। সেই রেখা 'কখ' হউক। পরে উত্তরদিক্ এবং পূর্ব্বদিকে ৯০ অংশ পরিমিত কোণ হয় ইহা বিবেচনা করিয়া 'ক' স্থান হইতে ঐ গজ দ্বারা



'খকগ' একটী ৯০ অংশ কোণ কর †। 'কগ' রেখাকে তিন ইঞ্চি পরিমিত করিয়া লও। পরে পূর্ব্ববৎ 'গ' হইতে 'কখ' এর সমান এবং সমান্তরাল 'গচ' রেখা পাত করিয়া যদি 'কচ' রেখা টানাযায় তাহা হইলেই 'কচ'

---

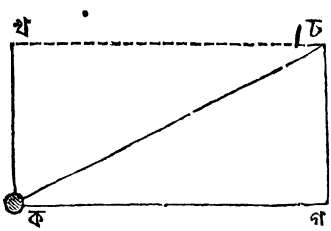
* এই গজ্ আমীনেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। উহার নাম প্রোট্রাকটিং স্কেল। ঐ গজ্ অতি সহজেই প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহার প্রতিরূপ এই—



† একটা কাগজে উপরিলিখিত প্রতিরূপবৎ একটী বৃত্তার্দ্ধ প্রস্তুত কর। এবং তাহাকে টিত্রানুরূপে বিভক্ত কর। তাহার পর ঐ বৃত্তার্দ্ধের ভিতর যেপ্রকার চতুষ্কোণ ক্ষেত্র করা গিয়াছে সেইরূপ করিয়া এবং উহার অংশ সমস্তকে যথাক্রমে অঙ্কিত করিয়া ঐ

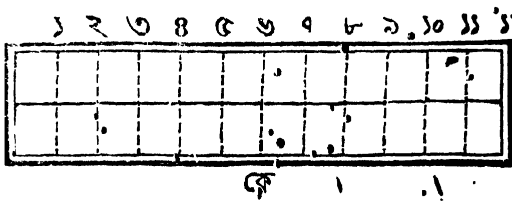
রেখা গতি-ফলের প্রতিরূপ হয়; গজ দ্বারা মাপিলে ঐ 'কচ' ৫ ইঞ্চি পরিমিত হইবে, সুতরাং এই স্থলে বাস্তবিক গতি-ফল ৫ হাত নির্দ্ধারিত হয়।

যেরূপ ক্রিয়া দ্বারা গতির সঙ্ঘাত ফল নিরূপিত করা যায়, তাহার বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা যদি দুই গতির ফল এবং তাহার একটী গতি জানা থাকে, তবে অপর গতিও জানা যাইতে পারে। নিম্নবর্ত্তী চিত্রে যদি 'কখ' একটী গতির এবং 'কচ' গতি দ্বয়ের সঙ্ঘাত-ফলের



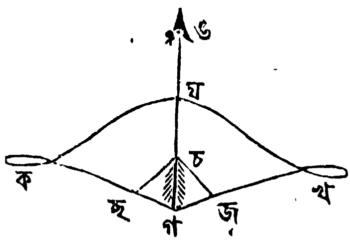
প্রতিরূপ হয় তবে অপর গতির প্রকৃতি জানিবার নিমিত্ত 'চ' হইতে 'কখ' এর সমান এবং সমান্তরাল 'চগ' নামক রেখা পতিত করিতে হয়। তাহার পর 'কগ' যোগ করিয়া দিলে ঐ 'কগ' অব্যক্ত গতির প্রতিরূপ হইবে। গজ্ দ্বারা মাপিয়া ঐ গতির পরিমাণও নিশ্চয় করা যাইতে পারে। কিন্তু

আয়ত ক্ষেত্রটা কাটিয়া লও। তাহা হইলেই কোণ মাপিবার উপায় হইবে। যে স্থানে যত বড় কোণ হইবে সেই স্থানে ঐ গজের 'কে' নামক কেন্দ্র স্থান সংস্থাপিত করিবে। পরে যত বড় কোণ করা আবশ্যক তাহা বিবেচনা করিয়া অঙ্কিত করত পেনসিল দ্বারা রেখা টানিয়া দিলেই প্রয়োজনমত কোণ হইবে। ঐ কাগজ খানির অপর পৃষ্ঠকে নিম্নবর্ত্তী দ্বিতীয় প্রতিরূপবৎ ১২টী সমান ভাগে বিভাগ করিয়া রাখিলে তদ্দ্বারা ইঞ্চি প্রভৃতি মাপিয়া লওয়া যাইবে।

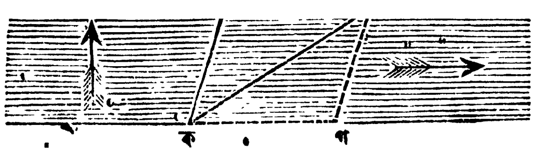


দুইয়ের অধিক গতিদ্বারা যে গতি-ফল উৎপন্ন হয় সে স্থলে গতি-ফল এবং একটী মাত্র গতি জানিয়া অপর গতিগুলি নিশ্চয় জানা যাইতে পারে না। সে স্থানে কল্পনা করিয়া অব্যক্ত গতির নিরূপণ হইয়া থাকে।

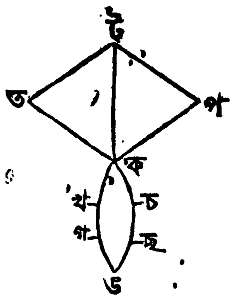
উক্ত রূপ বহু গতি দ্বারা যে এক মাত্র গতি-ফল উৎপন্ন হয় ইহা অনেক স্থলেই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। দেখ যদি দুই জন লোক কোন ব্যক্তির দুই দিকে হাত ধরিয়া টানিতে থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি কোন এক জনের দিকে না গিয়া উভয়ের মধ্য দিয়া যাইবে। যখন ধনুক যোগে শর নিক্ষিপ্ত হয়, তখনও ঐ ধনুকের জ্যা শরকে দুই দিক হইতে ঠেলে, তাহাতে শর উভয় বলের মধ্য স্থান দিয়া গমন করে। পরবর্ত্তী প্রতিরূপে দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিয়া লও।



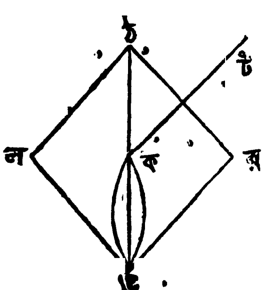
যখন কেহ স্রোতস্বতী নদী সন্তরণ দ্বারা স্বয়ং পার হয় তখন সে ব্যক্তি ঠিক সমান পার হইয়া যাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু জলের স্রোতঃ প্রযুক্ত তাহাকে প্রবাহাভিমুখেও কিয়দ্দূর ভাসিয়া যাইতে হয়।



অতএব সে ঠিক্ সমানরূপে পার হইয়া অপর পারে উঠিতে পারে না, ঊর্দ্ধবর্ত্তী প্রতিরূপে ইহা সপ্রমাণ হইতেছে।

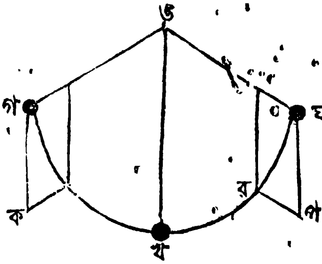


নাবিকেরা এই বিষয় উত্তমরূপ বুঝিয়া থাকে এবং ইহা বুঝিয়া সুকৌশলে নৌকা চালায়। বামভাগস্থ চিত্র দেখিয়া বিবেচনা কর 'কঙ' নামক নৌকার 'চ' 'ছ' 'খ' ও 'গ' এই চারি স্থানে চারিটা দাঁড় আছে। কেবল এক দিকের দাঁড় টানিলে নৌকা ঠিক যায় না; একেবারে দুই দিকের দাঁড় ফেলিতে হয়। 'খ' এবং 'গ' এই দুই স্থানে যে দুই দাঁড় আছে, তদ্দ্বারা নৌকার গতি 'কপ' অভিমুখে হইতে পারে, আর 'চ' 'ছ' স্থলে যে দুই দাঁড় আছে, তদ্দ্বারা উহার গতি 'কত' রেখাক্রমে হয়। সুতরাং উভয় গতির ফল কর্ণরেখাক্রমে হইয়া নৌকা 'কট' রেখায় চলিতে থাকে যে জলে নৌকা চলিতেছে যদি তাহাতে অননুকূলরূপে স্রোতঃ বহিতে থাকে অথবা তৎকালে কোন দিকে বায়ু বহে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত চারিটা দাঁড়ের মধ্যে কাহার বল অপেক্ষাকৃত অধিক বা অল্প হয়, তাহা হইলে নৌকা ঠিক সমান যাইতে পারে না। ঐ সকল বৈষম্য নিবারণ করা কর্ণধারের কর্ম্ম।



এই চিত্রে বিবেচনা করিতে হইবে; 'কঙ' নৌকা 'কঠ' পথে যাইবে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কোন কারণ বশতঃ উক্ত নৌকার গতি 'কট' বা 'ঙর' রেখাক্রমে হইতেছে, এস্থলে কর্ণধারকে এমত করিয়া হালি ধরিতে হইবে যাহাতে নৌকার গতি ঐ সকল প্রতিবন্ধক না থাকিলে 'ঙল' রেখাক্রমে হয়। 'ঙ' হইতে 'রঠ' এর সমান এবং সমান্তরাল

'ঙল' রেখা টানিলে বুঝা যাইবে যে 'ঙর' এবং 'ঙল' এই দুই গতির সংঘাতে 'ঙকঠ' বা 'কঠ' অভিমুখে গতি-কল জন্মিবে।

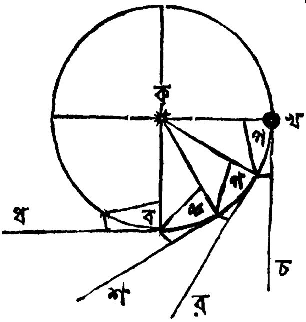


আবার এই চিত্রে বিবেচনা করিয়া দেখ, 'খ' নামক কন্দুক 'ঙখ' রজ্জু দ্বারা লম্বমান আছে। যদি 'খ' কে 'ঘ' পর্য্যন্ত তুলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় তবে উহা 'ঘখগ' নামক পথে পুনঃ পুনঃ গমন করিতে থাকে।

এই স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে যে, 'ঙখ' রজ্জু যত বলে 'খ' নামক কন্দুককে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে, পৃথিবীও ঠিক তত বলে উহাকে নিম্নে আকর্ষণ করিতেছে; কারণ, পৃথিবী অধিক বলে আকর্ষণ করিলে, কন্দুক পৃথিবীর মাধ্যাভিমুখে পড়িয়া যাইত, রজ্জুর বল * অধিক হইলে উহা আরও উর্দ্ধে উঠিত। অতএব বলিতে হইল 'খ'এর প্রতি উপর ও নীচের দুই দিকের বলই সমান। এক্ষণে বোধকর যখন 'খ' 'ঘ' স্থানে গিয়াছে তখন পৃথিবী 'ঘপ' রেখাক্রমে উহাকে আকর্ষণ করিতেছে; তবে 'ঙঘ' অর্থাৎ রজ্জু স্থানীয় বল 'ঘপ' এর সমান হইবে, সুতরাং কন্দুকের গতিফল 'ঘর' প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে ক্রমশঃ হইয়া পরিশেষে 'ঘখগ' চিহ্নিত ধনুর আকারে দৃষ্ট হইবে। পরন্তু কন্দুক যে 'খ' স্থানে আসিয়া ক্রমে ক্রমে আরও উর্দ্ধদিকে উঠিয়া যায় তাহার কারণ ঐ কন্দুকের নিশ্চেষ্টতা গুণ মাত্র—অর্থাৎ যেমন পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জড় বস্তুকে একবার পরিচালিত করিলে সে স্বয়ং নিবৃত্ত হইতে পারে না। এই হেতু 'খ' 'ঙ'এর ঠিক নীচে আসিয়াও স্থির হয় না।

* গতির উৎপাদক এবং নিবারক উভয় কারণকেই 'বল' বলা যায়।

দুই বলের প্রভাবে সকল স্থানেই কেবল সরল রেখায় বা ধনুর আকারে গতি-ফল জন্মে এমত নহে; কোথাও কোথাও দুই বলের সম্পূর্ণ যোগে বৃত্তাকার গতি-ফলও উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ, কোন রজ্জুর এক প্রান্তে একটী কন্দুক বদ্ধ করিয়া এবং ঐ রজ্জুর অপর প্রান্ত মৃত্তিকা প্রোথিত কীলকে বদ্ধ করিয়া যদি কন্দুকের প্রতি এক দিক হইতে বল পূর্ব্বক আঘাত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, কন্দুকটী অনেক বার কীলকের চতুর্দ্দিকে ফিরে। তাহার কারণ পার্শ্ববর্ত্তী চিত্র * দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হইবে। এস্থলে

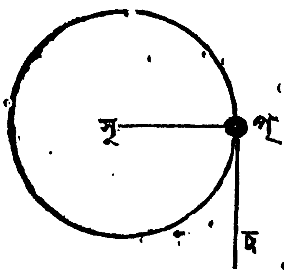


'কখ' রজ্জু 'ক' নামক কীলকে বদ্ধ আছে, এক্ষণে যদি 'খ' এর প্রতি 'খচ' অভিমুখে আঘাত করা যায় তবে উহা সেই আঘাতের বলে 'খচ' স্পর্শ-জ্যা রেখা ক্রমে যাইতে চাহে, কিন্তু 'কখ' রজ্জু দ্বারা বদ্ধ থাকাতে সেইরূপ যাইতে পারে না। 'খক' এবং 'খচ' এই দুই বলের সংঘাতে 'খপ' গতি-ফল জন্মে। পুনর্ব্বার 'পর' এবং 'পক' এই দুই বলের যোগে 'পগ' গতি-ফল হয়। এই প্রকার 'গশ' এবং 'কগ' যোগে 'গফ' হয়, এবং 'ফধ' ও 'কফ' যোগেও ঐরূপ হইতে থাকে। এইরূপে দ্রব্যটা 'খপ' প্রভৃতি সূক্ষ্ম অংশে ক্রমশঃ গমন করত পরিশেষে একটী বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে।

ঘোড়ার চক্র দেওয়া দেখিলে এই ব্যাপার অতি স্পষ্টরূপে বোধ-

* এই চিত্রে কিঞ্চিদ্দোষ হইয়াছে। উভয় বল সংযোগে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান্তরাল চতুর্ভুজ জন্মে তাহা যথার্থরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। রেখা গুলি সমান্তরাল হয় নাই। কিন্তু ইহাতেও তাৎপর্য্যার্থ বোধ হইতে পারিবে।

গম্য হয়। এক জন ঘোড়ার মুখরশ্মি ধরিয়া দণ্ডায়মান থাকে, আর এক ব্যক্তি ঐ অশ্বকে কশাঘাত করে। কশাঘাত করিলেই ঘোড়া বেগে চলিয়া যাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু মুখরশ্মি দ্বারা বদ্ধ থাকাতে উভয় বলের বশীভূত হইয়া চক্রাকার পথে ভ্রমণ করিতে থাকে। পৃথিব্যাদি গ্রহগণ যে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্ব স্ব কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাও উক্ত প্রকার বলদ্বয় প্রভাবেই হইতেছে।



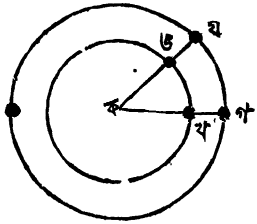
যে দুই বলে বস্তুর চক্রাকার পথে ভ্রমণ হয়, পণ্ডিতেরা তাহাদিগের দুইটী নাম রাখিয়াছেন। যে বলের প্রভাবে দ্রব্য কেন্দ্রের অভিমুখে যায় তাহার নাম কেন্দ্রাভিমুখ, আর যাহার প্রভাবে উহাকে কেন্দ্র ত্যাগ করিয়া যাইতে হয় তাহার নাম কেন্দ্র-বিমুখ বল। উপরিস্থ চিত্রে 'সূ' ও 'পৃ' কে সূর্য্য ও পৃথিবীর প্রতিরূপ স্বীকার কর, এক্ষণে 'পৃচ' রেখায় পৃথিবীর কেন্দ্র বিমুখ বল দৃষ্ট হইতেছে এবং 'সূপ' রেখাতে কেন্দ্রাভিমুখ বল দেখা যাইতেছে। যদি পৃথিবীর প্রতি কেন্দ্রাভিমুখ বল না থাকিত তবে ইহা 'পৃচ' এই স্পর্শ-জ্যা রেখাক্রমে চলিয়া যাইত, বৎসরে বৎসরে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিত না। আবার যদি ইহার প্রতি কেন্দ্র-বিমুখ বল না থাকিত তাহা হইলে ইহা 'পৃসূ' রেখাক্রমে সূর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ তাহার নিকটবর্ত্তী এবং পরিশেষে সূর্য্য শরীরে পতিত ও তাহাতে বিলিপ্ত হইত।

যেমন সরল রেখায় যে গতি-ফল জন্মে তাহাকে বিভাগ করিয়া সেই গতি-ফল কোন্ কোন্ গতির সংঘাতে জন্মিয়াছে তাহা জানিতে পারা যায়, সেই রূপ চক্রাকার গতিতেও যে কেন্দ্রাভিমুখ এবং কেন্দ্রবিমুখ দুই বলের কার্য্য হইতেছে তাহাও গণিত

শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ আশ্রয় লইলেই অনায়াসে বুঝোতে পারা যায়। ঘোড়াকে চক্র দেওয়াইবার সময় যদি হঠাৎ তাহার মুখরশ্মি ছিন্ন হয়, তবে ঘোড়া সরল রেখাক্রমে বেগে চলিয়া যায়। বালকেরা যখন ফিঙ্গা দ্বারা ঢিল ছোড়ে তখন ফিঙ্গাটীকে বারকত ঘুরাইয়া ঢিল ছাড়িয়া দেয়, ছাড়িয়া দিবামাত্র ঐ ঢিল অতিশয় বেগে সরল রেখাক্রমে গমন করিতে আরম্ভ করে। ছুরিতে শাণদিবার সময় শাণটা চক্রাকারে ঘুরে, কিন্তু তদ্দ্বারা ছুরির মল সমস্ত সরল রেখাক্রমে বাহির হইয়া পড়িতে থাকে। যাঁতায় কোন দ্রব্য চূর্ণ করিতে যত বেগে যাঁতা ঘুরাইয়া দেওয়া যায়, উহা হইতে চূর্ণ সমস্ত তেমনি বেগে সরল রেখাক্রমে বাহির হইয়া আইসে। লাঠিম ঘুরাইয়া তাহার উপর কোন ক্ষুদ্র দ্রব্য রাখিয়া দিবার চেষ্টা করিলেই দেখা যায় যে, ঐ দ্রব্য লাঠিম কর্ত্তৃক সরল রেখাক্রমে দূরীকৃত হইতে থাকে।

কেন্দ্রাভিমুখ এবং কেন্দ্রবিমুখবল দুই পরস্পর সমান না থাকিলে কোন দ্রব্যের চক্র গতি হইতে পারে না। কারণ যদি কেন্দ্রবিমুখ-বল অধিক হয়, তবে দ্রব্যটা স্পর্শজ্যাক্রমে যায়, আর যদি কেন্দ্রাভিমুখ-বল অধিক হয়, তবে উহাকে ক্রমশঃ কেন্দ্রের নিকটে যাইতে হয়। অতএব এই দুই বলের মধ্যে একটীর পরিমাণ নিশ্চয় করিতে পারিলে দুইটীরই পরিমাণ নিরূপিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাদিগের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা অপেক্ষা কিরূপে ইহাদিগের হ্রাস বৃদ্ধি হয় তাহা প্রথমতঃ জানা আবশ্যক। দেখা গিয়াছে, রজ্জুতে একটা ডিল বাঁধিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে যদি ক্রমশঃ তাহার বেগ বৃদ্ধি করা হায়, তবে রজ্জু ছিন্ন হয়। সুতরাং চক্রগতির বেগ বৃদ্ধি হইলে তাহার কেন্দ্রবিমুখ-বলও বর্দ্ধিত হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইল। আবার ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে রজ্জুতে কোন লঘু দ্রব্য বন্ধন করিয়া ঘুরাইলে রজ্জু ছিন্ন হয় না কিন্তু যদি তাহাতে কোন গুরু দ্রব্য বন্ধন করিয়া ঘূর্ণিত করা যায় তবে

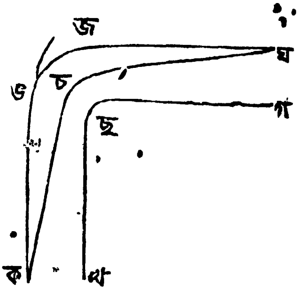
সেই বেগেই রজ্জু ছিন্ন হয়। অতএব ইহাও স্বীকার করিতে হইল যে, দ্রব্য ভারী হইলে তাহার চক্র ভ্রমণে কেন্দ্র-বিমুখ-বল গরিষ্ঠ হইয়া থাকে। অপিচ, ইহাও দৃষ্ট হইয়া থাকিবে যে, কোন দ্রব্যকে একটী রজ্জুর অগ্রভাগে বন্ধন করিয়া এবং সেই রজ্জুর অপর প্রান্ত অঙ্গুলি দ্বারা ধারণ করিয়া যদি তাহাকে ঘূর্ণিত করা যায় এবং ঐ প্রকারে ঘূর্ণিত করিতে করিতে ক্রমশঃ রজ্জুকে দীর্ঘ করা যাইতে থাকে, তবে রজ্জুটী যত দীর্ঘ হয় তাহাকে ঘূর্ণিত করিতে ততই অধিক বলের প্রয়োজন হইতে থাকে। এইরূপ করাতে কখনও বা রজ্জু সমধিক দীর্ঘ হইয়া ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব বোধ হইতেছে যে, কেন্দ্র হইতে যত দূর কোন দ্রব্য ঘূর্ণিত হয়, তাহার কেন্দ্র-বিমুখ-বল ততই বাড়ে। ফলতঃ এইরূপে যে কেন্দ্র-বিমুখ-বল বর্দ্ধিত হয় তাহার কারণ কেবল দ্রব্যের ভ্রমণ কালীন বর্দ্ধিত বেগ মাত্র। ইহা এই প্রতিকৃতি দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হইবে।



রজ্জু ক্ষুদ্র থাকিলে যদি দ্রব্যটা কোন নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে 'খ' হইতে 'ঙ' পর্য্যন্ত যায় এবং রজ্জু দীর্ঘ হইলে যদি ঐ দ্রব্য সেই কালের মধ্যে 'গ' হইতে 'ঘ' পর্য্যন্ত যাইতে থাকে এমত হয়, তবে 'খঙ' যত স্থান 'গঘ' তাহা হইতে অধিক স্থান ইহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। পরন্তু সমকালে অধিক স্থান পাওয়া বেগ অধিক না হইলে হয় না। অতএব রজ্জু দীর্ঘ করায় বেগ বাড়ে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইল।

১।—কেন্দ্রবিমুখ-বলের কার্য্য নানা স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। বেগে দৌড়িতে দৌড়িতে, যদি কাহাকেও পথের বক্রতা প্রযুক্ত বক্র হইয়া যাইতে হয়, তবে দেখিতে পাই তিনি সেই বক্রস্থলে

উপস্থিত হইলেই পথের মধ্য দিকে সরিয়া আইসেন। তাহা

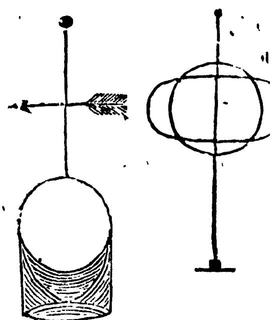


না আসিলে পথের বহির্ভূত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। 'কখগঘ' যেন একটী বক্র পথ। ঐ-পথে বেগে যাইতে হইলে 'ক' হইতে 'ঙ' পর্য্যন্ত এবং 'ঙ' হইতে 'ঘ' পর্য্যন্ত সমান রূপে যাওয়া যায় না। 'ক' হইতে 'ঙ' পর্য্যন্ত বেগে চলিয়া গেলে 'ঙ' উত্তীর্ণ হইয়া বহিষ্কৃত 'জ' স্থানে পড়িতে হয়। এই জন্য 'কচঘ' রেখাক্রমে যাওয়া আবশ্যক, এবং ঐ রেখাক্রমে যাইবার কালে 'খছগ' অভিমুখে ঝুঁকিয়া যাইতে হয়। আর বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাও স্পষ্ট বোধ হইবে যে, এইরূপ গমন কালে যে দিকে ঝুঁকিয়া যাওয়া যায় সেই দিকে পাদের কনিষ্ঠাঙ্গুলির দিক ও অপর দিকের পাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিক যেমন বলে ভূতল স্পর্শ করে অপর ভাগ তেমন করে না। এইরূপে কেন্দ্র-বিমুখ-বলের বিপরীত কার্য্য করিয়া অনায়াসে বেগে যাওয়া যায়। শকটাদির এইরূপ করিয়া চলিবার সামর্থ্য নাই। সুতরাং তাহারা যাইতে যাইতে প্রায়ই সুকৌশলে চালিত না হইলে ঐ সকল স্থলে স্থগিত হইয়া থাকে, অথবা পড়িয়া যায়।

২।—আবর্ত্ত হইলে মধ্যস্থলের জল নিম্ন এবং পার্শ্বের জল উচ্চ হইয়া উঠে তাহারও কারণ কেন্দ্র-বিমুখ-বল। ইহা অতি সহজে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। একটা গ্লাসে অর্দ্ধ গ্লাস পরিপূর্ণ জল রাখিয়া যদি সেই গ্লাসকে দুই হাতে ঘর্ষণ দ্বারা বেগে ঘূর্ণিত করা যায়, তবে গ্লাসের মধ্যভাগের জল নিম্ন এবং পার্শ্বের জল উন্নত হইয়া উঠে। অধিক বেগে ঘুরাইলে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে।

৩।—জলপূর্ণ-ভাণ্ডের মুখে রজ্জু বন্ধন করিয়া যদি অতি বেগে

সেই ভাণ্ডকে ঘূর্ণিত করা যায়, তবে জল মস্তকের উপর দিয়া উল্টা-ইয়া আইসে, তথাপি কেন্দ্র-বিমুখ-বলের প্রভাবে ভাণ্ড হইতে নীচে পড়িয়া যায় না। নিম্নবর্ত্তী প্রথম প্রতিকৃতি দেখিয়া ইহা সপ্রমাণ করিয়া লও।



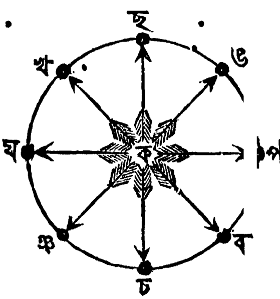
৪।—বালকেরা যে ফিঙ্গা লইয়া খেলা করে তাহার ঢিল যে নীচে প-ড়িয়া যায় না তাহারও এই কারণ।

৫।—একটা তাল পত্রকে মুড়িয়া বৃত্তাকার করত যদি ঐ তাল পত্রের দুই স্থানে দুইটী ছিদ্র করিয়া একটা কাষ্ঠিকা পরিহিত করান যায়, এবং ঐরূপ করিয়া কাঠির এক দিক ভূমি স্পর্শ করাইয়া, অপর দিকে দুই হস্ত দ্বারা ঘর্ষণ করত উহাকে অতি বেগে ঘূর্ণিত করা যায়, তবে সেই বৃত্ত ঊর্দ্ধ এবং অধভাগে সঙ্কুচিত হইয়া ক্রমশঃ দুই পার্শ্বে স্ফীত হইয়া উঠিবে।

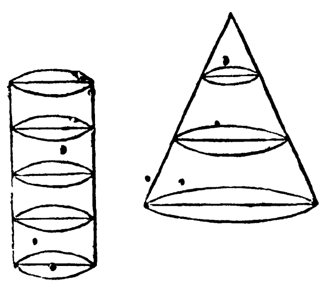
৬।—কোন দ্রব্য ভ্রামিত হইলেই এইরূপ ঘটে। পৃথিবীও আপন ব্যাসের উপর বেগে অনবরত ভ্রমণ করিতেছে। সুতরাং ইহারও মধ্যভাগে অধিক স্ফীত হইবার সম্ভাবনা, বাস্তবিক তাহাই হইয়াছে। পৃথিবীর নিরক্ষদেশ-বেষ্টন-কারী বৃত্তের ব্যাস যত বড় ইহার উভয়-মেরু-বেষ্টনকারী বৃত্তের ব্যাস তত বড় নয়। নিরক্ষ বৃত্তের ব্যাস প্রায় ২৩ ভূগোল মাইল অধিক।

৭।—কেন্দ্রবিমুখ-বলের আর কতক গুলি উত্তম উদাহরণ আছে, অভিনিবেশ পূর্ব্বক বুঝিলে তদ্দ্বারা অনেক শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু গণিত শাস্ত্রে সমীচিন ব্যুৎপত্তি না থাকিলে ঐ গুলির বিশেষ তাৎপর্য্য বোধ হওয়া সুকঠিন—অতএব এই স্থলে কেবল তাহাদিগের উল্লেখ মাত্র করা যাইতেছে।

যখন একখানি থালা বা অপর কোন সমতল দ্রব্যকে অঙ্গুলির ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়া ঘূর্ণিত করা যায়, তখন ঐ দ্রব্যের চক্র গতি হইতে থাকে, কিন্তু উহার কেন্দ্রাভিমুখ বল কোথায় হঠাৎ তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অতএব ঐ স্থলে বিবেচনা করিতে হয় যে, ঐ থালা খানি বহু পরমাণুর সমষ্টি। উহার মধ্যস্থলে, যথা পরবর্ত্তী প্রতিকৃতিতে 'ক'এর নীচে, অঙ্গুলি প্রদান করাতে উহা অঙ্গুলির উপর স্থির হইয়া আছে, এবং বেগে ভ্রামিত হওয়াতে উহার একটী পরমাণু 'ব' যেমন শরাভিমুখে যাইতে চেষ্টা করিতেছে, অপর দিকের পরমাণু 'খ' ও সেইরূপ বিপরীত দিকে যাইবার চেষ্টা করাতে দুইয়ের কেহই যাইতে পারে না।



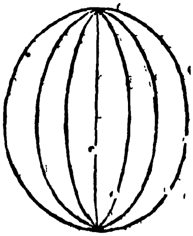
'চ'য়ে 'ছ'য়ে, 'ঙ'তে 'ঞ'তে এবং 'প'য়ে 'ঘ'য়েও এইরূপ হইতেছে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্র-বিমুখ-বলই একটী কেন্দ্রা-ভিমুখ-বলের কার্য্যকারী হইতেছে।



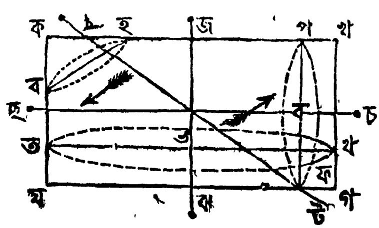
কতক গুলি বৃত্তকে উপর্য্যপরি করিয়া বসাইলে একটী স্তম্ভ হয়। সুতরাং যদি স্তম্ভাকার কোন পদার্থকে উহার কেন্দ্রভেদী কীলকের উপর ঘূর্ণিত করা যায়, তবে ঐ কীলকের উপরে কোন দিক হইতে টান পড়ে না।

নীচের বৃত্তটী বড় তাহার উপরেরটী তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র

এইরূপ অনেক গুলি বৃত্তকে উপর্য্যুপরি সংস্থাপিত করিলে একটী বৃত্তসূচী হয়। সুতরাং বৃত্ত-সূচীরও পূর্ব্বোক্ত গুণ থাকে। অর্থাৎ উহাকে ঘূর্ণিত করিলে সকল দিক হইতেই সমান আকর্ষণ হয়।



বৃত্তের ঘূর্ণনে বর্ত্তুল উৎপন্ন হয়। সুতরাং গোল পদার্থেরও এইগুণ থাকে। অতএব ইহা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যে দ্রব্যকে ঘূর্ণিত করা যায় উহা যে ব্যাসের উপরে নির্ভর করিয়া ঘুরে যদি সেই ব্যাস হইতে দুই দিকের পরমাণু উভয় দিকে সমদূরবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে ব্যাসের উপর কোন দিকে টান পড়ে না। কিন্তু যদি তাহা না হইয়া কোন এক দিকের একটী পরমাণু যে বৃত্তে ভ্রমণ করে তাহার বিপরীত দিকের পরমাণু ঠিক্ সেই বৃত্তে না ঘুরে তাহা হইলেই এক দিকের এক স্থানের কেন্দ্র-বিমুখ-বল অধিক এবং অপর দিকের সেই বল অল্প হওয়াতে ব্যাসের উপর আকর্ষণ হয়। তাদৃশ দ্রব্য কেবল অঙ্গুলির অগ্রভাগের উপরিস্থিত হইয়াই ঘূর্ণিত হইতে পারে না। ইহা একটী প্রতিকৃতি দ্বারা আরও স্পষ্ট করা যাইতেছে।



'কখগঘ' একটী ঘন-চতুষ্কোণ দ্রব্য। উহার একটী ব্যাস 'চছ' আর একটী 'জঝ' এবং আর একটী 'টঠ'। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, 'চছ' ব্যাস ধরিয়া ঐ দ্রব্যকে ঘুরাইলে ঐ 'চছ' এর দুই দিকে 'প' এবং 'ফ' প্রভৃতি যত পরমাণু আছে

তাহারা ঐকবৃত্তিক হইয়া ঘুরিবে। সুতরাং ‘পফ’ এর কেন্দ্র-বিমুখ বল ঠিক সমান এবং পরস্পর বিপরীত দিকে অবস্থিত হওয়াতে ‘চছ’ ব্যাসের ‘ব’ স্থানে কোন দিকে টান পড়িবে না। এইরূপে ‘চছ’ এর সর্ব্বত্রই হইবে।

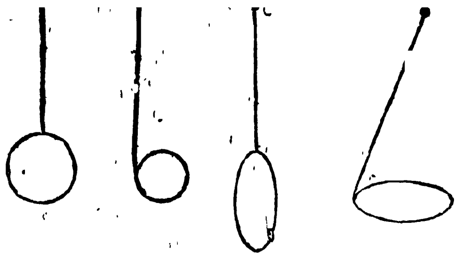
‘জঝ’ ব্যাসের উপর ঘুরাইলেও ঠিক ঐরূপ ঘটিবে। অর্থাৎ ‘ত’ এবং ‘থ’ আদি সকল পরমাণু ‘জঝ’ হইতে সমদূরবর্ত্তী হওয়া প্রযুক্ত উহারাও ঐকবৃত্তিক হইয়া ভ্রমণ করিবে। সুতরাং ঐ ‘জঝ’ ব্যাসের ‘ভ’ আদি কোন স্থানেই কোন দিকে টান পড়িবে না।

কিন্তু ‘টঠ’ ব্যাসের উপর ঘুরাইতে গেলে এই প্রকার হইবে না, কারণ ‘হ’ ‘র’ প্রভৃতি দুই দিকের পরমাণু সমস্ত ‘টঠ’ হইতে সমদূরবর্ত্তী নয়। সুতরাং ‘র’এর কেন্দ্র-বিমুখ-বল যত হইবে ‘হ’ এর কদাপি তেমন হইতে পারিবে না। ঐ ব্যাসের ‘ট’এর দিকে একরূপ কিন্তু ‘ঠ’ এর দিকে তাহার বিপরীত ঘটিবে। যে দিকে যে অভিমুখে অধিক টান পড়িবে তাহা দুইটী শর দ্বারা চিহ্নিত করা গিয়াছে। শরের মুখ যে দিকে সেই দিকে আকর্ষণের আধিক্য বুঝিতে হইবে।

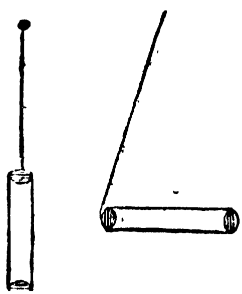
এক্ষণে ঐ শরাভিমুখ দুই বলের প্রকৃতি পরীক্ষা করিলেই বোধ হইবে যে, উহারা উভয়েই যাহাতে ‘টঠ’ ব্যাসকে ‘চছ’ প্রধান ব্যাসের সহিত মিলিত করিতে পারে এমত চেষ্টা পাইতেছে। ফলে তাহাই দেখা যায়, ‘টঠ’ ব্যাস ধরিয়া দ্রব্যটাকে ঘুরাইতে গেলে যেমন দুই দিকে জোর পড়ে বোধ হয় ‘চছ’ ধরিয়া ঘুরাইলে কখনই তেমন বোধ হয় না।

অন্য প্রকার পরীক্ষা দ্বারাও এই কথা সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। একটী অঙ্গুরীয়ের এক পার্শ্বে সূত্র বদ্ধ করিয়া ঝুলাইয়া ধর এবং ক্রমে ক্রমে ঐ সূত্রে পাক দিতে থাক। অঙ্গুরীয়টা ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে উন্নত হইয়া উঠিবে, অর্থাৎ পরপৃষ্ঠার প্রথম প্রতিকৃতিতে

যেরূপ আছে ঘুরাইলে উহা সে প্রকার না থাকিয়া দ্বিতীয় প্রতিকৃতির অনুরূপ আকারে ঘুরিতে থাকিবে।

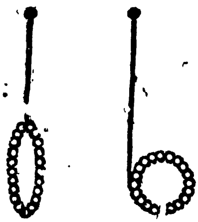


বৃত্তাভাস অঙ্গুরীয় লইয়া পরীক্ষা করিলে যে প্রকার দৃষ্ট হয় তাহাও উপরিস্থ অপর প্রতিকৃতি দ্বয়ে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।



স্তম্ভ লইয়া উক্তরূপে পরীক্ষা করিলে যেরূপ দেখা যায় তাহাও পার্শ্ববর্তী চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

এক গাছি শিকল লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে নিম্নস্থ প্রতিকৃতির অনুরূপ দৃষ্ট হইবে।



বালকেরা এইরূপে নানা প্রকার করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে। তাহারা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে পারে না; কিন্তু এই সকল নৈসর্গিক শক্তির প্রকৃতি পরীক্ষায় তাহাদিগের সমূহ আনন্দানুভব হয়।

(সাপেক্ষ এবং নিরপেক্ষ গতি।)

গতির দ্বিতীয় নিয়মের অন্তর্গত আর একটী কথা আছে। গতি বলিলে, বস্তুর 'স্থানান্তর হওয়া' মাত্র বুঝায়। কিন্তু স্থানের নিরূপণ নাই। সুতরাং 'স্থানান্তর হওয়া এই কথার অর্থ যদিও আপাততঃ সহজ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক ইহা তাদৃশ সহজ নহে।

দেখ, কোন ব্যক্তি নৌকারূঢ় হইয়া যাইতে যাইতে যদি যে মুখে নৌকা যাইতেছে তাহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ নৌকার অগ্রভাগ হইতে কর্ণধারের অভিমুখে গমন করেন এবং নৌকা যত বেগে এক দিকে যাইতেছে, তিনিও তাহার সমান বেগে অপর দিকে যান তবে ঐ ব্যক্তির স্থানান্তর হওয়া হইতেছে, এমত বলা যায় কি না, ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। কারণ নৌকা যে সময়ে পাঁচ হাত পশ্চিম দিকে যায়, তিনিও যদি সেই সময়ে পাঁচ হাত পূর্ব্বদিকে গমন করেন, তবে যে নদীর উপর তাঁহার নৌকা যাইতেছে, সেই নদীর সম্বন্ধে তাঁহার কিছু মাত্র স্থানান্তর হওয়া হয় নাই—পরন্তু নৌকা সম্বন্ধে তাঁহার স্থানান্তরতা ঘটিয়াছে। সুতরাং যদি নদীকে নিশ্চল জ্ঞান করা যায়, তবে বলা যাইতে পারে যে, ঐ ব্যক্তির গতি নৌকা সাপেক্ষ নয়। কিন্তু বাস্তবিক নদীও স্থির নয়—নদী যে পৃথিবীতে আছে, সে পৃথিবীও স্থির নয়—পৃথিবী যে কক্ষাতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সে সূর্য্যও স্থির নয়—সুতরাং কোন দ্রব্যের গতি হইতেছে দেখিলেই যে, সে বাস্তবিক স্থানান্তরিত হইতেছে, এমত হঠাৎ বলা যায় না। তবে যে দ্রব্যের উপর যাহার গতি হইতেছে, সেই দ্রব্যের সম্বন্ধে অথবা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের সম্বন্ধে স্থানান্তরতা ঘটিতেছে, এমত অবশ্য বলা যাইতে পারে। ইহারই নাম সাপেক্ষ গতি। অতএব আমরা সাপেক্ষ গতিরই উদাহরণ দেখিতে পাই, নিরপেক্ষ গতি আছে, ইহা অনুভব মাত্র করিতে পারি। এই দ্রব্যটী সচল বা

অচল এমত কথা তাহাদিগের পরস্পর সাপেক্ষ গতিকেই লক্ষ্য করিয়া বলা গিয়া থাকে।

(সাধারণ গতি।)

এইক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে, কোন সচল দ্রব্যের উপর যে পদার্থ থাকে, তাহা ঐ দ্রব্যের উপর এক নিরূপিত স্থান লইয়া থাকিলেও বস্তুতঃ তাহার গতি আছে। না থাকিবেই কেন? । কোন জড়পদার্থের গতি হইতেছে, বলিলে তাহার কোন অংশ বিশেষেরও গতি হইতেছে, ইহা বলা যেমন বাহুল্য, তেমনি সচল দ্রব্যের উপর যে অপর কোন দ্রব্য অবস্থিত হইয়া আছে, তাহাও ঐ দ্রব্যের সহিত সচল হইতেছে, ইহা বলাও অনাবশ্যক বোধ হয়। নৌকারূঢ় ব্যক্তির কি সেই নৌকার সহিত গতি হয় না? যিনি গাড়ি চড়িয়া যাইতেছেন, তাঁহার শরীর কি গাড়ির সহিত স্থানান্তরিত হইতেছে না?

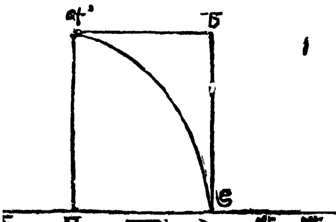
অতএব চলিষ্ণু দ্রব্যের উপর যে পদার্থ স্থির হইয়া থাকে, তাহারও বাস্তবিক গতি আছে। সেই গতির নাম সাধারণ-গতি। ইহার কার্য্য নানা স্থলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ তাদৃশ দ্রব্যের প্রতি অন্য কোন বল প্রযুক্ত হইলে তজ্জাত গতি এবং উহার যে সাধারণ গতি পূর্ব্বে ছিল, এই উভয় গতিতে মিলিত হইয়া নিয়মানুসারে যে প্রকার গতি-ফল জন্মে, তাহা দেখিয়া কোথাও কোথাও অত্যন্ত চমৎকৃত হইতে হয়।

নৌকায় পাইল দিয়া বেগে যাওয়া যাইতেছে, এমত সময়ে সেই নৌকার মাস্তুলে উঠিয়া যদি কেহ একটী গুটিকা ফেলিয়া দেয়, তবে ঐ গুটিকা, নৌকা নিশ্চল থাকিলে যেমন ঠিক নীচে মাস্তুলের গোড়ায় পড়িত, নৌকা সচল থাকাতেও ইহা আসিয়া অবিকল সেই স্থানেই পড়ে।

বাষ্পীয় শকটে গমন করিতে করিতে যদি একটা ঢিল নীচে ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঢিল পড়িতে পড়িতে গাড়ি চলিয়া যায় বটে, তথাপি ঢিলটা আমাদিগের ঠিক নীচেই ভূমি স্পর্শ করে।

নৌকায় যাইতে যাইতে যদি একটা গোলা লইয়া ঠিক ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করা যায়, তবে ঐ গোলা পুনর্ব্বার পতিত হইতে হইতে নৌকা অনেক দূর সরিয়া গেলেও গোলাটা ঠিক হাতেই আসিয়া পড়ে।

এইরূপ ঘটিবার কারণ নিম্নবর্ত্তী প্রতিকৃতি দ্বারা প্রকাশ করা যাই-



তেছে 'কখ' যেন একখানি নৌকা। উহার মাস্তুল 'ঘগ' এর ঊর্দ্ধ হইতে একটী কন্দুক নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যদি 'গ' হইতে 'ঘ' পর্য্যন্ত পড়িতে ঐ কন্দুকের যে কাল লাগে সেই ময়ে নৌকার গতি প্রযুক্ত মাস্তুল 'ঘগ' পূর্ব্ব স্থান হইতে সরিয়া ঙচ' স্থানে উপস্থিত হয়, তবে 'গ' হইতে যে কন্দুক নীচে আসিতছে তাহার দুইটী গতি হইয়াছে; একটী 'গ' হইতে 'চ' পর্য্যন্ত ার একটী 'গ' হইতে 'ঘ' পর্য্যন্ত। সুতরাং উভয় গতির সঙ্ঘাত ল 'গঙ' রেখাক্রমে কন্দুকের গতি হইবে। এই জন্যই মাস্তুল বাস্তবক সরিয়া গেলেও গুটিকা আসিয়া ঠিক মাস্তুলের নীচে পড়ে। াষ্পীয় শকট হইতে যে দ্রব্য উৎক্ষিপ্ত হয় তাহাতেও ঠিক ঐরূপ টে।

ফলতঃ যে স্থলে সচল বস্তুর উপর হইতে কোন দ্রব্য গতি প্রাপ্ত য়, সেই স্থলেই এইরূপ হইয়া থাকে। যদি বল, তবে আমরা কোন ৎক্ষিপ্ত পদার্থের সেইরূপ বক্র গতি দেখিতে পাই না ইহার কারণ ক?। তাহার কারণ এই, যদি উৎক্ষিপ্ত দ্রব্য কদাপি আমাদিগের স্তকোপরি না থাকিয়া কোন দিকে সরিয়া যাইত তাহা হইলেই

উহার বক্র গতি দেখিতে পাইতাম। কিন্তু উহার যে সাধারণ-গতি হয় তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া উহা আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গেই আসিতে থাকে, এই জন্য উহার বক্রগতি দৃষ্টি গোচর হয় না। অর্থাৎ আমরা যেমন যাই উহাও আমাদিগের সহিত ঠিক সমান যাইতে থাকে, এই হেতু উহার বক্রগতি দৃষ্ট হয় না।

গমনশীল দ্রব্যের উপর যে অন্য কোন দ্রব্য থাকে তাহারও যে ঐ দ্রব্যের সহযোগে একটী গতি হয়, তাহার আর একপ্রকার উদাহরণ প্রদর্শিত হইতে পারে। দেখ, আমরা যদি সমধিক বেগে একটী ঢিল ছুড়িবার মানস করি, তবে যে দিকে ঐ ঢিল ছুড়িতে হইবে সেই দিকে কিঞ্চিৎ দৌড়িয়া যাই এবং দৌড়িতে দৌড়িতে ঢিল ছুড়ি, তাহা করাতে উক্ত ঢিল অধিক দূরে যাইয়া পড়ে। যদি এক স্থানে স্থির থাকিয়া সমান বলে ঢিল ছোড়া যায়, তাহাতে ঢিল কখনই তত দূরে যাইতে পারে না। আর যদি এক দিকে ধাবমান হইয়া তাহার বিপরীত মুখে ঢিলকে নিক্ষেপ করি, তাহা সমান বলে নিক্ষেপ করিলেও ঢিল অপেক্ষাকৃত অল্প দূরে যাইয়া পড়ে। ইহার কারণ এই দৌড়িতে দৌড়িতে ছুড়িলে ঢিল দুইটী গতি প্রাপ্ত হয়—একটী আমাদিগের শরীরের সহিত সাধারণ গতি, আর একটী আমাদিগের হস্ত-প্রদত্ত-বল-জনিত গতি। সুতরাং যদি ঢিলকে আমাদিগের গমনের অভিমুখেই নিক্ষেপ করা যায়, তবে সেই দুই গতি এক দিকে হওয়াতে ঢিল অধিক দূর যায়, যদি গমনের প্রতিকূল মুখে নিক্ষেপ করা যায়, তবে ঐ দুইটী গতির পরস্পর বিরোধ হইয়া একটীকে অপরটী হ্রস্ব করে।

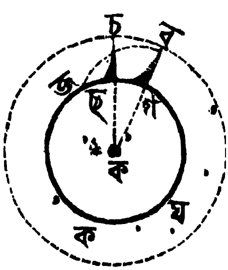
গাড়ি যে মুখে চলিতেছে যদি সেই দিকে গাড়ির উপর হইতে শর নিক্ষেপ করা যায়, তবে শর যতদূর যাইবে, গমনের বিপরীত দিকে নিক্ষেপ করিলে কখনই ততদূর যাইবে না।

টাঁ্যাটাওয়ালারা এক প্রকার শল্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া মৎস্যাদি বধ করে। যদি নৌকার কর্ণের দিকে বসিয়া মৎস্যের প্রতি টাঁ্যাটা

নিক্ষেপ করিতে হয়, তবে তাহারা, মৎস্য যত দূরে আছে তদপেক্ষা যাহাতে ট্যাটা কিঞ্চিৎ অধিক দূরে পড়ে, এমন বল দিয়া উহা নিক্ষেপ করে। তাহা করিলেই মৎস্য বিদ্ধ হয়। যদি সমান বলে ট্যাটা ফেলে তবে মৎস্যের গাত্র স্পর্শও হয় না।

কারণ নৌকার গতির সহিত ট্যাটারও একটী সাধারণ-গতি থাকে। সুতরাং তজ্জন্য ট্যাটাতে যত বল দেওয়া যায় সমুদায় বল কার্য্যকারী হয় না। কিন্তু যদি নৌকার মুখের দিকে কোন মৎস্যের প্রতি ট্যাটা মারিতে হয়, তবে কিঞ্চিৎ অল্প বল দেওয়া আবশ্যক, কারণ নৌকার সহিত ট্যাটারও সেই দিকে সাধারণ-গতি হইয়াছে। সেই গতি বশতঃ ট্যাটায় যত বল দেওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা অধিব দূর গিয়া পড়ে।

সাধারণ-গতির এইরূপ নিয়ম সমস্ত অবগত হইয়া পণ্ডিতেরা পৃথিবীর আহ্নিক গতির একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শাইয়াছেন। সেই প্রমাণটী হৃদ্গত করিতে পারিলে প্রস্তাবিত সাধারণ-গতির প্রকৃতি স্পষ্টরূপে বোধ-গম্য হয়, এই হেতু তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত হইল।



'ছগঘ' যেন পৃথিবী। উহা নিরন্তর পূর্ব্বাভিমুখে অর্থাৎ 'গছজ' অভিমুখে ভ্রাম্যমান হইতেছে। ইহার উপর 'গব' নামক কোন উচ্চ পর্ব্বত বা কীর্ত্তী-স্তম্ভ আছে। ঐ পর্ব্বতের নীচভাগে, অর্থাৎ 'গ' স্থলে পৃথিবীর যত বেগ, পর্ব্বতের শিখর দেশে, অর্থাৎ 'ব' স্থানে তাহা অপেক্ষা বেগ অধিক। কারণ কেন্দ্র হইতে যত দূর হইবে চক্র-ভ্রমণে বেগ ততই অধিক হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। যে সময়ে 'ব' যাইয়া 'চ' স্থলে উপস্থিত হয় সেই সময়ে 'গ' কেবল 'ছ' পর্য্যন্ত যায়।

অতএব 'ব' স্থানে অবস্থিত দ্রব্যের 'বচ' অভিমুখে গতি 'গ' এর 'গছ' অভিমুখে গতি অপেক্ষা অধিক। সুতরাং যদি কোন দ্রব্য 'ব' হইতে নীচে নিক্ষিপ্ত হয়, তবে উহা 'গছ' এবং 'বগ' এই দুই গতির অনুসারে না যাইয়া 'বচ' এবং 'বগ' এই দুই গতির অনুসারে চলে। সুতরাং 'গ' হইতে 'ছ' যত দূর তত দূরে না পড়িয়া উহা 'ব' হইতে 'চ' যত দূর 'গ' হইতে তত দূরে পতিত হয়। অর্থাৎ উহা 'জ' স্থানে পড়ে। ঐ "জ" "ছ" এর কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিকে* হয়। অতএব বলা যাইতে পারে যে পৃথিবী অবশ্য পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে ভ্রমণ করিতেছে। নচেৎ কোন অধিক উচ্চ স্থান হইতে দ্রব্যাদি নিক্ষেপ করিলে তাহারা কি হেতু ঠিক নীচে না পড়িয়া সর্ব্বদাই কি[illegible] ইয়া পড়ে?।

তৃতীয় অধ্যায়।

[বেগ-বল—মিলিত-বেগ—বেগ-বল-সংঘাত—স্থিতি-স্থাপকতা—আঘাত প্রতিঘাত—গতির তৃতীয় নিয়ম।]

কোন জড় পদার্থের প্রতি একটী বা তদধিক বল প্রযুক্ত হইলে ঐ পদার্থের গতি যেরূপ এবং যে অভিমুখে হয়, তাহা পূর্ব্বাধ্যায় সমস্তে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রযুক্ত-বলের সহিত উক্ত গতির বেগের যেরূপ সম্বন্ধ হয়, তাহা কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইবে।

প্রথমতঃ ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, বল প্রয়োগ করিলেই জড় পদার্থের গতি জন্মে। যে স্থলে বল প্রয়োগ করিয়াও গতি

* উত্তর অক্ষাংশ দেশে এইরূপ পরীক্ষা করিলে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে এবং দক্ষিণ অক্ষাংশ দেশে পরীক্ষা করিলে, উত্তর-পূর্ব্ব কোণে গুটিকা পাত হইবে।

জন্মাইতে না পারা যায়, তথায় অবশ্য কোন শক্ত্যন্তর প্রতিবন্ধক হইয়াছে মানিতে হয়। আমরা ঠেলা দিয়া বৃক্ষাদিকে ফেলিয়া দিতে পারিনা, আর কোন অধিক-ভারী দ্রব্যকেও টানিয়া তুলিতে পারি না। তাহার কারণ, আমাদিগের যত বল, পৃথিবী ঐ ভারী দ্রব্য সকলকে তাহা অপেক্ষা অধিক বলে আকর্ষণ করিয়া রাখে। যদি ঐ প্রতিকূল বল না থাকিত, তবে অবশ্যই আমাদিগের বল কার্য্যকারী হইত।

কিন্তু জড় পদার্থের প্রতি যদিও বল প্রয়োগ করিলেই গতি জন্মে তথাপি সমান বলে অসমান দ্রব্যের কখন সমান বেগ জন্মিতে পারে না। যে বলে এক ছটাক পরিমিত দ্রব্য ৪ হাত সরিয়া যায় সেই বলে দুই ছটাক ভারী দ্রব্য কখন ততদূর সরে না। সে দুই হাত মাত্র যায়। কারণ যে কোন জড় পদার্থ হউক না কেন, তাহাতে যত গুলি পরমাণু আছে, সেই পরমাণুগুলি প্রত্যেকেই নিশ্চেষ্টতা-গুণ সম্পন্ন। অতএব তাহাদিগের একটীকে সচল করিতে যত বলের আবশ্যক দুইটীকে সেই পরিমাণ বেগে সচল করিতে তাহার দ্বি-গুণ বলের প্রয়োজন হইবে। সুতরাং যে দ্রব্য যত বহু পরমাণুর সমষ্টি হইবে তাহাকে তত অধিক বলে না সরাইলে সে কখন অল্প-পরমাণু-সমষ্টি-দ্রব্যের সমান বেগবান হইবে না। দুই ছটাক ভারী যে দ্রব্য তাহাতে এক ছটাক ভারী দ্রব্য অপেক্ষা দ্বিগুণ [illegible] পরমাণু আছে। অতএব উহাদিগকে সমবেগ প্রদান [illegible] হইলে দুই ছটাক দ্রব্যে এক ছটাক ভারী দ্রব্যের অপেক্ষা দ্বিগুণ অধিক বল প্রয়োগ করা আবশ্যক।

ফলতঃ যখন কোন দ্রব্য সচল হয়, তখন তাহার প্রত্যেক পরমাণুই সমান বেগে চলিতে থাকে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, একটী পরমাণুর প্রতি যত বল প্রয়োগ করিলে উহার তাদৃশ বেগ হইত, ঐ দ্রব্যে যতগুলি পরমাণু আছে, উহার প্রতি তাহার

তত গুণ বল প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং যখন কোন দ্রব্য বেগে আসিতে থাকে, তখন উহা কত বলে আসিতেছে নির্ণয় করিতে হইলে উহার ভারকে বেগের দ্বারা পূরণ করা আবশ্যক। এইরূপে যে বল নির্ণীত হয়, তাহার নাম বেগ-বল। বস্তুতঃ এই বল বেগ দ্বারা জন্মে, এমত বোধ করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ দ্রব্যের তাদৃশ বেগ যত বলে হইতে পারে, তাহারই নাম বেগ-বল। কামানের গোলা শীঘ্র যায় বলিয়া তাহার বেগ-বল অধিক হয়, এরূপ বক্তব্য নহে। কামানের গোলায় অধিক বল প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই উহা তেমন শীঘ্র গমন করে, ইহাই বক্তব্য। বল বেগের কারণ, বেগ কদাপি বলের কারণ হইতে পারে না।

এই বিষয়টী আর এক প্রকারে বুঝিয়া দেখিলেও কিঞ্চিৎ অধিক স্পষ্ট হইতে পারে। কোন দ্রব্যের প্রতি সমান বেগে দুইটী গোলা নিক্ষিপ্ত হইল। ঐ দুইটী গোলা উহাতে একেবারে একই স্থানে লাগাতে যেরূপ আঘাত হইল, যদি ঐ দুইটী গোলা মিলিয়া একটী হইয়া সেই বেগে আসিয়া লাগিত, তাহা হইলেও ঠিক সেই পরিমাণ আঘাত হইত। আঘাত-বলের কিছু ন্যূনাতিরেক হইত না। অতএব বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, কোন দ্রব্য যত ভারী এবং যত বেগবান্ হয়, তাহাতে তত অধিক বল থাকে।

যদি 'ব' দ্বারা বেগ-বল বুঝা যায়, এবং 'বে' অর্থে বেগ, আর 'ভা' অর্থে ভার হয়, তবে গণিতের সঙ্কেতানুসারে বলের এবং বেগ ও ভারের সম্বন্ধ এইরূপে প্রকাশিত হইতে পারে, যথা; ব=বে×ভা।

অতএব যদি এমত জিজ্ঞাস্য হয় যে, ১ছটাক ভারী কোন বন্দুকের গুলি প্রতি সেকণ্ডে ৫০০ হাত যায়, আর ১সের ভারী পাথর প্রতি সেকণ্ডে ৫ হাত যায়, এই দুইয়ের মধ্যে কাহার কত বেগ-বল বা কে কত বলে প্রযুক্ত হইয়াছে? তাহা হইলে অনায়াসে বলিতে পারা যায় যে, ঐ ১ছটাক পরিমিত গুলির বল ৫০০×১ছটাক=৫০০ ছটাক।

আর ঐ প্রস্তরের বেগ-বল (৫×৪×৪×১=) ছটাক। সুতরাং প্রস্তর অপেক্ষা গুলির বেগ-বল অধিক, অর্থাৎ গুলি অধিক বলে প্রযুক্ত হইয়াছে।

আবার যদি এমত জিজ্ঞাসা হয়, যে দুইটী দ্রব্য আছে, তাহার মধ্যে একটী ১০ সের ভারী, এবং আর একটী ২ সের ভারী উভয়েরই প্রতি সমান বল প্রযুক্ত হইয়াছে; যদি সেই বলের দ্বারা ২সের ভারী দ্রব্য প্রতি পলে ১০ হাত চলে, তবে ১০ সের ভারী দ্রব্যটী কত বেগে চলিবেক? এ স্থলে দুয়ের প্রতি সমান বল প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ উভয়েরই বেগ-বল সমান। সুতরাং একের ভার এবং বেগের পরস্পর গুণ-ফল যাহা হইবে, অপরেরও ভার এবং বেগের গুণ-ফল তাহার সমান হইবে। সুতরাং ১০ সের ভারী দ্রব্যটী সেই বলে দুই হাত মাত্র চলিতে পারিবে। *

যদি দ্রব্যটী আরও অধিক ভারী হয়, তবে উহার বেগ আরও অল্প হয়, ক্রমে উহা অত্যন্ত বৃহৎ হইলে উহার বেগ হয় কি না, বুঝিতেই পারা যায় না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া বাজিকরেরা আপনাদিগের বক্ষে বা পৃষ্ঠে কোন গুরু ভার দ্রব্য রাখিয়া তাহার উপর প্রহার করিতে দেয়। যত বলে প্রহার করা যাউক না কেন, তাহাতে বাজিকরদিগের বিশিষ্ট ক্লেশ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। উক্ত ঐন্দ্রজালিকেরা কখন কখন মৃত্তিকার কলসীকে উপুড় করিয়া বসাইয়া রাখে, এবং তাহার উপর একটী বৃহৎ মৃৎপিণ্ড রাখিয়া ঐ মৃৎপিণ্ডের উপর যথাসাধ্য বলে লগুড় প্রহার করিতে দেয়, তাহাতে কলসী ভাঙ্গে না।

যেমন, বল সমান থাকিয়া ভার অধিক হইলে বেগ অধিক হয় না,

---

* গণিতের সঙ্কেতানুসারে এইরূপ করিয়া ফল স্থির হয়, যথা—

সে হা সে হা
২ × ২০ ১০ × অ : অ $= \frac{২ \times ১০}{১০}$ হা $=$ ২ (অর্থাৎ ২ হাত যাইবে)।

তেমনি বেগ অধিক হইলে অবশ্য ভার লাঘব হয়। ঘোড়াকে গাড়িতে যুড়িয়া কশাঘাত করিলে ঘোড়া যখন গাড়ি লইয়া দৌড়িয়া যায়,তখন গাড়ির উপরে যে যে দ্রব্য থাকে সকলই ঐ গাড়ির সহিত গমন করে। কিন্তু ঐ ঘোড়াকে গাড়িতে না যুড়িয়া যদি এক খানি অল্প-ভার তক্তায় যুড়িয়া দেওয়া যায়, তবে ঘোড়া সমান বলে টানিলেও লঘু-বস্তু-তক্তার বেগ অধিক হওয়াতে উহার উপরিস্থ যাবৎ দ্রব্য সকলই নীচে পড়িয়া যায়। বাম হস্তের তর্জ্জনীর উপর একখানি মসৃণ তাস এবং সেই তাসের উপর একটী পয়সা বা টাকা রাখিয়া যদি ঐ তাসের এক পার্শ্বে খরতর আঘাত করা যায়, তবে তাস চলিয়া যায়,কিন্তু তাহার উপরিস্থিত পয়সা বা টাকা তর্জ্জনীর অগ্রভাগেই স্থির হইয়া থাকে। যদি একখানি কাচের পরকলার উপর একটী বর্ত্তুল সামান্য বেগে নিক্ষিপ্ত হয়,তাহা হইলে কাচের পরকলার চতুর্দ্দিক ফাটিয়া যায়, কিন্তু ঐ পরকলার উপর বন্দুকের গুলি বেগে আসিয়া লাগিলে পরকলা ফাটে না; যেখানে গুলি লাগে, সেইখানে গোলাকার ছিদ্র হয়। শ্রুত আছে,কোন কোন বীরপুরুষ এমত বেগে করবাল প্রয়োগ করিতে পারেন যে, কলাগাছ বা তাদৃশ কোন বৃক্ষকে ছেদন করিয়া অস্ত্রনির্গত হইয়া গেলেও বৃক্ষের পতন হয় না। ইংরেজেরা বলেন, কোন কোন যুদ্ধে এমত ঘটিয়াছে যে,গড়ের দ্বারে খিল দেওয়া হয় নাই, দুর্গের কবাট ঠেকান মাত্র ছিল, কিন্তু সেই কবাটে কামানের গোলা লাগিয়া কবাট ছিদ্র হইয়া গিয়াছে, তথাপি খুলে নাই। চোরাবালি কিম্বা শুষ্ক পেঁকো পুকুরের উপর দিয়া যাইতে হইলে লোকে বেগে চলিয়া যায়, বেগে না গেলে পা বসিয়া যাইবার সম্ভাবনা। কেবল মাত্র বাঁট ধরিয়া হাতুড়ির বাঁটের গোড়া ঠুকিলেও বাঁটের অগ্রভাগ উহার মাথার ছিদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে বোধ হয়, বাঁট যে বেগ পায় তাহা যেন উহার উপরে সন্নিবেশিত লৌহখণ্ডে সংক্রামিত করিতে পারে না। বালকেরা খোলা কুচি লইয়া

অধিক বলে পুষ্করিণীর জল-পৃষ্ঠে সমান্তরাল ভাবে নিক্ষেপ করিলে ঐ খোলা জল ভেদ করিয়া চলিয়া যায়—ডুবিবার অবকাশ পায় না। শ্রুত আছে, কোন কোন ব্যক্তি জলে ঝুনা নারিকেল ভাসাইয়া দিয়া অস্ত্র দ্বারা সেই নারিকেল ছেদন করিতে পারেন। তাঁহাদিগের অস্ত্র এমত বেগে প্রযুক্ত হয় যে, ঐ নারিকেল মগ্ন না হইতে হইতেই ছিন্ন হইয়া পড়ে।

এইরূপ নানা উদাহরণ দর্শনে নিশ্চয় অনুভব হয়, যেমন দ্রব্যের ভার অধিক হইলে তাহার সর্ব্বস্থলে অধিক বেগ পায় না, তেমনি বেগ অধিক হইলে বৃহদ্দ্রব্যের সর্ব্বস্থলে সেই বেগ সঞ্চারিত হইবার সময় পায় না, ফলতঃ বেগ-বলের মূল সূত্রই এই যে, বল সমান থাকিয়া যত বেগের আধিক্য ভারের ততই অল্পতা হয়, আর যত ভারের আধিক্য বেগের ততই ন্যূনতা জন্মে।

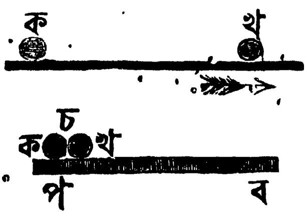
[মিলিত বেগ।]

কোন দ্রব্যের প্রতি সাক্ষাৎ বল প্রয়োগ করাতে উহার গতির প্রকৃতি যেরূপ হয়, তাহা এক প্রকার কথিত হইল, এক্ষণে কোন বস্তু অন্য কোন সচল দ্রব্য কর্ত্তৃক আহত হইলে উভয়ে কিরূপে গতিশীল হয় তাহা বর্ণিত হইবে।

যখন কোন দ্রব্য স্বয়ং আহত এবং সুতরাং গমন শীল হইয়া অন্য কোন দ্রব্যের প্রতি যাইয়া আঘাত করে, তখন ঐ দ্বিতীয় দ্রব্যেরও গতি জন্মে। আর যে অভিমুখে প্রথমোক্ত দ্রব্যটী যাইয়া আঘাত করে, দ্বিতীয়েরও সেই অভিমুখে গতি হয়। ছেলেরা ভাঁটা খেলিবার সময় একটী ভাঁটাকে আর একটী ভাঁটা দিয়া মারে, তাহাতে আহত ভাঁটাও বেগে ধাবিত হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, দ্বিতীয় ভাঁটা কি প্রকারে বল প্রাপ্ত হইয়া সচল হয় ?। তাহার ঐ বল অবশ্য প্রথম ভাঁটাটী হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে, কিন্তু প্রথম ভাঁটাও নিশ্চেষ্ট, সুতরাং আপনি অন্য

কাহার স্থানে যে বল পাইয়াছিল, দ্বিতীয় ভাঁটাকে তাহারই কিয়দংশ প্রদান করে, বলিতে হইবে। অতএব ইহা দ্বিতীয় ভাঁটাকে যত বল প্রদান করিবে উহার আপনার বল অবশ্য ঠিক ততই ন্যূন হইবে, ফলে তাহাই হয়। একটী ভাঁটা প্রথমে যত বেগে আইসে, আর একটীর সঙ্গে ঠোকা-ঠুকি হইলে উহাদিগের কাহারও বেগ প্রথম ভাঁটাটীর সমান হয় না। দুইটী ভাঁটাই প্রথমটীর অপেক্ষা অল্প বেগে চলে। পরন্তু বেগ ন্যূন হয় বটে, কিন্তু দ্বিতীয়টী যত বেগ পায়, প্রথমটীর বেগ ততই ন্যূন হয়। বায়ুর ঘর্ষণের এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রতিবন্ধকতা ছাড়িয়া দিয়া বিবেচনা করিলে লাভ লোকসান কিছুই হইতে পারে না। নিম্নবর্ত্তী চিত্রে 'ক' নামক ভাঁটা



যাইয়া যেন 'খ' নামক অপর একটী ভাঁটাকে আঘাত করিতেছে, বোধ কর। ঐরূপ আঘাত করাতে 'খ'এরও 'কখ' অভিমুখে বেগ জন্মিল। যদি 'ক' 'খ' একেবারে সংলগ্ন হইয়া যায় আর না ছাড়ে এমত হয়, তবে 'ক'এর যে বেগ ছিল 'ক' এবং 'খ' দুইয়ে সেই বেগ ভাগ করিয়া হইবে। সুতরাং 'কখ' মিলিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বেগে চলিবে না। উহাদিগের মিলিত-বেগ কত হইবে নিশ্চয় করিতে হইলে, এইরূপ বিবেচনা করিতে হয় যে, 'কখ' কে 'ক' যত বেগ দিয়াছে উহার আপনার অবশ্য তত বেগ ন্যূন হইয়াছে। কারণ 'ক' 'খ' উভয়েই জড়। সুতরাং তাহারা স্বয়ং স্ব স্ব বেগ হ্রস্ব বা বর্দ্ধিত করিতে পারে না। অতএব 'খ' যে বেগ পাইল তাহা অবশ্য 'ক'এর বেগ না কমিলে পায় নাই 'ক' যুক্ত 'খ'এর যে বল হইল, কেবল মাত্র 'ক' এরও সেই বল ছিল। 'ক' যুক্ত 'খ'এর বেগ জানা নাই, অতএব সেই অব্যক্ত বেগ যদি 'অ' নামক হয়,

আর 'ক'এর পূর্ব্বের বেগ 'বে' হয়, তবে 'ক' যুক্ত 'খ'এর বেগ-বল কেবল মাত্র 'ক'এর বেগ-বলের সমান। ইহা গণিতের সঙ্কেতানুসারে এইরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। যথা—

$$(\text{ক}+\text{খ})\times\text{অ}=\text{বে}\times\text{ক}।$$

(১) সুতরাং $\text{অ}=\dfrac{\text{বে}\times\text{ক}}{\text{ক}+\text{খ}}$ অর্থাৎ সচল বস্তুর বেগ-বল-সংখ্যাকে, সচল এবং অচল উভয় দ্রব্যের ভার-সংখ্যার যোগফল দ্বারা হরণ করিলেই মিলিত-বেগ জানা যায়। এক্ষণে যদি এমত প্রশ্ন হয়, একটী ভাঁটা দুই ছটাক ভারী আর একটী তিন ছটাক ভারী। ৩ ছটাক ভারী ভাঁটা প্রতি পলে চারি হাত যায়। সে ঐ বেগে আসিয়া দুই ছটাক ভারী ভাঁটাকে আঘাত করিল এবং ঐ আঘাতের পর উহারা উভয়ে মিলিত হইয়া চলিতে লাগিল, উহাদিগের মিলিত-বেগ কত হইবে। এস্থলে, $\text{অ}=\dfrac{\text{বে}\times\text{ক}}{\text{ক}+\text{খ}}$ এই সূত্র স্মরণ করিয়া 'বে' র পরিবর্ত্তে ৪, 'ক'এর পরিবর্ত্তে ৩ এবং 'খ'এর পরিবর্ত্তে ২ রাখিয়া অঙ্ক করিলেই উত্তর হইবে। যথা,

$$\text{অ}=\frac{৪\times৩}{২+৩}=\frac{১২}{৫}=২\frac{২}{৫}$$ অর্থাৎ মিলিত-বেগ দুই ও দুইবার পাঁচ ভাগ হস্ত পরিমিত হইবে।

যদি 'ক' এর গতি 'খ'এর অভিমুখে এবং 'খ'এর গতি 'ক' এর অভিমুখে হইতে থাকে এবং এমত সময়ে উভয়ের পরস্পর আঘাত হয়, তবে তাহার পর উহাদিগের মিলিত-বেগ কত হইবে নিশ্চয়

করণার্থে এইরূপ বিবেচনা করা আবশ্যক। বোধ করা যাউক যেন 'ক'এর বেগ কিছু অধিক, তবে ঐ 'ক'এর এবং 'খ'এর পরস্পর আঘাতে হইবামাত্র 'খ' আপনার বল 'ক'কে দিবে। সেই বল 'ক'এর প্রতিকূল হওয়াতে তদ্দ্বারা 'ক'এর বেগ কিয়ৎপরিমাণে ন্যূন হইবে। তাহার পর 'ক'এর যে বল অতিরিক্ত আছে সেই বল ঐ 'ক' এবং 'খ' দুয়ে ভাগ করিয়া লইয়া একত্রে চলিতে থাকিবে। যদি 'কএর বেগ 'বে' আর 'খ'এর বেগ 'গ' হয়, আর দুইয়ের মিলিত বেগ অব্যক্ত 'অ' হয় তবে গণিতের সঙ্কেতানুসারে বেগ-বলের সাম্যাবস্থা এইরূপে প্রকাশিত হইবে। যথা,

$$বে\times ক - গ\times খ = অ\times (ক + খ)।$$

(২) সুতরাং $অ = \frac{বে\times ক - গ\times খ}{ক+খ}$ অর্থাৎ পরস্পর বিপরীত-মুখগামী উভয় সচল বস্তুর বেগ-বলের ব্যবকলন ফলকে উভয়ের ভার সমষ্টি দ্বারা হরণ করিলেই তাহাদিগের অব্যক্ত মিলিত-বেগ জানা যায়।

এক্ষণে যদি এমত প্রশ্ন হয় যে, চারি ছটাক ভারী একটী গোলার বেগ ৪ হাত, আর দুই ছটাক ভারী একটী গোলার বেগ ২ হাত তাহারা পরস্পর বিপরীত দিকে যাইতে যাইতে অন্যোন্যের প্রতি আঘাত করিল উহাদিগের মিলিত-বেগ কত হইবে?। তাহার উত্তর এইরূপে করা যায়।

$$অ = \frac{৪\times ৪ - ২\times ২}{৪+২} = \frac{১২}{৬} = ২$$ অর্থাৎ দুই হাত মিলিত-বেগ হইবে।

পরন্তু যদি ঐ কন্দুক দুইটীর গতি পরস্পর বিপরীত মুখে না হইয়া এক দিকেই ছুটিতে ছিল এমত হয়, তবে উহাদিগের মিলিত-বেগ

নির্দ্ধারণার্থে এইরূপ বিচার করা আবশ্যক। 'ক'এর যত বেগ অধিক 'খ' তাহারই কিয়দ্ভাগ লইবে, লইয়া উভয়ে সমান বেগে চলিবে, অতএব গণিতের সঙ্কেতানুসারে এইস্থলে

$$বে \times ক + গ \times খ = অ (ক + খ),$$

$$(৩)\ সুতরাং\ অ = \frac{বে \times ক + গ \times খ}{ক + খ}$$

যদি পূর্ব্ব প্রশ্নে আর সকল অঙ্ক সমান থাকিয়া কন্দুক দ্বয়ের গতি এক দিকে হইতেছে, এই মাত্র পরিবর্ত্তিত হয়, তবে

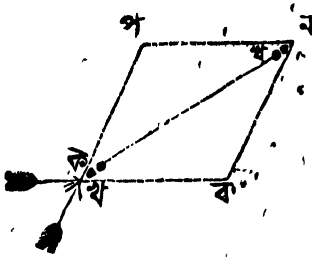
$$অ = \frac{৪ \times ৪ + ২ \times ২}{৪ + ২} = \frac{২০}{৬} = ৩\frac{১}{৩}\ অর্থাৎ$$

৩ হাত এবং ৮ অঙ্গুলি মিলিত-বেগ হইবে।

এই কয়েকটী প্রশ্নের যেরূপ করিয়া উত্তর নিশ্চয় হইয়াছে তাহা অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেই বোধ হইবে যে, বেগের লাভ লোকসান ঠিক সমান থাকিয়া যায়, অর্থাৎ প্রতিব্যরেই 'ক' কন্দুকের বেগ যত ন্যূন হয়, 'খ'এর ঠিক ততই বাড়ে। ফলতঃ ইহা জড় পদার্থের নিশ্চেষ্টতা গুণেরই ফল।

(বেগ-বল-সংঘাত।)

যখন দুই কন্দুক এক সরল-রেখাক্রমে আসিয়া অন্যোন্যের প্রতি আঘাত করে, তখন তাহাদিগের মিলিত-বেগ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু যখন তাহাদিগের গতি ঠিক এক দিকে বা পরস্পর বিপরীত দিকে না হইয়া কোণাকোণি হয় তখন মিলিত-বেগ নিশ্চয় করিতে হইলে গতিসংঘাতের নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক।

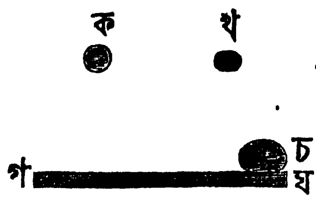


পার্শ্ববর্ত্তী চিত্রে 'ক' এবং 'খ' দুইটী ভাঁটা দুই চিত্রিত শরাভিমুখে আসিয়া পরস্পর আহত হইয়া মিলিত হইল। উহাদিগের মিলিত-বেগ অবধারণার্থে 'কপ' এবং 'খব' দুইটী রেখা উহাদিগের পরস্পরের বেগাভিমুখে টানা গেল। পরে 'ক'এর ভার সংখ্যাকে উহার বেগ পরিমাণ দ্বারা গুণ করিয়া যত হইল, গজ ধরিয়া, 'কব' কে তত ইঞ্চি পরিমাণ করা গেল, আর 'খ'এর ভার পরিমাণকে উহার বেগ দ্বারা গুণ করিয়া যত হইল 'খপ' কে উক্ত গজ দিয়া তত ইঞ্চি মাপিয়া লওয়া গেল। তাহার পর 'ব' হইতে 'বন'কে কপ রেখার সমান্তরাল করিয়া আর 'প' হইতে 'পন'কে 'খব'এর সমান্তরাল করিয়া টানিলেই 'কপনব' একটী সমান্তরাল-চতুর্ভুজ হইল। উহার কর্ণ রেখা 'কন' যত ইঞ্চি হইবে তাহাকে 'ক' এবং 'খ' উভয়ের ভার সংখ্যার যোগফলের দ্বারা হরণ করিলেই মিলিত-বেগ কত, জানা যাইবে।

(স্থিতি-স্থাপকতা।)

যদি জড় পদার্থের স্থিতি-স্থাপকা গুণ না থাকিত তাহা হইলে পূর্ব্বে যাহা যাহা কথিত হইল, তদ্দ্বারাই বেগ বলের সংঘাত যেরূপ হয়, তাহা সম্যক্ প্রকারেই বোধ হইতে পারিত। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় দুইটী দ্রব্যের পরস্পর আঘাত হইলে প্রায় কখনই তাহারা দুইটীতে একত্র হইয়া মিলিত-বেগ সহকারে গমন করে না। একটী ভাঁটা লইয়া আর একটীকে মারিলে আহত-ভাঁটা বেগে চলিয়া যায়, যেটী দ্বারা আঘাত করা যায় সে, হয়ত স্থির হইয়া থাকে, নতুবা স্বয়ং পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়। এইরূপ হইবার কারণ ভাঁটা দ্বয়ের স্থিতি-স্থাপকতা গুণ।

এই বিষয়টী সম্পূর্ণরূপে হৃদ্গত করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, কোন দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে স্থিতি-স্থাপক গুণোপেত হইলে, ঐ দ্রব্য যত বলে আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হয়, পুনর্ব্বার তত বলেই আপনার পূর্ব্বাকৃতি এবং প্রকৃতাবয়ব গ্রহণ করে। কাচ, রবর, হস্তিদন্ত প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য প্রায় সর্ব্বতোভাবে স্থিতি-স্থাপক। অতএব যদি উহাদিগের কাহাতেও নির্ম্মিত কোন দুইটী দ্রব্য পরস্পর স্পর্শ করে, তবে তাহারা আঘাত-বলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চেপ্টা হইবা যায়। কিন্তু তৎপর-ক্ষণেই পুনর্ব্বার উহারা স্ব স্ব প্রকৃতাবয়ব গ্রহণ করে। নিম্নবর্ত্তী চিত্রে 'ক' নামক একটী কাচ নির্ম্মিত কন্দুক। 'গঘ' একটী কঠিন সম-ধরাতল। ঐ সম-ধরাতলের উপর কালী অঙ্কণ করিয়া 'ক'



কন্দুককে কিঞ্চিৎ উচ্চ হইতে নিক্ষেপ করিলে 'ক' প্রতিহত হইয়া লাফাইয়া উঠে। সেই সময় 'ক'কে লইয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, উহার গাত্রে অনেক দূর ব্যাপিয়া কালীর দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ 'ক' বর্ত্তুল ('গোল') 'গঘ' সমধরাতল, সুতরাং 'ক' প্রকৃতাবয়ব থাকিলে কদাপি উহার অধিক ভাগ 'গঘ'কে স্পর্শ করিতে পারে না। তবে ঐরূপ কালীর দাগ কি জন্য লাগে ?। সুতরাং বলিতে হইবে যে 'ক' 'গঘ'এর উপর বেগে পড়িয়া সেই আঘাতে চেপ্টা হইয়া 'খ'এর ন্যায় হয়। কিন্তু স্বয়ং স্থিতি-স্থাপক, বলিয়া যে ভাগটী চেপ্টা হইয়া গিয়াছিল, তাহাই পুনর্ব্বার গোল হইয়া উঠে। বস্তুত, এই জন্যই ঐ দ্রব্যটী লাফাইয়া উঠে। যদি উহা স্থিতি-স্থাপক না হইত তবে 'গঘ' এর উপর পড়িয়া চেপ্টা হইয়া তাহাতেই

বাখারী লইয়া কোন প্রাচিরে প্রেক বিদ্ধ করিয়া সেই প্রেকের উপর সংস্থিত কর, এবং 'ঘ' অথবা 'গ' কে সেই প্রাচীরে টিপিয়া ধর! ধরিয়া 'ক' কে পূর্ব্ববৎ উত্তোলন করিয়া ছাড়িয়া দেও, তাহাতেও 'ক' আসিয়া 'গ' এর উপর আঘাত করিলে সেই আঘাত-বলে 'খ' দূরে পরাহত হইবে।

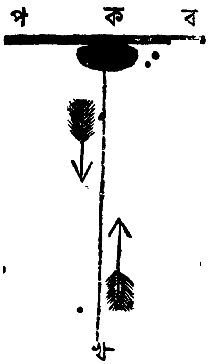
ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইলে পূর্ব্ব বেগ-বলের প্রকৃতি যেরূপ কথিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক। অর্থাৎ ভার অধিক হইলে বেগ অল্প লাগে, কিন্তু ভার অল্প হইলে অধিক বেগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, হাতুড়ির গোড়া ঠুকিলে তাহার মাথা বাহির হয়, সেইরূপ গোলার এক দিকে বল প্রয়োগ হইলে ঠিক তাহার বিপরীত দিকে ঐ বলের কার্য্য হয়, উহার উপরে যতই কেন চাপ থাকুক না, তাহা দ্বারা বলের হ্রাস কিছুই হইতে পারে না।

আঘাত প্রতিঘাত।

যে সকল দ্রব্য সম্পূর্ণ স্থিতি-স্থাপক, তাহাদিগের প্রকৃতি এইরূপ। কিন্তু কোন দ্রব্যই সম্পূর্ণ স্থিতি-স্থাপক বা সর্ব্বতোভাবে এই গুণবিহীন হয় না। ফলতঃ যে যেমন স্থিতি-স্থাপক তাহাতে এইরূপ প্রতিঘাত-ক্রিয়া তেমনি অল্প বা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

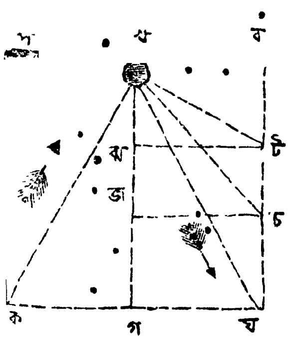
যখন কোন অল্প স্থিতি-স্থাপক দ্রব্য কোন কঠিন ধরাতলের উপরি আহত হয়, তখন ঐ দ্রব্যটা ধরাতলে সংলগ্ন হইয়া থাকে। ধরাতল অতি বৃহত বা ভারী হইলে সুতরাং উহার গতি জন্মিতে পারে না। কাদার তাল, গোবরের তাল, মমের গুলি ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য লইয়া প্রাচীরের উপর নিক্ষেপ করিলে এইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু উহা কোন স্থিতি-স্থাপক দ্রব্য হইলে পুনর্ব্বার প্রতিহত হইয়া আইসে।

পরপৃষ্ঠার প্রথম চিত্রে 'ক' নামক কোন অধিক স্থিতি-



স্থাপক কন্দুক 'পব' ধরাতলের উপর বেগে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে প্রথমতঃ ধরাতলে লাগিয়া চেপ্টা হইয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই যে বলে ঐ রূপ চেপ্টা হইয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই বলে প্রকৃত অবয়ব গ্রহণ করাতে পূর্ব্বে যে লম্ব রেখায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই রেখাক্রমেই ফিরিয়া আসিতেছে। এই স্থলে কন্দুকটা যত বলে যত দূর হইতে গিয়াছিল, ঠিক তত বলে পুনর্ব্বার তত দূরেই আসিবে। রবরের গোলা লইয়া ছেলেরা এইরূপ ক্রীড়া করে। তাহারা ঐ গোলা লইয়া বল পূর্ব্বক প্রাচীরাদিতে আঘাত করে, এবং যেমন গোলা প্রতিহত হইয়া আইসে, অমনি আবার হাতে করিয়া লুফিয়া লয়। কিন্তু কন্দুকটা যদি সম্পূর্ণ স্থিতি-স্থাপক না হয়, তবে এইরূপ ঘটে না। উহাকে যত বলে নিক্ষেপ করা যায়, উহা উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাহা অপেক্ষা অল্প বলে আইসে। বালকেরা কাপড়েব মুটি পাকাইয়া ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া যে ক্রীড়া করে, তাহাতে এই ভাব দৃষ্ট হয়।

কন্দুকাদি লম্বরেখাক্রমে ভূমিতে আঘাত করিলে এইরূপ ঘটে। কিন্তু যদি আঘাত বক্র রেখায় হয়, তবে উহার গতি এরূপ হইবে না, সে স্থলে গতি-বিভাগের নিয়মানুসারে বিবেচনা করা আবশ্যক।



সেই নিয়মানুসারে বিবেচনা করিয়া বোধ হইতেছে যে, পার্শ্ববর্ত্তী চিত্রে যখন 'খ' নামক কোন স্থিতিস্থাপকগুণ বিশিষ্ট কন্দুক 'কখ' রেখাক্রমে যাইয়া 'পব' ধরাতলে আঘাত করে, তখন উহার ঐ 'কখ' গতিকে বিভাগ করিয়া

এই দুইটী গতি বাহির করিতে পারা যায়। ইহার মধ্যে 'পথ' গতি ধরাতলের অনুক্রমে হয় বলিয়া উহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, কিন্তু 'গথ' গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া 'গ্লগ' হইয়া উঠে, সুতরাং 'খব' যদি 'পথ' এর সমান হয়, তবে সেই একটী গতি এবং 'খগ' একটী গতি এই দুইটী গতি উপস্থিত হয়, সুতরাং ঐ দুয়ের সঙ্ঘাত ফল যে, 'খঘ' তাহাই খ' এর প্রত্যাবর্ত্তন-পথ হইয়া উঠে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, 'কগ্লগ' ত্রিভুজটী 'ঘখগ' ত্রিভুজের সর্ব্বতোভাবে সমান; সুতরাং 'ঘখগ' কোণ 'কখগ' কোণের সমান হইবে। ইহার মধ্যে 'কখগ' নামক কোনটীকে 'আঘাত-কোণ আর 'ঘখগ' কোণটীকে প্রতিঘাত-কোণ বলা যায়। সুতরাং সম্পূর্ণ-স্থিতি-স্থাপক দ্রব্যের পরস্পর আঘাত বক্ররেখায় হইলে আঘাত-কোণ প্রতিঘাত-কোণের সমান হয়, ইহা নিশ্চিত হইল।

পরন্তু যদি দ্রব্যটী সম্পূর্ণ স্থিতি-স্থাপক না হয়, তাহা হইলে এই রূপ হইতে পারে না। সেই স্থলে 'খব' বল সমান থাকে, কিন্তু 'খগ' বল স্থিতি-স্থাপকতার অনুসারে হ্রস্ব হয়। যদি ঐ বল 'খজ' রেখার অনুরূপ হয়, তবে, 'খব' এবং 'খজ' এই দুই বলের সঙ্ঘাতে 'খচ' গতি-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থলে 'ঝখচ' কোণ 'গখঘ' কোণ অপেক্ষা বড় সুতরাং বলা যাইতে পারে অসম্পূর্ণ-স্থিতি-স্থাপক দ্রব্যের প্রতিঘাত-কোণ বড় হয়—ফলতঃ দ্রব্যটী যত অল্প স্থিতি-স্থাপক হইবে ততই ঐ কোণ বড় হইবে। কারণ 'খব' সমান থাকিয়া 'খজ' ছোট হইলেই কোণ বড় হইবে, যেমন 'ঝখট' কোণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

(গতির তৃতীয় নিয়ম।)

এই অধ্যায়ে যাহা যাহা কথিত হইল, তাহা সমুদায় স্মরণ করিলেই গতির তৃতীয় নিয়মের প্রকৃতি বোধগম্য হয়। সে নিয়ম এই। যখন একটী দ্রব্য আর একটীকে আঘাত করে, তখন আহত

পদার্থও উহাকে প্রতিঘাত করিয়া থাকে—আর আঘাত-বল এবং প্রতিঘাত-বল সমান ও পরস্পর বিপরীত মুখে কার্য্যকারী হয়।

দ্রব্য মাত্রের সাম্যাবস্থা ও গতি সকলই এই আঘাত প্রতিঘাতের কার্য্য। যখন কোন দ্রব্য স্থির হইয়া আছে তখনও সে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলে নিরন্তর তাঁহার মধ্যাভিমুখে যাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ দ্রব্য যে আধারের উপর আছে, সেই আধারের প্রতিঘাত বশতঃ নামিয়া যাইতে পারে না। যখন একখান জাহাজ জলে ভাসমান হইয়া থাকে, তখন সেই জাহাজ জল ভেদ করিয়া পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে যাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু জলের প্রতিঘাত বশতঃ তাহার গমন নিবারিত হয়। যখন কোন পক্ষী আপনার পক্ষ বিস্তৃত করিয়া বায়ুর উপর স্থির হইয়া থাকে, তখন বায়ুর প্রতিঘাত প্রযুক্তই উহার নিম্নে পতন হয় না। পরন্তু যদি কোন দ্রব্য অধিক বলে পৃথিবীর উপর আহত হয়, তবে, পৃথিবীও সেই দ্রব্যের প্রতি তাদৃশ বলে প্রতিঘাত করে, সুতরাং উহা যত বলে আঘাত করিয়াছিল, পুনর্ব্বার তত বলেই উন্নত হইয়া উঠে। পাখী যদি বায়ুর উপর পক্ষের আঘাত করে তাহা হইলে বায়ুও ঐ পক্ষে তাদৃশ বলে প্রতিঘাত করে, সুতরাং সে ক্রমে ক্রমে উচ্চে উঠে। সাঁতার দিবার সময় জল টানিলে জলও আমাদিগকে টানিতে থাকে, তাহাতেই আমরা জলে অগ্রবর্ত্তী হইতে পারি; যখন পথে চলিয়া যাই তখন পায়ের দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করি, পৃথিবীও আমাদিগকে প্রতিঘাত করে, যদি আমরা পৃথিবীর দ্বারা ঐ প্রতিঘাত প্রাপ্ত না হইতাম তবে, কোন প্রকারেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারিতাম না। জলে বা বায়ুতে যেমন চলিয়া বেড়াইতে পারা যায় না, পৃথিবীর উপরেও সেইরূপ হইত। ফলতঃ যদি কোন প্রাণীকে সর্ব্বতোভাবে নিরবলম্ব করিয়া শূন্যে সংস্থাপিত করিতে পারা যাইত, তবে ঐ প্রাণী স্ব-ইচ্ছায় এক তিলার্দ্ধ স্থান ও কোন দিকে সরিতে

পারিত না। কারণ উহা আপন শরীরের কোন এক ভাগকে অগ্রবর্ত্তী করিবার চেষ্টা করিলেই উহার শরীরের অপরাপর ভাগ সমস্ত ঐ বলে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তিত হইত। তাহাতে ঐ প্রাণী কোন ক্রমেই স্বস্থান হইতে চলিত না। অতএব এমত বলা যাইতে পারে যে, যেমন এই জগতে কোন একটী নূতন পরমাণু সৃষ্ট হয় না—আর যাহারা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের একটীও বিনষ্ট হয় না, তেমনি ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বলও নূতন উদ্ভূত হয় না, আর যে বল আছে, তাহার কিছু মাত্র ধ্বংস হইতে পারে না। যখন আমরা কোন এক দিকে চলিয়া যাই, তখন পৃথিবীকে যেন তাহার বিপরীত দিকে সরাইয়া দেই, আর যখন আমাদিগের সেই গতি স্থগিত হয়, তখন পৃথিবী হইতে যে প্রতিঘাত-বল লইয়া চলিতে ছিলাম তাহাই আবার পৃথিবীতে প্রত্যর্পিত হয়। অতএব এই পৃথিবী যেমন সর্ব্ব প্রকার পরমাণুর আধার, তেমনি ইহা সকল বলেরও আধার। যেমন পৃথিবীস্থ নানাবিধ পরমাণু সকল সংহত হইয়া সকল জড়পদার্থই উৎপন্ন হয়, আবার বিযুক্ত হইয়া এই পৃথিবীতেই যায়, সেইরূপ সকল বলই পৃথিবী হইতে গ্রহণ করা যায়, আবার পৃথিবীতেই প্রত্যর্পিত করিতে হয়।

এই বিষয়োপলক্ষে আর একটী কথা বিবেচ্য আছে, অর্থাৎ এস্থলে এমত জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, যদি সর্ব্ব স্থলেই আঘাত প্রতিঘাত সমান এবং পরস্পর বিপরীত দিকে কার্য্য-কারী হয় এমত বলা যায়, তবে উভয় দিকে সমান বল কার্য্যকারী হওয়াতে বস্তু-মাত্রের সর্ব্বত্র সাম্যাবস্থাই ঘটিবে কদাপি কোন স্থলে গতি জন্মিতে পারে না। অর্থাৎ দেখ, যখন আমরা সাঁতার দেই, সেই সময়ে যেমন অগ্রের জলকে টানি এবং জলও তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে টানে, সেইরূপ আমরা যে জলের ভিতরে আছি সেও আবার আমাদিগকে পশ্চাদ্দিকে টানিতে পারে। যখন পাখী আপন পক্ষের দ্বারা নীচের বায়ুর উপর আঘাত করে এবং

নীচের বায়ু সুতরাং ঊর্দ্ধদিকে প্রতিঘাত করে, তখন উপরের বায়ুও আবার নীচের দিকে আঘাত করিতে পারে। অতএব এরূপ হইলে আমরা কোন প্রকারে সাঁতার দিয়া যাইতে পারিতাম না এবং পক্ষিগণ পাখার উপর ভর দিয়া উঠিতে পারিত না। এই সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হইলে প্রথমতঃ সাঁতার দিয়া যাইবার সময়, অথবা পক্ষী-দিগের উড়িবার সময় যে প্রকার ক্রিয়া করিতে হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। দেখ, পাখীরা উড়িবার সময় পুনঃ পুনঃ পক্ষ বিস্তৃত এবং সঙ্কুচিত করে। যখন নীচের বায়ুর উপর আঘাত করিবে তখন বিস্তৃত করে, কিন্তু ঊর্দ্ধের বায়ু হইতে প্রতিঘাত না পা-ইতে পাইতেই উহা সঙ্কুচিত করিয়া লয়। সুতরাং ঊর্দ্ধ হইতে অধিক প্রতিঘাত না পাওয়াতে অধোদিক্ হইতে বলবৎ আঘাত পাইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে। যদি বল, বক, চিল, বাজ প্রভৃতি শকুন সমস্ত ঐরূপে পুনঃ পুনঃ পাখা গুটাইয়া উড়ে না, ইহার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে, উহারা পাখা গুটায় না বটে, কিন্তু উঠিবার সময় বি-স্তৃত পক্ষ দ্বারা আঘাত প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ পক্ষকে পার্শ্বের দিকে কিঞ্চিৎ বাঁকাইয়া ধরে, তজ্জন্যই ঊর্দ্ধের বায়ু হইতে নীচের দিকে অধিক প্রতিঘাত পায় না। যখন মাঝিকেরা নৌকায় দাঁড় বহন করিয়া যায়, তখন তাহারা একবার দাঁড় ফেলিয়া টানে, আবার তৎ-ক্ষণাৎ উহা তুলিয়া লয়। দাঁড় তুলিয়া না লইলে জলের প্রতিঘাত বশতঃ নৌকার গতি হইতে পারে না। যে সময়ে আমরা সাঁতার দেই সেই কালে হয় ত একবার জল টানিয়া তৎক্ষণাৎ জলের ভিতর হইতে হাত তুলিয়া লই, অথবা পূর্ব্বে করতল যেমন প্রসারিত করিয়া জলকে টানি তাহার পরক্ষণেই আর সেরূপ প্রসারিত করিয়া রাখি না। এইরূপে প্রতিঘাত অপেক্ষা আঘাতকে প্রবলতর করিয়া আমরা অগ্রসর হইতে পারি।

চতুর্থ অধ্যায়।

(বেগের প্রকার ভেদ—সম-বেগ—বর্দ্ধমান-বেগ—হ্রসমান বেগ।)

গতির কাল এবং দূরত্ব ইহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধের নাম বেগ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ঐ গতির আরম্ভ অবধি সমাপন পর্য্যন্ত কখন কখন ঐ সম্বন্ধ সমানই থাকে, কিন্তু অল্প স্থল ব্যতিরেকে প্রায়ই উহা ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, পৃথিবী প্রায় ২৪ ঘণ্টায় আপন ব্যাস পরিবেষ্টন করিয়া এক অহোরাত্র জন্মাইতেছে। ঐ ২৪ ঘণ্টার প্রথম ঘণ্টাতে পৃথিবীর কোন স্থান যতদূর যায় আর শেষ ঘণ্টাতেও ঠিক ততদূর যায়—ফলতঃ ইহার বেগ সর্ব্ব সময়েই সমান থাকে। কিন্তু একটী ভাঁটা গড়াইয়া দিলে ঐ ভাঁটা প্রথম ক্ষণে যতদূর যায় দ্বিতীয় ক্ষণে কদাপি ততদূর যায় না। উহার বেগ ক্রমশঃ হ্রস্ব হইয়া আসিতে থাকে। আবার কোন উচ্চ স্থান হইতে একটী দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইলে উহা প্রথম সেকণ্ডে যতদূর পড়ে, দ্বিতীয় সেকণ্ডে তাহা অপেক্ষা অধিক দূর পড়ে, এইস্থলে উক্ত দ্রব্যের বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে বোধ হয়। এই তিন প্রকার বেগের মধ্যে প্রথম প্রকার বেগের নাম সম-বেগ, দ্বিতীয় প্রকারের নাম হ্রসমান-বেগ, আর তৃতীয় প্রকারের নাম বর্দ্ধমান-বেগ। সম-বেগ স্থলে, যে বলে গতি জন্মে সেই বল গতির আদ্যন্তকাল পর্য্যন্ত সমান ছিল, এমন প্রতীতি হয়। প্রযুক্ত-বল যদি শক্ত্যন্তর সংযোগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই বর্দ্ধমান-বেগ জন্মে, আর হ্রসমান-বেগে প্রযুক্ত-বল ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়াই আসিতে থাকে। ক্রমশঃ এই সকল বেগের প্রকৃতি বর্ণিত হইতেছে।

সম-বেগ।

জড় পদার্থ নিশ্চেষ্ট। সুতরাং আপনি আপনাকে সচল করিতেও পারে না, আর কোন কারণবশতঃ একবার সচল হইলে স্বয়ং আপনার গতি নিবারণ করিতেও সমর্থ হয় না। যদি তাহাই না পারে তবে কোন জড় পদার্থ একবার যে বেগে গমন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই বেগ স্বয়ং ন্যূনাধিক করিতেও পারে না। অতএব সম-বেগে গমন করা জড় পদার্থ মাত্রের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম। কিন্তু পৃথিবীতে সম-বেগের উদাহরণ স্থল অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নিরন্তর অন্যের গতির প্রতিবন্ধিতা করিতেছে। কোন জড় পদার্থকে সচল করিয়া দিবামাত্র ঐ আকর্ষণ শক্তি দ্বারা প্রতিক্ষণে তাহার গমনের বেগ হ্রস্ব হইয়া থাকে, সুতরাং উহার বেগ সম-বেগ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ঘড়ির কাঁটার গতিও সম-বেগে হয় না, উহাও লাফিয়া লাফিয়া চলে। সুতরাং ঐ লম্ফের প্রথম ক্ষণে যত বেগ, শেষে তত বেগ থাকে না।

সুতরাং পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহগণের আহ্নিক গতি ব্যতিরেকে এই প্রকার বেগের উদাহরণ অন্য কোন স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যখন কোন সচল দ্রব্যের প্রতি পুনঃ পুনঃ বল প্রযুক্ত হইতে থাকে, তখন ঐ দ্রব্যের বেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। কখন কখন ছেলেরা ভাঁটা খেলিতে খেলিতে তাহার প্রতি পদাঘাত করত উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়। প্রথম আঘাতে ভাঁটা যত বেগে যায়, দ্বিতীয় আঘাত পাইলে তদপেক্ষা অধিক শীঘ্র যায়, তৃতীয় আঘাতে আরও দ্রুত বেগে গমন করে। একখান চক্রকে তাহার কীলকে বদ্ধ করিয়া যদি এক পার্শ্বে অঙ্গুলি দিয়া অতি অল্প বলে টানা যায়, তবে প্রথম বারে ঐ চক্রটী কিছুমাত্র ঘুরিল কি না বুঝিতেই পারা যায় না। কিন্তু উপর্য্যুপরি সেই প্রকার অল্প অল্প বলে টানিতে টানিতেই ঐ চক্র ঘুরিতে আরম্ভ করে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাতেই

অতিশয় বেগ হইয়া উঠে। এই সকল স্থল দেখিয়া বর্দ্ধমান-বেগের প্রকৃতি অবগত হওয়া যায়।

কিন্তু এই সকল উদাহরণ দ্বারা বর্দ্ধমান-বেগের স্থূল প্রকৃতিমাত্র বুঝিতে পারা যায়, কারণ ভাঁটার পদাঘাত, অথবা চক্রে অঙ্গুলি প্রহার করিবামাত্র উহাদিগের বেগ যেরূপ বর্দ্ধিত হয় পরক্ষণেই আর সেইরূপ থাকে না। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে এবং বায়ুর প্রতিবন্ধকতায় উহাদিগের বেগ ক্রমশঃ হ্রস্ব হইতে থাকে। পুনর্ব্বার আঘাত পাইলেই বেগ বাড়ে, কিন্তু আবার পরক্ষণেই তাহা ন্যূন হয়। অতএব উহাদিগের গতি, হ্রসমান এবং বর্দ্ধমান এই দুই প্রকার বেগেরই উদাহরণস্থল হইতে পারে। আর পদাঘাত বা অঙ্গুলি-প্রহার একবার যেমন বলে হয়, দ্বিতীয়বার তাহা অপেক্ষা অধিক বা অল্প বলেও হইতে পারে। সুতরাং ঐ সকল স্থলে বেগের বৃদ্ধির সম্পূর্ণরূপে নিয়ম নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। যেখানে এইরূপ না ঘটিয়া ক্রমাগত সম-বলে বেগের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তথায় ঐ বেগের নাম সম-বর্দ্ধমান বেগ। যখন কোন দ্রব্য উচ্চ হইতে নীচে পড়ে তখন তাহাতে এই সম-বর্দ্ধমান বেগের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ নিরন্তর সমান বলেই পতনশীল দ্রব্যকে পৃথিবীর মধ্যাভিমুখে টানে। ইহাতে ঐ দ্রব্য প্রথমক্ষণে যত দূর পড়ে, দ্বিতীয় ক্ষণে তাহা অপেক্ষা অধিক দূর পতিত হয়। কতক্ষণে কত দূর কেমন বেগে পড়ে তাহা নিম্ন লিখিত রূপে কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেই নিরূপিত হইতে পারে।

প্রথমতঃ বিবেচনা কর, যেন একটা ঘোড়া দিন মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৪ ঘণ্টা মাত্র চলে; কিন্তু প্রথম ঘণ্টায় এক ক্রোশ, দ্বিতীয় ঘণ্টায় দুই ক্রোশ, তৃতীয় ঘণ্টায় তিন ক্রোশ এবং চতুর্থ ঘণ্টায় চারি ক্রোশ পথ যায়; এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, প্রথমাবধি প্রতি ঘণ্টায় কত ক্রোশ করিয়া গমন করিলে উহার ঐ চারি ঘণ্টায় সমান পথ

যাওয়া হইত ? । এই স্থলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ঘোড়া সর্ব্ব-শুদ্ধ ১০ ক্রোশ পথ চারি ঘণ্টায় গিয়াছিল। সুতরাং যদি উহা প্রতি ঘণ্টায় $\left(\frac{১০}{৪}\right) = ২\frac{১}{২}$ আড়াই ক্রোশ করিয়া চলিত, তাহা হই-লেও চারি ঘণ্টায় ঐ ১০ ক্রোশ পথ যাইতে পারিত। এক্ষণে বিবে-চনা করিয়া দেখ, ঐ ঘোড়া যে চারি ঘণ্টা চলিয়াছিল তাহার মধ্যে কোন ঘণ্টায় ঐ আড়াই ক্রোশ বেগে গমন করিয়াছিল কি না? স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, চারি ঘণ্টার মধ্যের ঘণ্টায় অর্থাৎ দ্বিতীয় ঘণ্টার শেষের অর্দ্ধ এবং তৃতীয় ঘণ্টার প্রথমার্দ্ধ এই দুই অর্দ্ধে যে এক ঘণ্টা হয় তাহাতে ঘোটকের বেগ ঠিক আড়াই ক্রোশ হইয়াছিল। অতএব (১) নিশ্চিত হইতেছে যে, "সমবর্দ্ধমান-বেগ যত সময় ধরিয়া হয় সেই সময়ের ঠিক মধ্য ক্ষণে এমত বেগ হয় যে, সেই বেগে তত সময় চলিলেও সমান পথ যাওয়া যাইতে পারে ; অথবা, যে সময় মধ্যে সমবর্দ্ধমান বেগে যত পথ যাওয়া যায়, সমান বেগে সেই পথ যাইবার উপযুক্ত বেগ উক্ত সময়ের মধ্য ক্ষণেই হইয়া থাকে "।

আবার বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি পূর্ব্ব প্রশ্নে ইহা জিজ্ঞাস্য হয় যে, ঘোড়াটা পূর্ব্ববৎ সম-বর্দ্ধমান-বেগে চলিলে সে ৫ম ঘণ্টার আরম্ভে কত বেগে চলিত ? তাহা হইলে মধ্যম বেগ যে, ২৷৷ ক্রোশ তাহাকেই দ্বিগুণিত করিলে উত্তর ৫ ক্রোশ পাওয়া যাইতে পারে। অতএব (২) ইহাও নিশ্চিত হইতেছে যে "সম-বর্দ্ধমান-বেগ স্থলে সমুদায় সময়ের মধ্য-বেগ যে পরিমিত হইবে, সেই সংখ্যার দ্বিগুণ করিলেই উক্ত সময়ের অব্যবহিত পরক্ষণে কত বেগ হইবে তাহা জানা যাইবে*।" এই দুইটী সূত্র স্মরণ রাখিয়া এক্ষণে বিবেচনা করিয়া

---

* যথা, ০, ২, ৪, ৬, ইত্যাদি রূপে বৃদ্ধি হইলে মধ্য বেগ $= \frac{১২}{৩} = ৪$, তাহার দ্বিগুণ $= ৪ \times ২ = ৮$ ইহাই অন্তিম বেগ, এইরূপে সর্ব্বত্রই হইবে।

দেখ যে, যদি কোন বস্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে এক সেকেণ্ড কাল মধ্যে 'দূ' পরিমিত স্থান পড়ে তবে তাহার ঐ 'দূ' স্থান পড়িবার উপযুক্ত বেগ প্রথমাবধি আছে এমত বলা যায় না। বস্তুতঃ ঐ সেকণ্ড কালকে যদি বহু সংখ্যক অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্ষণে বিভক্ত বলিয়া বোধ করা যায় * তবে এমত কহা যাইতে পারে যে, যখন দ্রব্যটী ১ সেকণ্ডে 'দূ' স্থান পড়িল, তখন ঐ সেকণ্ডের ঠিক মধ্য ক্ষণেই উহার 'দূ' পড়িবার উপযুক্ত বেগ হইয়াছিল। অর্থাৎ দ্রব্য সকল মাধ্যাকর্ষণ বলে এক সেকণ্ডে 'দূ' পরিমিত স্থান পড়ে, সুতরাং প্রথম সূত্রানুসারে সেই 'দূ' স্থান পড়িবার উপযুক্ত বেগ প্রথমাবধি থাকে না—তাহা কেবল ঠিক মধ্য ক্ষণেই থাকে। পরন্তু যদি মধ্য ক্ষণের বেগ 'দূ' এর উপযুক্ত হইল তবে দ্বিতীয় সূত্রানুসারে অন্তিম ক্ষণের পরেই অর্থাৎ দ্বিতীয়

* এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে যে, ১ সেকণ্ড অতি অল্পকাল বলিয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া মধ্য ক্ষণ ধরিয়া হিসাব করা যায় নাই। কিন্তু সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিতে হইলে ১ সেকণ্ডকে ৬০ ক্ষণে বিভক্ত কর, এবং পূর্ব্বোক্ত অশ্বগমনে যেরূপ ৪ ঘণ্টায় ১০ ক্রোশ গতি হইয়াছিল বলিয়া $\frac{১০}{৪}$ = ২॥ ক্রোশ মধ্যবেগ হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ ১ সেকণ্ডে অর্থাৎ ৬০ ক্ষণে কোন বস্তু 'দূ' স্থান পড়ে, সুতরাং উহার মধ্যবেগ $\frac{দূ}{৬০}$; আবার ২য় সূত্রানুসারে যেরূপ পূর্ব্বোদাহরণে ৫ম ঘণ্টায় ২॥ × ২ = ৫ ক্রোশ বেগ হয়, এখানেও তদ্রূপ ১ সেকণ্ডের, অন্তিম ক্ষণের পরক্ষণেই উহার বেগ $\frac{২+\text{'দূ'}}{৬৭}$ হয়, কিন্তু ২য় সেকণ্ডও ৬০ ক্ষণাত্মক, সুতরাং সমুদায় ঐ ক্ষণে উহার গতি $\frac{২+\text{'দূ'}}{৬০} \times ৬০ = ২ \times \text{'দূ'}$; এক সেকণ্ড কাল মধ্যে কোন বস্তুর অধঃপতন ১৬ ফুট হয়, ইহা পরীক্ষা সিদ্ধ আছে, সুতরাং 'দূ'-এর পরিবর্ত্তে ১৬ ফুট ধরিয়া অঙ্ক করিলেই ঠিক হইবে।

সেকণ্ডের আরম্ভেই উহার দ্বিগুণ বেগ হইবে অর্থাৎ যাহাতে ১ এক সেকণ্ডে 'দূ' য়ের দ্বিগুণ স্থান পড়িতে পারে এমত বেগ হইবে। অতএব কোন দ্রব্য প্রথম সেকণ্ডে যত পথ গিয়াছিল, দ্বিতীয় সেকণ্ডে ঐ দ্বিগুণ বেগে উহা অবশ্য তাহার দ্বিগুণ পথ যাইতে পারিবে, কিন্তু তৎকালেই আবার মাধ্যাকর্ষণের বলে উহাকে আরও এক 'দূ' পরিমিত স্থান যাইতে হইবে। সুতরাং দ্বিতীয় সেকণ্ডে উহার গতি ৩ 'দূ' হয়। অতএব দুই সেকণ্ডে অর্থাৎ প্রথম এবং দ্বিতীয় সেকণ্ডে মিলিয়া দ্রব্যটা (১ দূ+৩'দূ) = ৪ 'দূ' পরিমিত স্থান পতিত হইবে। আবার তৃতীয় সেকণ্ডের প্রথমে ঐ দ্রব্যের বেগ ৪ 'দূ' আর ঐ সেকণ্ডে আবার মাধ্যাকর্ষণের বল পাইয়া উহাকে এক 'দূ' যাইতে হয়, অতএব তৃতীয় সেকণ্ড মধ্যে উহার গতি ৫ 'দূ' হইবে। সুতরাং পূর্ব্ব দুই সেকণ্ডে যে ৪ 'দূ' পথ গিয়াছে, আর এই ৫ 'দূ' এই উভয়ে যোগ করিলে যে ৯ দূ হয় দ্রব্যটা ৩ সেকণ্ডে তত দূর পড়ে *।

* নিম্ন-লিখিত অঙ্কবিন্যাস দেখিলে ঐ কথা আরও স্পষ্ট বোধ হইবে। এই স্থলে বিবেচনা কর যে, প্রথম সেকণ্ডে যদি 'ক' হইতে 'খ' পর্য্যন্ত পড়ে তবে দ্বিতীয় সেকণ্ডে 'খ' হইতে 'গ' পর্য্যন্ত পড়ায় পূর্ব্বের তিন গুণ হয়, আর তৃতীয় সেকেণ্ডে 'গ' হইতে 'ঘ' পর্য্যন্ত পড়ায় প্রথম বারের পাঁচ গুণ হয়।

প্রথম সেকেণ্ডে পতন ১৬	
দ্বিতীয় সেকেণ্ডে পতন ৪৮ = (২×২—১) ×১৬।	খ ৩২ = (৩২×১) প্রথম সেকেণ্ডের শেষে বেগ।
দুই সেকেণ্ডে পতন (২×২×১৬) = ৬৪।	গ ৬৪ = (৩২×২) দুই সেকেণ্ডের শেষে বেগ।
তৃতীয় সেকেণ্ডে পতন ৮০ = (৩×২—১) ×১৬।	
তিন সেকেণ্ডের পতন (৩×৩×১৬) = ১৪৪।	ঘ ৯৬ = (৩২×৩) তিন সেকেণ্ডের শেষে বেগ।

এই ক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ যে, দ্রব্যের প্রথম সেকণ্ডে ১ দূ, দ্বিতীয়ে ৩ দূ, তৃতীয়ে ৫ দূ ইত্যাদি ক্রমে পতন হওয়াতে উহার একটী আশ্চর্য্য নিয়ম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাহা এই,—যে হেতু (১ × ২—১)=১ ; (২ × ২—১)=৩, (৩ × ২—১)=৫, অতএব যদি কোন সেকণ্ডে দ্রব্য মাধ্যাকর্ষণ বলে কত দূর পড়ে এমন জিজ্ঞাস্য হয়, তবে (৩) সেই সেকণ্ড সংখ্যাকে দ্বিগুণিত করিয়া তাহা হইতে এক ন্যূন করিয়া যে ফল হইবে, তাহাকে প্রথম বারের পতন দূরত্ব দ্বারা গুণ করিলেই উত্তর হইবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলে দ্রব্য সমস্ত প্রথম সেকেণ্ডে ১৬ ফুট পড়ে ইহা পরীক্ষা সিদ্ধ, অতএব পূর্ব্ব (৩) সূত্রে 'দূ' এর পরিবর্ত্তে ১৬ রাখিয়া অঙ্ক করিলেই ফল স্থির হইবে।

যথা ৯ম সেকেণ্ডে দ্রব্য কত দূর পড়ে এমত জিজ্ঞাস্য হইলে, ৯কে দ্বিগুণ করিয়া ১৮ হইল, তাহা হইতে ১ বাদ দিয়া ১৭ হইল, উহাকে ১৬ দ্বারা গুণ করিয়া ২৭২ ; সুতরাং ২৭২ ফুট উত্তর হইল।

কিন্তু পতনশীল দ্রব্যের কখন্ কত বেগ হয় জানিবার আবশ্যকতা হইলে প্রথমতঃ কত সময়ে কি পরিমিত স্থান পতন হইয়াছে তাহা জানা আবশ্যক। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত (১ম) এবং (২য়) সূত্রানুসারে সেই স্থানসংখ্যাকে পতন কাল সংখ্যা দ্বারা বিভাগ করিলেই ঐ পতনের মধ্যবেগ পাওয়া যাইবে; পরে ঐ মধ্যবেগকে দ্বিগুণিত করিয়া লইলেই উক্ত সময়ের অব্যবহিত পরক্ষণের বেগ কত জানা যাইবে। যদি এমত জিজ্ঞাস্য হয় যে নবম সেকণ্ডের শেষে, অর্থাৎ দশম সেকণ্ডের প্রথমে পতনশীল দ্রব্যের বেগ কত হয়? তাহা হইলে ৯ম সেকণ্ডে দ্রব্যটী কত দূর পড়ে নিশ্চয় করিয়া তাহাকে ৯ দ্বারা ভাগ করিয়া সেই ভাগ-ফলকে দ্বিগুণিত করিয়া লইতে হয়। যথা, $\frac{৯^2 \times ১৬}{৯} \times ২ = ২৮৮$। কিন্তু এইরূপ না করিয়া ক্রিয়া

লাঘবার্থে বলা যায় যে, (৪) কাল-সংখ্যা দ্বারা ৩২ কে পূরণ করিলেই অন্তিম-বেগ জানা যাইবে। এই বিষয় অধিক স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য কতিপয় প্রশ্নের উত্তর করিয়া অঙ্ক কসিবার প্রথা প্রদর্শিত হইতেছে।

১ প্রশ্ন।—৫ সেকণ্ড কাল মধ্যে কোন দ্রব্য কত উচ্চ হইতে পড়িবে। $৫^২ \times ১৬=৪০০$ উত্তর।

২ প্রশ্ন।—কোন্ দ্রব্য কত সেকণ্ডে ১০০ ফুট উচ্চ হইতে পড়িবে?

$$\sqrt{\frac{১০০}{১৬}}=\frac{১০}{৪}=২\frac{১}{২}$$ সেকণ্ড উত্তর।

৩ প্রশ্ন।—৪র্থ সেকণ্ডে দ্রব্য কত দূর পড়ে?

$(২\times৪-১)\times১৬=৭\times১৬=১১২$ ফুট উত্তর।

৪ প্রশ্ন।—কতক্ষণের পর কোন পতনশীল দ্রব্যের বেগ প্রতি সেকণ্ডে ১৬০ ফুট পরিমিত হয়?

$\frac{১৬০}{৩২}=৫$ সেকণ্ড উত্তর।

অতএব সাঙ্কেতিক নিয়ম করিবার নিমিত্ত এমত বলা যাইতে পারে যে, যদি 'স' অর্থে সময়, 'দূ' অর্থে দূরত্ব 'বে' অর্থে বেগ, 'মা' অর্থে মাধ্যাকর্ষণ-প্রদত্ত প্রথম সেকণ্ডের অব্যবহিত পরক্ষণের বেগ (অর্থাৎ ৩২ ফুট) হয়; তাহা হইলে গণিত শাস্ত্রের সঙ্কেতানুসারে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সমস্ত এইরূপে লিখিত হয়, যথা—

(১) $দূ=স^২\times\frac{১}{২}মা$।

এবং (২) $বে=স\times মা$।

(হ্রসমান-বেগ।)

সম-বর্দ্ধমান-বেগের প্রকৃতি এক প্রকার কথিত হইল। এক্ষণে সম-হ্রসমান-বেগের বিষয় কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। যখন কোন সচল দ্রব্যের উপর অন্য কোন বল প্রতিকূল ভাবে কার্য্য করে তখন উক্ত দ্রব্যের বেগ ক্রমশঃ হ্রস্ব হইয়া যায়। পৃথিবীর উপর হইতে যে সকল দ্রব্য উৎক্ষিপ্ত হয় তাহাদিগের উৎক্ষেপ-বলের প্রতিকূল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে, সুতরাং উহার বেগ ক্রমে ক্রমে হ্রস্ব হইয়া পরিশেষে কিছুই থাকে না, সুতরাং ঐ দ্রব্যের পুনর্ব্বার নিম্নাভিমুখে গতি হয়। উৎক্ষিপ্ত দ্রব্যের ঊর্দ্ধ গতি যতক্ষণে হয় উহার অধঃপতনেও ঠিক্ তাহার সমান কাল লাগে। ইহার কারণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। যদি কোন দ্রব্য এমত বলে উৎক্ষিপ্ত হয় যে, মাধ্যাকর্ষণ প্রতিবন্ধক না হইলে উহা প্রতি সেকণ্ডে (৩×৩২)=৯৬ ফুট যায়, তবে মাধ্যাকর্ষণ প্রতিবন্ধক হওয়াতে প্রথম সেকণ্ডের শেষে উহার বেগ ২×৩২ ফুট থাকে, দ্বিতীয় সেকেণ্ডের শেষে ১×৩২ থাকে, আর তৃতীয় সেকণ্ডের শেষে কিছুই থাকে না। কারণ মাধ্যাকর্ষণ প্রতি সেকণ্ডে ৩২ ফুট করিয়া উহার গতির বেগ কমাইতে থাকে, অতএব বোধ হইতেছে ৩×৩২ ফুট পরিমিত বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে দ্রব্যটা তিন সেকণ্ডে যত দূর যাইতে পারে ততই যায়। কিন্তু সেই স্থান হইতে নামিতে আরম্ভ করিলে প্রথম সেকণ্ডের শেষে ১×৩২ ফুট মাত্র বেগ পায় দ্বিতীয় সেকণ্ডের শেষে ২×৩২ ফুট পায়, আর তৃতীয় সেকণ্ডের শেষে ৩×৩২ ফুট পায়। সুতরাং নামিতেও তিন সেকণ্ডের ন্যূন হয় না। অতএব কতদূর নামিল বিবেচনা করিলেই কত দূর উঠিয়াছিল, নিশ্চয় হইতে পারে। তিন সেকণ্ডে যে দ্রব্য পড়ে সে (৩²×১৬)=১৪৪ ফুট উচ্চ হইতে পড়ে ইহা জানা আছে। অতএব

ঐ দ্রব্যটা অবশ্য ১৪৪ ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল, নচেৎ সেই পরিমাণ নিম্নে আসিতে পারিত না *।

দুইটী প্রশ্নের উত্তর দেখাইয়া ইহা আরও স্পষ্ট করা যাইতেছে।

১ প্রশ্ন।—যদি ১৯২ ফুট প্রতি সেকণ্ডে যাইতে পারে, এমত বেগে কোন দ্রব্য ঠিক ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে উহা কত উচ্চ পর্য্যন্ত উঠিবে?

$\frac{১৯২}{৩২}=৬$; $৬^২\times১৬=৫৭৬$ ফুট, উত্তর।

২ প্রশ্ন।—যদি ৬৪ ফুট বেগে কোন দ্রব্য উৎক্ষিপ্ত হয়, তবে কত ক্ষণে উহা পুনর্ব্বার আসিয়া ভূমি স্পর্শ করে? $\frac{৬৪}{৩২}=২$ সেকণ্ড উঠিতে লাগে। সুতরাং পড়িতেও আবার দুই সেকণ্ড লাগে। অতএব এক বার উঠিয়া পুনর্ব্বার পড়িতে ২+২=৪ সেকণ্ড লাগিবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

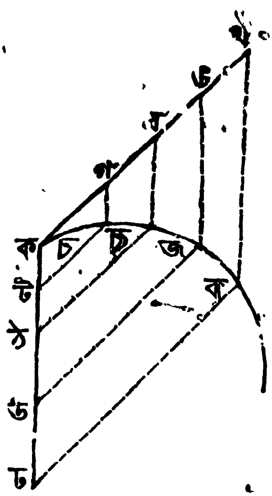
[বিক্ষিপ্ত-গতি—ক্রমনিম্ন ধরাতলে—গতিদোলক—দোলক দ্বারা পৃথিবীর আহ্নিক গতির নিরূপণ।]

মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে নিক্ষিপ্ত এবং উৎক্ষিপ্ত দ্রব্যের যেরূপে বেগ হয় তাহা কথিত হইল। এক্ষণে ঠিক্ ঊর্দ্ধে বা নিম্নে না হইয়া যে দ্রব্যের প্রতি অন্য কোন দিকে বল প্রযুক্ত হয় তাহার গতি কিরূপ হইবে তাহা বিবেচনা করা যাইতেছে। বন্দুকের গুলি, ধনুর শর, বাঁটুল,

---

* ১ম সেকণ্ডের প্রথমে বেগ	... ৯৬	১ম সেকণ্ডে ঊর্দ্ধগতি	... ৮০
২য় „ „	... ৪৬	২য় „ „	... ৪৮
৩য় „ „	... ৩২	৩য় „ „	... ১৬
			১৪৪ ফুট।

ঢিল এবং ছাদের ও গাড়ুর নলের জল ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত বস্তু সমুদায় সরল রেখাক্রমে যায় না। উহারা যে প্রকার বক্র পথে গমন করে তাহাকে ক্ষেপণী কহে। উহার প্রকৃতি নিম্নবর্ত্তী চিত্রদৃষ্টে অনায়াসে বোধগম্য হইবে।



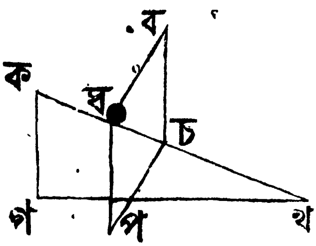
'ক' নামক বর্ত্তুল 'কখ' সরল রেখায় বিক্ষিপ্ত হইলে, বিক্ষেপ বলে উহার গতি 'কখ' সরল রেখাক্রমেই হইতে পারে, কিন্তু উহার গমন সময়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ উহাকে নীচের দিকে লইয়া আইসে, সুতরাং বিভিন্ন দিকে দুই বল প্রযুক্ত হওয়াতে দ্রব্যটী 'কখ' রেখাক্রমে যায় না। যদি বিক্ষেপ-বল এমত হয় যে মাধ্যাকর্ষণের প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে সেই বলে দ্রব্যটী সমবেগে চলিয়া প্রথম সেকণ্ডে 'ক' হইতে 'গ' পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় সেকণ্ডে 'গ' হইতে ঘ পর্য্যন্ত, তৃতীয় সেকণ্ডে 'ঘ' হইতে 'ঙ' পর্য্যন্ত, আর চতুর্থ সেকণ্ডে 'ঙ' হইতে 'খ' পর্য্যন্ত যায় ;—আর পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখগামী রেখা 'কট' পর্য্যন্ত যদি ১৬ ফুট হয়, 'কঠ' ($২^২\times১৬$)=৬৪ ফুট, 'কড' ($৩^২\times১৬$)=১৪৪ ফুট এবং 'কঢ' ($৪^২\times১৬$)=২৫৬ ফুট হয়, তবে 'গ' এর নিম্নদিকে 'কট' রেখার সমান এবং সমান্তরাল 'গচ' রেখা টানিয়া এবং উহাতে 'টচ সংযুক্ত করিয়া 'কগচট' একটী সমান্তরাল চতুর্ভুজ প্রস্তুত করিলেই বিক্ষিপ্ত দ্রব্যটী ঐ চতুর্ভুজের কর্ণ 'কচ' রেখাক্রমে যাইবে। সুতরাং এই রূপে 'ছ' 'জ' 'ঝ' প্রভৃতি স্থান দিয়া বিক্ষিপ্ত

দ্রব্যের গতি হইবে। বিক্ষিপ্তের গতি এইরূপ বক্র রেখাক্রমে হয় বলিয়াই যাহারা বন্দুকাদি বিক্ষেপক অস্ত্র ব্যবহার করে, তাহারা যে স্থানে অস্ত্র প্রয়োগ করিবে, তাহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে লক্ষ্য করে। সিপাহীরা শত্রুর মাথার দিকে তাগ করে, তাহাতে গুলি যাইয়া ঠিক্ বুকে লাগে। যদি বুকে তাগ করিত তবে পেটে লাগিত *।

* পূর্ব্বে আমীনদিগের ব্যবহার্য্য বলিয়া যে গজের প্রতি-রূপ প্রকাশ করা গিয়াছে সেই গজ লইয়া বিক্ষিপ্ত পদার্থের গতির উচ্চতা এবং দূরত্ব নিরূপিত করা যাইতে পারে। বোধ কর, যেন কেহ এমত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল যে, যত বারুদ দিলে বন্দুক হইতে গুলি প্রথম সেকণ্ডে ১০০০ ফুট যাইতে পারে এমত বারুদ পরিপূর্ণ করিয়া কোন বন্দুকের মুখ ত্রিশ অংশ (৩০°) উচ্চ করিয়া তাহা হইতে গুলি প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই গুলি কত উচ্চে উঠিয়া কত দূরে যাইয়া পড়িবে? এস্থলে উক্ত গজ লইয়া নিম্ন-লিখিতরূপে একটী ক্রিয়া করিলেই উত্তর হইবে। কাগজের উপর প্রথমতঃ ৩০ অংশ পরিমিত কোণ করিতে হইবে। সেই কোণের দুই দিকে যে দুইটী সরলরেখা হইবে, তাহার উপরকার রেখাটীকে ১০০০ ফুটের পরিবর্ত্তে ১০ ইঞ্চি ধরিয়া লও। সেই দশ ইঞ্চির প্রান্ত ভাগ হইতে নীচের রেখার উপর একটী লম্ব পাত কর। গজ দিয়া পরিমাণ করিতে গেলেই ঐ লম্ব রেখা ঠিক পাঁচ ইঞ্চি পরিমিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এস্থলে ঐ পাঁচ ইঞ্চি ৫০০ ফুটের স্থানীয় হইল, কারণ পূর্ব্বে ১০০০ ফুটকে ১০ ইঞ্চি করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে উক্তগুলির উর্দ্ধাভিমুখে বেগ প্রথম সেকণ্ডে ৫০০ ফুট হইয়াছে। এক্ষণে ৫০০কে ৩২ দ্বারা ভাগ করিতে হ্রসমান বেগের নিয়মানুসারে $\frac{৫০০}{৩২}$ = ১৫$\frac{৫}{৮}$ সেকণ্ড হয়। ঐ রাশির বর্গকে ১৬ দ্বারা গুণ করিলে (১৫$\frac{৫}{৮}$)^২ × ১৬ = ৩৯০৬$\frac{১}{৪}$ ফুট উর্দ্ধে উঠিত। আবার, যে রেখার উপর লম্বপাত হইয়াছে, সম্পাত স্থান পর্য্যন্ত সেই রেখাকে পরিমাণ করিয়া দেখিলেই উহাকে প্রায় ৮$\frac{৩}{৪}$ অর্থাৎ ঠিক ৮.৬৬ ইঞ্চি জানা যাইবে, সুতরাং (যে হেতু ১০০০ ফুটের পরিবর্ত্তে ১০ ইঞ্চি লওয়া হইয়াছে) ঐ রেখাও ৮৬৬ ফুটের স্থানীয় হইল। সম-বেগের নিয়মানুসারে ঐ ৮৬৬কে ১৫$\frac{৫}{৮}$ অর্থাৎ কাল সংখ্যার দ্বারা গুণ করিলে (৮৬৬ × ১৫$\frac{৫}{৮}$) = ১৩৫৩১$\frac{১}{৪}$ ফুট হইবে। কিন্তু কোন্ দ্রব্যের উঠিতেও যতক্ষণ লাগে আবার পড়িতেও ততক্ষণ লাগে, সুতরাং ঐ গুলি যদি ১৫$\frac{৫}{৮}$ সেকণ্ড ধরিয়া উঠিয়া থাকে, তবে অবশ্য আবার ততক্ষণ ধরিয়া পড়িবে। অতএব ঐ ১৩৫৩১কে দ্বিগুণিত করিলেই গুলি কত দূরে পড়িবে নিশ্চয় হইবে, অর্থাৎ ১৩৫৩১$\frac{১}{৪}$ × ২ = ২৭০৬২$\frac{১}{২}$ ফুট। গণিত দ্বারা ফল এইরূপে স্থির হয় বটে, কিন্তু বায়ুর প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত

(ক্রম-নিম্ন-ধরাতলে গতি।)

যেখানে মাধ্যাকর্ষণ বিনা প্রতিবন্ধকে কার্য্য করিতে পায় সেই সেই স্থলে পতনশীল দ্রব্যের বেগ যে প্রকার হয় তাহা কথিত হইল। কিন্তু কোথাও কোথাও অন্য কাহারও প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত মাধ্যাকর্ষণের কতক বল কার্য্যকারী হইতে পারে না। পরন্তু সেই স্থলেও মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃতির অন্যথা নাই।

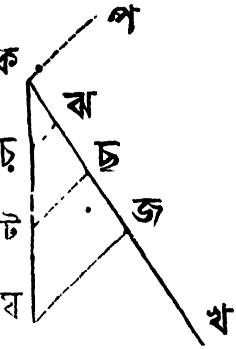


'কখ', এক খানি তক্তা 'কগ' প্রাচীরে ঠেসান আছে। 'ক' স্থলে যদি 'ঘ' নামক বর্ত্তুলকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা গড়াইয়া গড়াইয়া 'খ' স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহার নাবিবার কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। কিন্তু এই স্থলে মাধ্যাকর্ষণ আপনার সমুদায় বলে কার্য্যকারী হয় না যদি 'ঘপ' রেখা মাধ্যাকর্ষণের স্থানীয় হয়, তবে গতি বিভাগের নিয়মানুসারে উহাকে ভাগ করিয়া 'বঘ' এবং 'ঘচ' দুইটী বল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে 'বঘ' বল 'কখ' ধরাতলের 'ঘব' প্রতিঘাতে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, পরে যে 'ঘচ' বল অবশিষ্ট থাকে তাহার দ্বারাই বর্ত্তুলটা গড়াইয়া যায়। কিন্তু এই স্থলেও মাধ্যাকর্ষণের বল অবিরত প্রযুক্ত হইতে থাকে। এই হেতু বর্ত্তুলের বেগ সম-বর্দ্ধমানরূপে প্রতীয়মান হয়।

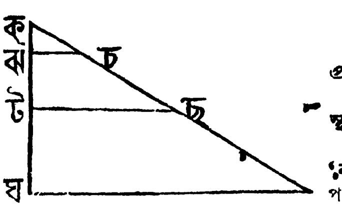
'কখ'এর ন্যায় ক্রম-নিম্ন ধরাতলের উপর হইতে কত ক্ষণে কত দূর কোন দ্রব্য পতিত হয়, ইহা নিরূপিত করিতে হইলে এইরূপ

কার্য্যে এইরূপ দৃষ্ট হয় না। বিক্ষিপ্ত পদার্থের উচ্চতা এবং দূরত্ব ইহা অপেক্ষা অনেক অল্প হয়।

গণনা করিতে হয়, যথা ‘ক’ হইতে ‘কখ’ রেখার (পার্শ্বস্থ চিত্রানুরূপ) ‘কপ’ একটী লম্ব রেখা টান এবং ‘ক’ হইতে ওলন দড়ি ফেলিলে যেরূপ হয় মাধ্যাকর্ষণের অভিমুখে সেইরূপ ‘কঘ’ রেখা টান এবং ‘কচ’ ১৬, ‘কট’ ৬৪, ‘কঘ’ ১৪৪ ইঞ্চি বা অঙ্গুলী এইরূপ করিয়া ‘কঘ’ রেখাটীকে ভাগ কর। তাহার পর ‘চ’ ‘ট’ ও ‘ঘ’ হইতে ‘চঝ’ ‘টছ’ ‘ঘজ’ প্রভৃতি রেখা ‘কপ’ এর সমান্তরাল ররিয়া টানিলেই জানা যাইবে যে, ‘কঝ’ এক সেকণ্ডে ‘কছ’ দুই সেকণ্ডে, এবং ‘কজ’ তিন সেকণ্ডে পড়িবে।



ক্রম-নিম্ন-ধরাতলের উপর যাইতে যাইতে দ্রব্যের কখন্ কেমন বেগ হয়, জানিবার আবশ্যক হইলে উক্তরূপ না করিয়া এইরূপে চিত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।



প্রথমতঃ পার্শ্ববর্ত্তী চিত্রে ‘কঘ’ প্রাচীরের নিম্নভাগ ‘ঘ’ হইতে ‘ঘপ’ স্থান পর্য্যন্ত একটী লম্ব রেখা টানিয়া ‘কঝ’ ১৬, ‘কট’ ৬৪, এবং ‘কঘ’ ১৪৪ ফুট, অথবা তাবন্মিত ইঞ্চি কিম্বা অঙ্গুলি করিয়া লও পরে ‘ঝচ’ এবং ‘টছ’ দুইটী রেখা ‘ঘপ’ এর সমান্তরাল করিয়া টান, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে যে, ‘ঝ’ স্থানে দ্রব্যটী বিনাবলম্বনে পড়িলে যেমন বেগে পড়িত ‘চ’ স্থানে উহার সেই পরিমাণ বেগ, ‘ছ’ স্থানে ‘ট’ স্থানের সমান বেগ, এবং ‘প’ স্থানে ‘ঘ’এর সমান বেগ হইবে।

অতি সূক্ষ্ম একটী সূত্রে কোন ভারী গোল বস্তু বান্ধিয়া ঝুলাইলে দোলক প্রস্তুত হয়। ঐ প্রকার দোলক ঘটী যন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া

থাকে। উহার নীচে যে ভারী বস্তুটী থাকে, তাহার নাম দোলপিণ্ড। যে সূত্র বা তারের দ্বারা ঐ পিণ্ড বদ্ধ থাকে, তাহার নাম যোজক সূত্র; ঐ যোজকসূত্র যাহাতে বদ্ধ থাকে, তাহার নাম কীলক। দোল পিণ্ডকে এক পার্শ্বে কিঞ্চিৎ টানিয়া ছাড়িয়া দিলেই উহা পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইতে থাকে। অর্থাৎ উহা ধনুরাকার পথে একবার উচ্চ হইতে নীচে নামিয়া আইসে এবং পুনর্ব্বার নীচ হইতে উপরে উঠিয়া যায়। উপর হইতে নীচে নামিবার কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, সুতরাং সেই গতি পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সম-বর্দ্ধমান বেগে নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু যখন উহার ঊর্দ্ধ গমন হয়, তখন মাধ্যাকর্ষণ ঐ গতির প্রতিবন্ধকতা করে। অতএব ঐ উচ্চ গতি সম-হ্রাসমান বেগে হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বেগ জন্মিতেও যত সময় লাগে, তাহার হ্রাস হইতেও সেইরূপ তৎ-পরিমিত কালের আবশ্যকতা আছে। উক্ত দোলকের ঊর্দ্ধ গমন এবং অধঃপতন উভয়ই সমকালে হইয়া থাকে। দোলকের একবার অধঃপতন ও ঊর্দ্ধ গমন হইলেই একবার দোলন হইল বলা যায়।

কোন দোলকের প্রত্যেক দোলনে সমান সময় লাগে; তাহার কারণ, প্রথম বারে অধঃপতনে মাধ্যাকর্ষণ উহার প্রতি যতক্ষণ বল দেয় এবং সেই বল সমুদায় ক্ষয় হইতে হইতে যদি দোলপিণ্ড অপর দিকে ততক্ষণ ধরিয়া উঠে, তবে সেই স্থান হইতে নামিবার কালেও মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা প্রথম বারের সমান বলই অবশ্য প্রদত্ত হইবে। সুতরাং তজ্জন্য দোলক আবার অপরদিকে আপনার স্থান পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিবে। এই প্রকার পুনঃ পুনঃ হওয়াতে সকল দোলনেরই কাল সমান হয়। ফলতঃ যদি বায়ু এবং কীলকের ঘর্ষণ প্রতিবন্ধক না হইত তবে দোলককে একবার দুলাইয়া দিলে তাহা আর কদাপি আপনা হইতে স্থির হইতে পারিত না।

দোলকের এইরূপ সম-সাময়িকত্ব গুণ, নিশ্চয় করিয়া পণ্ডিতেরা দোলক দ্বারা ঘটী যন্ত্রে এক প্রকার সম-বেগের কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ঘটী যন্ত্রের ভিতরে একটী দন্তুর চক্র থাকে তাহার নাম স্কেপ্‌মেণ্ট। আর দোলকের কীলকের সন্নিধানে একটী ধাতুময় দ্বিশৃঙ্গ যন্ত্র উন্নতমুখ হইয়া থাকে। উহার শৃঙ্গদ্বয়কে 'পালেট' বলে, ঐ পালেট দোলক কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। দোলকের একবার পরিচালনে উহার এক একটী শৃঙ্গ একবার করিয়া উক্ত স্কেপ্‌মেণ্ট চক্রের দন্তে বদ্ধ হয় আবার ছাড়িয়া যায়। এইরূপে উক্ত চক্রে যতগুলি দন্ত থাকে, দোলকটী ততবার না দুলিলে চক্রটীর একবার সম্পূর্ণ আবর্ত্তন হয়না। অতএব যদি দোলকটী এমত হয় যে, উহা এক সেকণ্ডে একবার মাত্র দুলে তাহা হইলেই স্কেপ্‌মেণ্টের যত দন্ত, তত সেকণ্ডে ঐ চক্র একবার ঘুরিতেছে নিশ্চয় হইবে। এদিকে এই পর্য্যন্ত স্থির হইলেই আবার ঐ স্কেপ্‌মেণ্টের যোগে অন্যান্য চক্র পরিচালিত করিয়া ঘণ্টা মিনিট, সেকণ্ড প্রভৃতি কাঁটা যেরূপে যথা নিয়মে চলিতে পারে এমন উপায় করা যায়।

সকল দোলকই কিছু এক সেকণ্ডে একবার দুলে এমত নহে। দোলকের যোজক-সূত্র যত দীর্ঘ হয় উহার দোলনে তত অধিক কাল লাগে। এই বিষয় অনায়াসেই পরীক্ষা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। দেখ, একটী রজ্জুতে কোন দ্রব্য বন্ধন করিয়া যদি তাহাকে দুলাইয়া দেওয়া যায় এবং সেই সময়ে ঐ রজ্জুকে ক্রমে ক্রমে হ্রস্ব করা যায় তাহা হইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রথমে এক একবার দুলিতে যত সময় লাগিতেছিল, পরে আর তত সময় লাগে না; দ্রব্যটী পূর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্রতর দুলিতে থাকে।

যদি এমত হইল তবে অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, কোন দোলকের কীলক-সন্নিহিত ভাগ যত বেগে চলিতে পারে তাহার সর্ব্ব নিম্নভাগ কখনই তত বেগে যায় না। এই রূপে ঐ বেগ উপর হইতে যত

নীচে আইসে ততই স্বল্প হয়, আর নীচ হইতে যত উপরে যায় ততই বর্দ্ধিত হয়। অতএব এমত বলা যাইতে পারে যে, দোদুল্যমান দোলকের নিম্ন দিকের অণুগুলি উপরিস্থ অণু সকলের বেগ হ্রস্ব করিয়া এবং ঐ উপরিস্থ অণু সমস্তের যোগে বৃদ্ধিত-বেগ হওয়াতে সকল বেগের সঙ্ঘাতফল যে মধ্য-বেগ তাহাতেই দোলনের গতি সম্পাদিত হইতেছে। অতএব আপনা হইতেই সেই মধ্য বেগে চলিতে পারে এমত একটী অণুও অবশ্য ঐ দোলক মধ্যে অবস্থিত আছে। ঐ মধ্য-বেগ বিশিষ্ট অণুটীর বেগ নিম্নস্থ অণু সকলের বেগ অপেক্ষা অধিক এবং উপরিস্থ অণু সকলের অপেক্ষা অল্প। সেই অণুটীর প্রকৃত বেগেই দোলন হইয়া থাকে। তাহার যে স্থান তাহাকে দোল-মধ্য বলা যায়। দোল-মধ্য যদি উন্নত হইয়া উঠে তবে দোলকের বেগ বৃদ্ধি হয় আর যদি নত হইয়া পড়ে তাহা হইলে দোলকের বেগ ন্যূন হয়। অতএব কোন দোলককে সমবেগে পরিচালিত করিতে হইলে, দোল মধ্যটী যাহাতে সর্ব্বকাল সমভাবে থাকে এমত করিয়া রাখা আবশ্যক। ঋতু ভেদে তাপের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। তাপের আধিক্য হইলে সকল বস্তুই বিস্তৃত হয়। সুতরাং গ্রীষ্মকালে দোলক বিস্তৃত হওয়াতে দোল-মধ্য নামিয়া আইসে তাহাতে দোলকের বেগ ন্যূন হইয়া ঘটী যন্ত্রের বৈলক্ষণ্য জন্মায়। আবার শীতকালে ইহার বিপরীত ঘটে। এই সকল বৈষম্য নিবারণের নিমিত্ত পণ্ডিতেরা যে সকল বিবিধ উপায় অবধারণ করিয়াছেন তাহা এস্থলে বক্তব্য নহে। পরন্তু সকলেরই জানা আছে যে, ঘড়ী 'ফাষ্ট' অর্থাৎ দ্রুত-বেগে চলিলে দোলপিণ্ডকে কিঞ্চিৎ নামাইয়া আর 'স্লো' অর্থাৎ মন্দগতি হইলে ঐ পিণ্ডকে কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া দিতে হয়।

পণ্ডিতেরা দোলক বিষয়ে যে, এই মাত্র নিরূপিত করিয়াছেন এমত নহে। গণিতের সাহায্যাবলম্বন করিয়া দোলকের দৈর্ঘ্য এবং উহার দোলন-কাল ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধও নিশ্চয় করিয়াছেন। অর্থাৎ

যদি ১ হাত এবং ৪ হাত পরিমিত দুইটী রজ্জু দ্বারা দুইটী দোলক প্রস্তুত করিয়া উভয়টীকে একেবারে দুলাইয়া দেওয়া যায় তবে দৃষ্ট হইবে যে প্রথমটী যে সময়ে দুই বার দুলে সেই সময়ে দ্বিতীয় একবার মাত্র দুলিবে। এক্ষণে দৈর্ঘ্যের সংখ্যা এবং কালের পরিমাণ লইয়া বিবেচনা করিলেই বোধ হইবে যে, দোলকের দৈর্ঘ্য, দোলন কালের বর্গানুসারে বৃদ্ধি হয়। অতএব যদি 'দৈ' দৈর্ঘ্যের এবং 'কা' কালের সঙ্কেত হয়, তবে উক্ত সম্বন্ধ এইরূপে প্রকাশিত হইতে পারে—যথা $দৈ : দৈ_1 = কা^2 : কা_1^2$।

যদি পৃথিবী সর্ব্বতোভাবে গোল অথচ নিশ্চল হইত তাহা হইলে দোলকের বিষয়ে আর অধিক অনুসন্ধানের আবশ্যকতা থাকিত না। পৃথিবীর কোন এক দেশে কত বড় দোলক এক সেকণ্ডে একবার দুলে ইহা পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বত্র সেই পরিমাণ দোলক নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার দোল-মধ্য যাহাতে সমভাবে থাকে এমত উপায় করিতে পারিলেই সর্ব্বস্থানে দোলকের কার্য্য একরূপেই সম্পাদিত হইতে পারিত। কিন্তু পৃথিবী ঠিক গোল নয়। ইহার নিরক্ষদেশ মেরু প্রদেশ অপেক্ষা ২৬ ইংরাজী মাইল স্ফীত হইয়া আছে। সুতরাং তথায় মাধ্যাকর্ষণের বল অপেক্ষাকৃত অল্প। আবার পৃথিবী উভয় মেরুগত ব্যাসকে অক্ষ স্বরূপ করিয়া নিরন্তর ঘুরিতেছে। সুতরাং ঐ ঘূর্ণন-জনিত কেন্দ্র-বিমুখ-বল মেরুদেশ অপেক্ষা নিরক্ষদেশে সমধিক প্রবল। ইহাও তত্তদ্দেশে মাধ্যাকর্ষণ হ্রস্ব হইবার এক মহৎ কারণ। এই দুই কারণ বশতঃ মেরুদেশে মাধ্যাকর্ষণ যত নিরক্ষ বৃত্তের উপর তাহার ১৮০ ভাগের এক ভাগ ন্যূন হইয়া আছে। এক্ষণে বিবেচনা কর মাধ্যাকর্ষণই পৃথিবীর কোন স্থানে অধিক আর কোন স্থানে অল্প হইল, তবে অবশ্যই এক দোলকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে ভিন্ন ভিন্ন কালে দোলন হয় ইহা প্রতীত হইবে। যদি দোলনের কাল সমান করিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে উহাদিগের দৈর্ঘ্য

কদাপি সমান রাখা হইবে না। মেরু সন্নিহিত দেশে যে দোলক এক সেকণ্ডে দুলিবে নিরক্ষদেশে তাহা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র না হইলে এক সেকণ্ডে একবার দুলিবে না। পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে, দোলককে লণ্ডন নগরে ৩৯.১৩৯ ইঞ্চি কলিকাতায় ৩৯.০৫৫ * ইঞ্চি, আর ঠিক নিরক্ষ বৃত্তের উপর ৩৯.০২১ ইঞ্চি পরিমিত করিলে উহা প্রতি সেকণ্ডে এক একবার দুলে। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, আহ্নিক গতি বশতঃ পৃথিবীর নিরক্ষ দেশে কেন্দ্র-বিমুখ-বল অধিক হওয়াতে তথায় মাধ্যাকর্ষণ কিঞ্চিৎ হ্রস্ব হইয়া আছে; অতএব মেরুদেশে যে দোলক এক সেকণ্ডে একবার দুলে তাহাকে নিরক্ষদেশে আসিয়া উক্ত দোলন সমভাবে রাখিতে হইলে উহাকে কিঞ্চিৎ হ্রস্ব করিয়া ফেলিতে হয়। অতএব ইহাতেই দোলক দ্বারা পৃথিবীর আহ্নিক গতি এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে। কিন্তু অনতি-কাল গত হইল ফ্রান্সদেশ বাসী ফকুণ্ট নামক জনৈক পদার্থ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত দোলক দ্বারাই পৃথিবীর গতির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। তদ্বিবরণ অবগত হইলে দোলকের আর একটী প্রকৃতি স্পষ্ট বোধ হয়, এই হেতু তাহা এই স্থলে উল্লিখিত করিয়া প্রকরণ সমাপ্ত করা যাইতেছে।

পৃথিবীর প্রতিরূপ যে সকল কৃত্রিম গোলক প্রস্তুত হইয়াছে তাহার একটী লইয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, উহার মেরুর ভিতর দিয়া অনেক গুলি রেখা গমন করিয়াছে। ঐ গুলিকে মধ্য-রেখা বা দ্রাঘিমা রেখা বলা যায়। আর নিরক্ষ-বৃত্তের সমান্তরাল আর কতকগুলি বৃত্তও মেরুদ্বয়কে বেষ্টন করিয়া ঐ গোলকের উপর ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া থাকে। সেই গুলিকে অক্ষাংশ-বৃত্ত বলা

* এই পরিমাণ কোন প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই—কিন্তু বোধ হয়, ইহাতে অধিক ভ্রম না থাকিবে। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় ইহা নিরূপিত হইয়াছে।

যায়। তন্মধ্যে মেরুর অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী কোন একটী অক্ষাংশ-বৃত্ত এবং তদন্তর্গত মধ্য-রেখাংশভাগ সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে এমত বোধ হয় যেন, মেরুই ঐ বৃত্তটীর কেন্দ্র, এবং মধ্য রেখা গুলি ঐ কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া ব্যাসার্দ্ধ স্বরূপে ঐ বৃত্ত-পরিধিতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। অতএব যদি একটী গোল টেবিল লইয়া তাহার ঠিক্ মধ্যস্থান হইতে চতুর্দ্দিকে উহার পরিধি পর্য্যন্ত সরল রেখা সকল টানা যায় তবে উহা পৃথিবীর ঐ ভাগের অনুরূপ হইল এমত বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর কোন ভাগ টেবিলের ন্যায় সমপৃষ্ঠ নহে বলিয়া উক্ত সাদৃশ্যের যে বৈলক্ষণ্য বোধ হয়, তাহা অতি সামান্য, অতএব এস্থলে ধর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ মেরু প্রদেশ কিছু চাপা আছে, পৃথিবীর অন্যান্য ভাগ যত গোল ঐ স্থান তত গোল নয়। যাহা হউক, এক্ষণে উক্ত টেবিলটীকে কোন ঘরের ভিতর লইয়া উহাতে অঙ্কিত কোন রেখাকে ঐ গৃহের একটী প্রাচীরের সমান্তরাল ভাবে সংস্থাপিত করত সেই রেখার ঠিক্ উপর দিয়া দুলিতে পারে এমন করিয়া একটী দোলক রাখিয়া দাও। অর্থাৎ দুইটী কাষ্ঠিকার একাগ্র পরস্পর সম্বদ্ধ করিয়া সেই কাষ্ঠিকাদ্বয়কে উক্ত রেখার উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান করত তাহাদিগের সন্ধিস্থান হইতে দোলকটীকে ঐ রেখার ঠিক্ উপর দিয়া দোলায়মান করিয়া দেও।

অনন্তর দোলক দুলিতে আরম্ভ করিলে ইহাকে টানিয়া ক্রমে ক্রমে টেবিলের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া আন। তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, দোলক প্রথম রেখা হইতে যত দূর অপসৃত হউক না কেন, উহার দোলনের দিক্ কদাপি পরিবর্ত্তিত হয় না। অর্থাৎ প্রথমে যে রেখার উপর দিয়া ঘরের যে প্রাচীরের সমান্তরাল ভাবে দোলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, দোলক টেবিলের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে সরিয়া গেলেও সেই ভাবেই অবিরত দুলিতে থাকে। সুতরাং ঐ টেবিলের মধ্যস্থান হইতে যে সকল ব্যাসার্দ্ধ টানা আছে, সেই গুলির সহিত

দোলনদিকের ক্রমশঃ বৃহত্তর বৃহত্তর কোণ জন্মিয়া থাকে। ফলতঃ টেবিলের চতুর্থাংশ ঘুরিলে ঐ কোণ ৯০ অংশ প্রমিত হয়।

বাস্তবিক মেরু প্রদেশে গিয়া একটী সুবৃহৎ দোলক সংস্থাপিত করিয়া রাখিলেও ঠিক এই প্রকারই দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ ঐ দোলককে একটী মধ্যরেখার উপর দিয়া দোলায়মান করিলে ৬ ঘণ্টার পর ঐ রেখায় এবং দোলনের দিকে ৯০ অংশ পরিমিত কোণ জন্মে। তদপেক্ষা অল্প সময়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর কোণ হয়। কিন্তু টেবিলের উপর দোলককে ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া আনা হইয়াছিল বলিয়া উক্তরূপ কোণ জন্মিয়াছিল। এ স্থলে কেহ দোলককে চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া আনে নাই, তথাপি কি হেতু ঐ প্রকার ঘটিল?। অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এস্থলে দোলক মেরুর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীতে প্রোথিত দোলক কখন পৃথিবী না ঘুরিলে ঘুরিতে পারে নাই। অতএব নিশ্চিত হইল যে, পৃথিবী মেরুর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আসিয়াছে। যদি পৃথিবী মুকুরোদর তুল্য সমতল হইত তাহা হইলে মধ্য-রেখা হওয়াতে পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানেই এই ব্যাপার পরীক্ষা করিয়া লওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু পৃথিবী সমতল নহে। এই জন্য মেরু হইতে যত দূর উত্তর বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, ততই উক্ত কোণ ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, এবং ঠিক নিরক্ষ বৃত্তের উপর ঐ কোণ কিছুই হয় না; তথায় দোলককে যে মধ্য-রেখার উপর দোলায়িত করা যায়, উহা তাহারই উপর দিয়া সর্ব্বক্ষণ দুলিয়া থাকে, কিন্তু নিরক্ষবৃত্তের কিঞ্চিৎ উত্তর বা দক্ষিণে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উক্ত ব্যাপার স্পষ্টরূপে প্রতীত হইতে পারে।

যে স্থানে এই পরীক্ষা করিতে হইবে, তথায় একটী সুদীর্ঘ দোলক প্রস্তুত করিয়া ঐ স্থানের মধ্য-রেখা নিশ্চয় করত * তাহার উপর দিয়া

* কোন স্থানের মধ্যরেখা নিশ্চয় করাও অধিক কঠিন নয়, বিষুব দিনে অর্থাৎ আশ্বিন চৈত্র মাসের ১০ম দিবসে কোন অনাবৃত ভূভাগে একটী কাষ্ঠিকা প্রোথিত কর। বেলা

দোলপিণ্ডকে দোলায়মান করিতে হইবে, তাহা করিলে কোন নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে যত অংশ পরিমিত কোণ হইতে পারে তাহা নিশ্চয় করা আবশ্যক। সেই কোণের যে পরিমাণ অক্ষাংশেরও সেই পরিমাণ।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে মাধ্যাকর্ষণের তারতম্য প্রযুক্ত যেমন পৃথিবীর সর্ব্বস্থলে এক দোলকের সমান কালে আন্দোলন হয় না, তেমনি উৎক্ষিপ্ত বা নিক্ষিপ্ত পদার্থ সমস্তেরও সর্ব্বদেশে সমান বেগে ভূমিতে পতন হয় না। কোন নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে মেরু প্রদেশে নিক্ষিপ্ত দ্রব্য যত বেগে আসিয়া ভূমি স্পর্শ করে নিরক্ষ দেশে তত বেগে স্পর্শ করে না। দোলকের দৈর্ঘ্য এবং নিক্ষিপ্ত বস্তুর পতন স্থান এ উভয়ে একটী বিচিত্র সম্বন্ধ আছে, তাহার দ্বারা ঐ দুইয়ের মধ্যে কোন একটীর পরিমাণ জানা থাকিলে অনায়াসেই অপরটী প্রকাশিত করিতে পারা যায়।—যদি প্রথম সেকণ্ডে কোন নিক্ষিপ্ত বস্তু কোন দেশে কত ফুট পড়ে ইহা জানা যায় তবে সেই অঙ্ক সংখ্যাকে ৪১১২ দ্বারা ভাগ করিলেই উক্ত দেশের ঘটিকা যন্ত্রের দোলকের দৈর্ঘ্য যত ইঞ্চি হইবে তাহা স্থির হইয়া থাকে। আর যদি তথাকার এক সেকণ্ডে একবার-গামী দোলকের দৈর্ঘ্য কত ইঞ্চি ইহা জানা থাকে, তবে সেই ইঞ্চি সংখ্যাকে ৪১১২ দ্বারা গুণ করিলেই ঐ দেশে নিক্ষিপ্ত বস্তু প্রথম সেকণ্ডে কত ফুট পড়ে তাহাও নিশ্চয় অবধারিত হইয়া থাকে। দোলক সম্বন্ধে

দুই প্রহরের পূর্ব্বে কোন সময়ে কাষ্ঠিকার ছায়া কত দূর পড়ে দেখিয়া সেই ছায়া প্রমাণ ব্যাসার্দ্ধ এবং ঐ শঙ্কুর মূলকে কেন্দ্র করিয়া একটী বৃত্ত টানিয়া রাখ। পরে দুই প্রহরের পর আবার কোন্ সময়ে ঐ শঙ্কুর ছায়া, ঐ বৃত্তের পরিধিকে স্পর্শ করে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শঙ্কুর ছায়ার ঠিক সমান হয় তাহা বিশেষ করিয়া দেখ। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বৃত্তে দুই ছায়া ব্যাসার্দ্ধ হইয়া যে একটী বৃত্তাংশ হইল, সেই বৃত্তাংশের পরিধিকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত কর; পরে শঙ্কুর মূলদেশ হইতে ঐ ছেদ স্থানে সরল রেখা টানিবে তাহাই মধ্যরেখার প্রতিরূপ হইবে।

গণিত সম্পৃক্তে যাহা যাহা কথিত হইল কতিপয় প্রশ্নের উপপত্তি দ্বারা তাহা অধিকতর স্পষ্ট করা যাইতেছে।

১ প্রশ্ন। কলিকাতায়, লণ্ডনে এবং নিরক্ষবৃত্তে নিক্ষিপ্ত বস্তু প্রথম সেকণ্ডে কোথায় কত ফুট পড়ে? এস্থলে জানিতে হইবে যে, কলিকাতায় দোলক ৩৯.০৫৫ ইঞ্চি;

সুতরাং ৩৯.০৫৫ × .৪১১২=১৬.০৪৯ ফুট অর্থাৎ ১৬ ফুট এবং ½ ইঞ্চি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক।

লণ্ডনের দোলক ৩৯.১৩৯ ইঞ্চি, অতএব ৩৯.১৩৯ × .৪১১২=১৬.০৯৪ ফুট—অর্থাৎ ১৬ ফুট এবং ১ ইঞ্চি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক।

নিরক্ষের দোলক ৩৯.০২১ ইঞ্চি; তবে ৩৯.০২১ × .৪১১২=১৬.০৪৫ ফুট—অর্থাৎ ১৬ ফুট এবং ½ ইঞ্চি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প।

প্রশ্ন। নিরক্ষ-বৃত্তে ১½ সেকণ্ডে একবার মাত্র দুলিবে যে দোলক তাহার দৈর্ঘ্য কত হইবে?।

এক্ষণে দৈ : দৈ=কা২ঃ কা২ঃ এই সূত্র স্মরণ করিয়া অঙ্ক পাতন করিতে হইবে। যথা—

১২: (১½)২=৩৯.০২১: দৈঃ

∴ দৈ=৩৯.০২১ × (১.৫)২=৩৯.০০১ × ২.২৫=৮৭৮ ইঞ্চি প্রায়, অথবা ৮৭৭ ÷ ১২=৭.৩ ফুট।

সপ্তম অধ্যায়।

[ভার কিরূপে জানা যায়?—ভার-মধ্যস্থান নিরূপণ করিবার উপায় কি?—নিয়তাকার ধরাতলের ভার-মধ্য কিরূপ হয়?—নিয়তাকার ঘন দ্রব্যের ভারমধ্য কোথায় কোথায় হয়?—দ্রব্যের স্থায়ী-ভাব, অস্থায়ী-ভাব এবং ক্লীব-ভাব কেমন?—নানা উদাহরণ।]

কোন দ্রব্যের কত ভার ইহা বোধ হওয়া যে, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ রসনা প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা হইতে পারে না উহা বলা বাহুল্য।

উক্ত প্রত্যক্ষ সচরাচর ত্বগিন্দ্রিয়ের কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, কিন্তু ত্বক্ দ্বারা কে উষ্ণ, কে শীতল, কে বন্ধুর, কে মসৃণ, আর কোন্ দ্রব্য কঠিন বা কোন দ্রব্য কোমল ইহাই বুঝিতে পারা যায়। ফলতঃ কোন দ্রব্যের গায়ে হাত বুলাইয়া যাহা যাহা জানিতে পারা যায়, জড় পদার্থের, তাদৃশ গুণ সকলই ত্বগিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিতে হইবে। কিন্তু কোন্ পদার্থ গুরু কে বা লঘু তাহা কদাপি সেই সেই দ্রব্যের গাত্রে হাত বুলাইয়া বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং ইহাকে পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত প্রত্যক্ষ বলিতে হইবে *। দ্রব্যের গুরুত্ব অনুভব করিতে হইলে তাহাকে হস্ত দ্বারা বা অন্য কোনরূপে তুলিয়া বুঝিতে হয়। কিন্তু কোন দ্রব্যকে তুলিতে হইলেই আমাদিগের শরীরস্থ মাংসপেশীতে টান পড়ে। যে দ্রব্য তুলিতে যত টান্ পড়ে তাহাকে তত ভারী বোধ হয়।

আমাদিগের শরীরান্তর্গত যত প্রকার সূত্রবৎ পদার্থ আছে, সকলেরই সাধারণ নাম শিরা; সুতরাং শিরা অনেক প্রকার। তন্মধ্যে মাংসপেশী ও এক প্রকার শিরা। এই হেতু মাংসপেশী দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহাকে শৈরজ্ঞান বলা যাইতে পারে। অতএব ভার শৈর প্রত্যক্ষ দ্বারা অনুভূত হয়। অন্য কোন ইন্দ্রিয় ঐ জ্ঞানের উদ্বোধক হইতে পারে না।

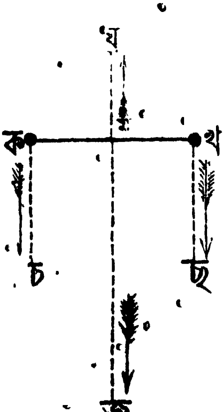
এক্ষণে কোন দ্রব্যকে তুলিতে হইলে যে, মাংপেশীতে কি জন্য টান্ পড়ে, তাহা বিবেচনা করা যাইতেছে;—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। সেই প্রবল আকর্ষণের প্রভাবে সকল জড় পদার্থই পৃথিবীর মধ্যাভিমুখ-গামী হইতে চাহে। সুতরাং যদি, আমরা উহাদিগের ঐ গতি নিবারণ করিতে বাঞ্ছা করি, তবে পৃথিবী যে বলে

---

* "ভাষাপরিচ্ছেদ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ভারকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; অতএব ভারজ্ঞান যে পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত একথা প্রাচীনদিগেরও অনুমত বটে।

উহাকে আকর্ষণ করিতেছে, সেই পরিমাণে প্রতিকূল বল বিনিয়োগ করা আবশ্যক হয়; সুতরাং তাহা প্রয়োগ করিতে গেলেই মাংসপেশীতে টান পড়ে। যেমন কোন রজ্জুর দুই দিক ধরিয়া দুই জনে টানিতে থাকিলে সেই রজ্জুতে টান পড়ে, এই স্থলেও অবিকল সেইরূপ আমাদিগের মাংসপেশীতে টান পড়িয়া থাকে, শরীরের মাংসপেশী সকল রজ্জু স্বরূপ। কোন দ্রব্য তুলিতে গেলেই তাহাদিগকে পৃথিবী এক দিকে টানে এবং আমরা তদ্বিপরীত দিকে টানিতে থাকি।

পৃথিবী যে বস্তুকে আকর্ষণ করে, সেই বস্তুর প্রতি পরমাণুকেই পৃথক্‌রূপে আকর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা যখন ঐ বস্তুকে তুলিয়া রাখি, তখন উহার প্রতি কেবল একটী মাত্র বল প্রয়োগ করিয়া থাকি। অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, পৃথিবীর সকল আকর্ষণ গুলি মিলিয়া একটী আকর্ষণের ন্যায় কার্য্য করে। নচেৎ একটী মাত্র প্রতিকূল বল কদাপি ঐ সকল আকর্ষণের সমান হইতে পারিত না।



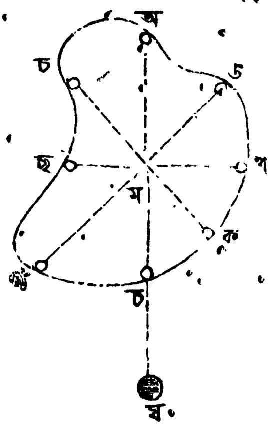
পার্শ্ববর্ত্তী চিত্রে দৃষ্টি করিয়া দেখ যেন, 'ক' ও 'খ' দুইটী পরমাণু মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে 'কচ' এবং 'খছ' অভিমুখে আকৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ 'ক' এবং 'খ' ইহারা পরস্পর এমত রূপে সম্বন্ধ হইয়া আছে যে, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। যদি ঐ 'ক' এবং 'খ' 'ম' স্থান হইতে ঊর্দ্ধভাগে আকৃষ্ট হয়, এবং তদ্দ্বারা উহাদের নিম্ন গতির প্রতিরোধ হয়, তবে অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, এক 'ম' স্থানের

'মঘ' নামক বল 'কচ' 'খছ' এই দুইটী বলের সমান। উপরিস্থ চিত্রে প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, ঐ 'মঘ' বল 'মঞ্জ' বলেরও সমান, সুতরাং 'কচ' এবং 'খছ' দুইটী বল 'মঞ্জ' বলের সমান হইল।

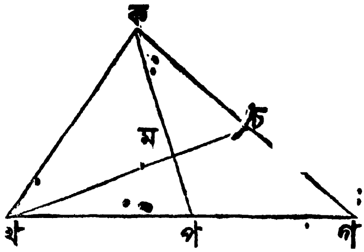
উক্তরূপ কারণ বশতঃই কোন সম-স্থূল লৌহ-শলাকার ঠিক্ মধ্য-স্থানে ধরিলে, উহা স্থির হইয়া থাকে, কোন দিকে নামিয়া পড়ে না। তাহার কারণ এই যে, ঐ শলাকার মধ্য-স্থানের দুই দিকে যত গুলি পরমাণু আছে তাহারা সকলেই স্ব স্ব নিম্নাভিমুখে আকৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে বলা যাইতে পারে যে, ঐ সকল গুলির আকর্ষণ মিলিয়া মধ্য স্থান হইতে একটি আকর্ষণের ন্যায় কার্য্য হইতেছে, অতএব সেই আকর্ষণের প্রতিকূল একটী বল প্রদান করিলেই সম-স্থূল লৌহ-শলাকা স্থির হইয়া থাকিবে।

দ্রব্যের গঠন যেমন হউক না কেন, সকলেরই এই প্রকার একটী স্থান আছে যে, পৃথিবী ঐ দ্রব্যের প্রত্যেক পরমাণুকে যে বলে আকর্ষণ করে, সেই সকল আকর্ষণ যেন ঐ এক স্থানেই কার্য্যকারী হয়। অতএব ঐ স্থান ধরিয়া রাখিলে দ্রব্যটা স্থির হইয়া থাকে, আর ঐ স্থান ধৃত না হইলে উহা কোন প্রকারেই স্থির হইতে পারে না। দ্রব্যের উক্তরূপ স্থানের নাম ভার-মধ্য। এক্ষণে এমত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যদি ভার-মধ্য স্থানেই, পৃথিবীর সকল আকর্ষণ কার্য্যকারী হয়, তবে দ্রব্য মাত্রের ভার-মধ্য অবশ্য সর্ব্বদাই পৃথিবীর মধ্যাভিমুখে হইয়া থাকিবে, আর কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে সর্ব্বাগ্রে সেই দিকেই যাইবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া, অনায়াসে সকল দ্রব্যের ভার-মধ্য স্থান নিরূপিত হইতে পারে। দ্রব্য যেরূপ হউক না কেন, তাহার এক স্থান ধরিয়া উহাকে ঝুলাইলেই বুঝা যাইবে যে, উহার ভার-মধ্য স্থান, হাতের নীচে, পৃথিবীর মধ্যাভিমুখ হইয়া আছে। অতএব যদি ঐ সঙ্গে একটী ওলন দড়িও ঝুলাইয়া ধরা যায়, তবে সেই ওলন দড়ির অনুক্রমে ঐ দ্রব্যের

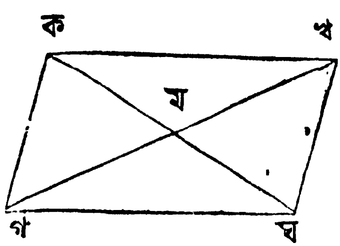
ভার-মধ্যেও ঝুলিয়াছে ইহা নিশ্চিত হয়। পরে পূর্ব্বোক্ত স্থান ভিন্ন ঐ দ্রব্যের আর কোন স্থান ধরিয়া আবার ওলন দড়ির সহিত ঝুলাইয়া দেখিলে ঐ দড়ি দুই বারই যে স্থানে দিয়া যায়, তাহাই উক্ত দ্রব্যের ভার-মধ্য নিশ্চিত হইয়া থাকে। নিম্নবর্ত্তী চিত্রে 'কগচপ' নামক কোন একটী দ্রব্য; উহাতে 'অ' 'ঙ' 'খ' প্রভৃতি স্থানে এক



একটী ছিদ্র করিয়া তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া একবার 'অ' হইতে আর একবার 'ঙ' হইতে ঐ দড়ি ধরিয়া ধরিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া গিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে যে 'অঘ' নামক ওলন দড়ি পড়িয়াছিল তাহার অনুসারে 'অমচ' এবং 'ঙমপ' দুই রেখা পাত করা গিয়াছে। 'ম' স্থানে ঐ দুই রেখার সম্পাত হইয়াছে। এইরূপে যত স্থান ধরিয়া যত প্রকারে ঝুলান যাইবে ওলন দড়ি 'ম' নামক চিহ্নের ভিতর দিয়াই যাইবে। অতএব 'ম'ই ঐ দ্রব্যের ভার-মধ্য। 'ম' এর নীচে একটী সূচী দিয়া ধরিলে ঐ দ্রব্য সূচীর উপরেও স্থির হইয়া থাকিবে কোন দিকে পড়িয়া যাইবে না। সকল প্রকার দ্রব্যেরই ভার-মধ্য এইরূপে জানা যাইতে পারে। কিন্তু যাহাদিগের গঠন ত্রিকোণ চতুষ্কোণ প্রভৃতি কোন নির্দ্দিষ্ট আকারে থাকে, সেই সকল নিয়তাকার দ্রব্যের ভার-মধ্য অন্য প্রকারেও জানা যায়। তাহার কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।



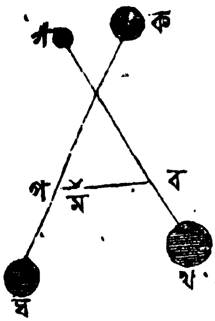
'কখগ' একটী ত্রিভুজ ধরা-তল, উহার 'খগ' এবং 'কগ' দুই ভুজকে 'প' এবং 'চ' স্থানে সমদ্বিভাগ করিয়া 'কপ' এবং 'খচ' দুই রেখা পাত কর। যে স্থানে ঐ দুই রেখার সম্পাত হইবে, সেই স্থানে ঐ ত্রিভুজের ভার-মধ্য যথা 'ম'। মাপিয়া দেখিলে 'ম' স্থানটী সমুদায় 'কপ' এর তিন ভাগ (অর্থাৎ 'মপ')= $\frac{১}{৩}$ 'কপ' হইবে।



'কখঘগ' একটী সমান্তরাল চতুর্ভুজ ক্ষেত্র। উহার 'কঘ' এবং 'গখ' নামক দুই কর্ণরেখা টান। যে স্থানে ঐ দুই কর্ণের সম্পাত হইবে তাহাই ঐ ক্ষেত্রের ভার-মধ্যস্থান যথা 'ম'। এই স্থলে মাপিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে 'কম' সমুদায় 'কঘ' এর অর্দ্ধেক (অথবা 'কম')= $\frac{১}{২}$ 'কঘ' এবং 'গম' = $\frac{১}{২}$ 'গখ'

যদি কোন অতি সূক্ষ্ম একটী শলাকার দুই দিকে দুইটী ভার বদ্ধ থাকে, এবং তাহার একটী যদি /২ সের এবং অপরটী /৪ সের আর ঐ শলাকাটী ৪ হাত লম্বা হয়, তবে ঐ শলাকার ভার-মধ্য কোথায় ইহা জানিতে হইলে শলাকাটী যত দীর্ঘ হইবে তাহাকে একটী ভার-পরিমাণ দ্বারা গুণ করিবে, এবং ঐ গুণ-ফলকে উভয় ভারের সমষ্টি দ্বারা হরণ করিবে, তাহা করিলেই প্রথমে যে দিকের ভার দ্বারা গুণ

করা যায় নাই সেই দিক্ হইতে ভার-মধ্য কত দূরে হইবে তাহা জানা যাইবে। এস্থলে $\frac{২\times৪}{২+৪}=\frac{৮}{৬}=১\frac{১}{৩}=১$ হাত ৮ অঙ্গুলি। /৪ সের ভার যে দিকে বদ্ধ আছে তাহা হইতে এত দূরে ভার-মধ্য-স্থান।

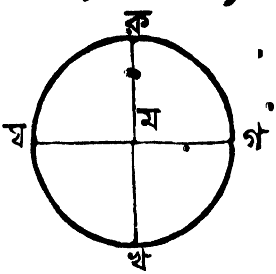


যদি চারিটী গোলা পার্শ্ববর্ত্তী চিত্রের ন্যায় একত্র বদ্ধ থাকে এবং তাহাদিগের ভার-মধ্য-স্থান নিরূপিত করিতে হয়, তবে প্রথমতঃ পূর্ব্ব নিয়মানুসারে 'কঘ'এর ভার-মধ্য নির্দ্ধারিত করিতে হয়। তাহা যেন 'প' স্থানে হইল। তাহার পর আবার ঐ নিয়মানুসারে 'গ'এর ভার-মধ্য বাহির করিতে হয়। তাহা যেন 'ব' স্থানে হইল। অনন্তর বিবেচনা করিতে হইবে যে, যেন 'প' স্থানে 'ক' এবং 'ঘ' উভয়ের ভার মিলিত হইয়া আছে, এবং ঐরূপ 'ব' স্থানে 'গ' এবং 'খ' দুই ভার একত্র হইয়া আছে। এক্ষণে 'পব' রেখা মাপিয়া আবার পূর্ব্ব সূত্রের অনুসারে ঐ 'পব' এর ভার-মধ্য বাহির করিতে হইবে। তাহা করিলেই সমুদায় চারিটী গোলার ভার-মধ্য পাওয়া যাইবে, যথা 'ম' *। ঐ 'ম' স্থানে দড়ি বান্ধিয়া ঝুলাইলে চারিটী গোলাই সমান হইয়া ঝুলিবে।

* যদি উপরিস্থ চিত্রে 'ক /২ সের 'ঘ' /৪ সের এবং 'কঘ' ('কয়ের কেন্দ্র হইতে 'ঘএর কেন্দ্র পর্য্যন্ত রেখা') ৬ হাত হয়; আর 'গ /১ সের 'খ /৫ সের এবং 'গখ' ('গ' এর কেন্দ্র হইতে 'খ' এর কেন্দ্র পর্য্যন্ত রেখা) ১২ হাত হয়, তবে উপরি উক্ত সূত্রানুসারে উহার এইরূপে উপপত্তি হইবে, যথা

'ঘপ' $=\frac{ঘক\times ক}{ঘ+ক}=\frac{৬\times২}{৪+২}=২$ হাত; 'খব' $=\frac{গখ\times গ}{খ+গ}=\frac{১২\times১}{৫+২}=\frac{১২}{৬}=২$ হাত এইরূপে 'প'

দ্রব্যের আকারানুসারে তাহার ভার-মধ্য কখন সেই দ্রব্যের কোন ভাগে না হইয়া তাহার বাহিরেও পড়ে। অঙ্গুরীয়ের গাত্রে তাহার ভার-মধ্য স্থান হয় না; উহার কেন্দ্রই ভার-মধ্য স্থান।



'কগখঘ' নামক অঙ্গুরীয়ের 'ক' ও 'খ' স্থান একটী সূত্র দ্বারা এবং 'গ' ও 'ঘ' স্থান অপর একটী সূত্র দ্বারা বন্ধন কর। ঐ দুইটী সূত্রের সম্পাত স্থান 'ম' বিন্দুতেই উহার ভার-মধ্য হইবে। সেই 'ম'কে অঙ্গুলির উপর ধারণ করিলে অঙ্গুরীয় স্থির থাকে।

একটী লৌহের তার যখন সরল থাকে, তখন উহাকে মাপিয়া যে স্থান ঠিক্ মধ্যবর্ত্তী হয় তাহাতে ভার-মধ্য থাকে, কিন্তু ঐ তারকে বাঁকাইয়া যদি অঙ্গুরীয়, অর্দ্ধাঙ্গুরীয়, বা ধনুর আকার করা যায়, তবে ভার-মধ্য তারের বাহির হইয়া পড়ে।

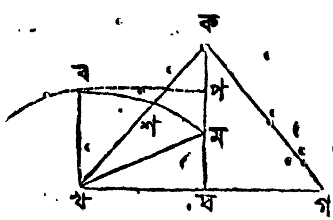
ফাঁপা দ্রব্য মাত্রেই প্রায় এইরূপ ঘটিয়া থাকে। বাক্সের ভার-মধ্য উহার ভিতরের স্থানেই হইয়া থাকে। ফাঁপা কন্দুকেরও ঐরূপ হয়। নিয়তাকার ঘন দ্রব্যের ভিতর এমত একটী সরল রেখা অনুভব করা যাইতে পারে যে, সেই রেখার প্রত্যেক বিন্দুরই চতুষ্পার্শ্বে

এবং 'ব দুইটী স্থান নিরূপিত হইলে 'পব রেখাটী কত মাপিয়া নিশ্চিত করিতে হইবে; যদি উহাও ২ হাত হয়, তবে 'পম' $= \dfrac{\text{পব} \times (\text{গ} + \text{খ})}{(\text{গ} + \text{খ}) + (\text{ক} + \text{ঘ})} = \dfrac{২ \times (৫ + ১)}{(৫ + ১) + (৪ + ২)} = \dfrac{২ \times ৬}{৬ + ৬} = \dfrac{১২}{১২} = ১$।
অর্থাৎ এইরূপ হইলে ভার-মধ্য-স্থান 'প হইতে ঠিক ১ হাত অন্তরে হইবে। এস্থলে ইহাও বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, 'কঘ' এবং 'গখ' ইহাদিগের প্রত্যেকের ভার-মধ্য 'প' এবং 'ব' বিন্দুতেই থাকিবে, কিন্তু যদি উহাদিগকে পরস্পর নিকট বা দূরিতর করিয়া বন্ধন করা যায়, তবে 'পব' রেখা উভয় সময়েই সমান না থাকাতে 'ম' স্থান স্থির থাকিতে পারিবে না। ফলতঃ বন্ধন কোণের নিয়মানুসারে 'প' এর পরিমাণ নিরূপিত করিয়া লওয়া যায়। গজের সাহায্য লইলেই তাহা অনায়াসে সিদ্ধ হয়।

পরমাণু সকল সমভাবে বিনিবেশিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাদৃশ ঘন পদার্থের ভার-মধ্য অবশ্যই সেই রেখার কোন এক স্থানে থাকে। সেই স্থান কোথায় তাহাও কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া বুঝিলেই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

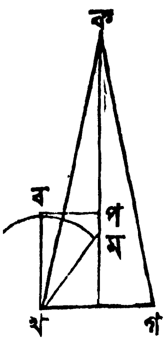
গোলাকার দ্রব্যের ভার-মধ্য কেন্দ্রে; বৃত্ত-সূচীর ভার-মধ্য তাহার উচ্চতাকে চারি ভাগ করিয়া তল হইতে প্রথম ভাগের উপরেই হয়, ত্রিকোণ সূচীরও ঐরূপ। স্তম্ভের অভ্যন্তরে ঠিক মধ্যস্থল দিয়া উপরি পর্য্যন্ত যে রেখা টানা যায় সেই রেখার মধ্য স্থলেই উহার ভার-মধ্য; ঘন-চতুষ্কোণের দুই বিপরীত দিকের দুই মুখের উপর দুই কর্ণপাত করিয়া তাহাদিগের যে যে স্থলে সম্পাত হয় তাহা একটী সূক্ষ্ম শালাকা দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দেও, সেই শলাকার ঠিক মধ্য স্থানে উহার ভার-মধ্য হইবে। এইরূপে শলাকা বিদ্ধ করিয়া নিয়তাকার সকল পদার্থেরই ভার-মধ্য নিরূপিত হইতে পারে।

কোন দ্রব্যের ভার-মধ্য কেমন স্থানে আছে ইহা জানিতে পারিলেই ঐ দ্রব্য ঐস্থানে দৃঢ়তর রূপে অবস্থিত আছে কি না, তাহাও নিশ্চয় করিতে পারা যায়। ভার-মধ্যের প্রকৃতি এই যে, উহা নিম্নে আসিতে চাহে। সুতরাং উহার সহিত নিম্ন ভাগের যতদূর সংযোগ হইয়া থাকিবার সম্ভাবনা যদি কোন দ্রব্যে তাহাই থাকে, তবে দ্রব্যের ঐ অবস্থাকে স্থায়ী-ভাব বলা যায়। কিন্তু যদি তাহা না থাকে, তবে উহার অস্থায়ী-ভাব বলা গিয়া থাকে। ইহার কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। 'কখগ' একটী ত্রিকোণ সূচীদ্রব্য। উহার ভার-

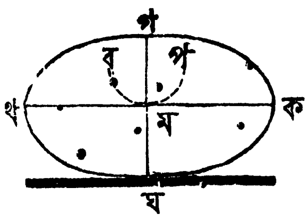


মধ্য স্থান 'ম'। ঐ 'ম' যত নীচে থাকিতে পারে তাহাই আছে। যদি ঐ ত্রিকোণ সূচীকে অন্য কোন প্রকারে অবস্থিত করিতে হয়, তবে

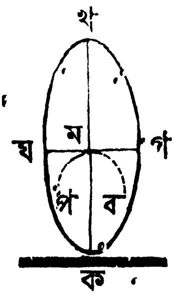
এমত করিয়া ঠেলিয়া দেওয়া আবশ্যক, যাহাতে 'খ' স্থানটী 'মশব' রেখা ক্রমে যায়। কিন্তু তাহা করিতে গেলে 'ম' কে উর্দ্ধ করিয়া তুলিতে হয়। পরন্তু নিম্নাভিমুখে গমন করাই 'ম' এর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতাং এই ত্রিকোণ-সূচী যেরূপে অবস্থিত আছে তাহার অন্যথা-ভাব হওয়া উহার প্রকৃতি সিদ্ধ নহে, অতএব ইহাই ঐ দ্রব্যের স্থায়ী-ভাব। বস্তুতঃ এইরূপ ত্রিকোণ-সূচীকে উল্টাইয়া ফেলিতে অধিক বলের আবশ্যকতা রাখে।



এই ত্রিকোণ-সূচীরও স্থায়ীভাব আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাপেক্ষা অল্পতর। কারণ ইহাকেও উল্টাইয়া ফেলিতে হইলে 'ম' স্থানকে কিঞ্চিৎ উন্নত করিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্ব প্রতিকৃতিতে উহাকে যত উন্নত করিতে হয়, এই স্থলে তত হয় না। যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্ব প্রতিকৃতিতে 'খম' রেখা যত বড় এই স্থলে উহা তত দীর্ঘ নহে।

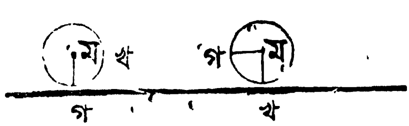


এই একটী ডিম্বাকার দ্রব্য, (পার্শ্বস্থ চিত্রে) 'ম' উহার ভার-মধ্য। 'ক' স্থানে চাপ দিয়া যদি 'ম' কে 'প' পর্য্যন্ত উত্থিত করা যায়, তবে ঐ চাপ ছাড়িয়া দিলে 'ম' স্বভাবতঃই নিম্নে যাইয়া দ্রব্যটীকে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত করে। অতএব এই দ্রব্যের ভার-মধ্য 'প' পর্য্যন্ত উঠিলে কোনপ্রকারেই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, আর তাহাতে দ্রব্যটীর অবস্থান্তরও ঘটে না, এই জন্য ইহাকে উহার স্থায়ীভাব বলা যায়। কিন্তু যদি ডিম্বাকার দ্রব্যকে



(পার্শ্বস্থ চিত্রবৎ) উহার দীর্ঘ ব্যাসের উপর স্থাপিত করা যায়, তবে 'ম' স্থান হইতে কিঞ্চিন্মাত্র সরিলেই ভার-মধ্য 'প' বা 'ব' এর দিকে নীচ হইয়া আইসে। সুতরাং 'ম' স্বয়ং কদাপি উত্থিত হইতে না পারাতে দ্রব্যটা স্থির না থাকিয়া অবশ্যই পড়িয়া যায়, অর্থাৎ পূর্ব্বে উহার যে প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে সেই রূপে অবস্থিত হইয়া থাকে। অতএব ইহা ঐ দ্রব্যের অস্থায়ী-ভাব।

কতকগুলি দ্রব্য এমত আছে যে, তাহাদিগের স্থায়িত্বাস্থায়িত্বের কিছুই বিশেষ হয় না। যেরূপে রাখ সেই রূপেই সমান থাকে। অল্প বল প্রয়োগ করিলেই পূর্ব্বাবস্থাচ্যুত হয়, কিন্তু এমত কোন নূতন অবস্থাও প্রাপ্ত হয় না যে, তাহা পরিত্যাগ করিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলের প্রয়োজন করে। গোল বস্তুর অবস্থা ইহারই সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থল।



'খগ' একটী ভাঁটা। উহাকে কিঞ্চিন্মাত্র ঠেলিয়া দিলেই উহা গড়াইয়া যায়। কিন্তু আবার যেখানে যাইয়া উপস্থিত হয়, সেখানেও ঠিক পূর্ব্বভাবে থাকে। ইহার নাম ক্লীব-ভাব। দ্রব্য সমস্তের স্থায়ী এবং অস্থায়ী ভাবের উদাহরণ অনেক আছে, তন্মধ্যে কতিপয়ের এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

যখন কোন ব্যক্তি এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকে, তখন তাহার শরীরের আধার ভূমি কেবল এক পাদ পরিমিত স্থান হয়। সুতরাং আধার অল্প হইলে অতি অল্পেই দ্রব্যের আস্থায়ী-ভাব জন্মে। দুই

পা সংযত করিয়া দাঁড়াইলে আধার-ভূমি অপেক্ষাকৃত অধিক হয়, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা উহার স্থায়ী-ভাব হয় বটে, কিন্তু উহাও স্থিরতর নহে। কিন্তু মল্লেরা যখন তাল ঠোকাঠুকি করে, তখন দুই পা প্রসারিত করিয়া দাঁড়ায়। তাহাতে শরীরের আধার-ভাগ বিস্তৃত হওয়াতে অন্য বলবান ব্যক্তি বেগে আসিয়া আঘাত করিলেও শীঘ্র পতন হয় না।

যখন আমরা গমন করি, তখন সম্মুখের দিকে কিঞ্চিৎ ঝুঁকিয়া যাই। তাহা করাতে আমাদিগের শরীরের ভার-মধ্যে স্থান সম্মুখের দিকে সরিয়া আইসে, সুতরাং অল্প বলেই ঐ দিকে চলিয়া যাওয়া যায়। বাস্তবিক প্রতি পাদ বিক্ষেপে আমরা এক একবার পতনোন্মুখ হই। যত বেগে চলা যায়, ততই সম্মুখের দিকে অধিক ঝুঁকিয়া যাইতে হয়।

যখন পৃষ্ঠে কোন ভার বন্ধন করা থাকে, তখন মনুষ্যেরা সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া চলে। স্ত্রীলোকেরা যখন জলপূর্ণ কলসী লইয়া যায়, তখন যে কক্ষে কলসী থাকে তাহার বিপরীত দিকে ঝুঁকিয়া চলে।

যখন নিম্ন ভূমি হইতে উচ্চ স্থানে আরোহণ করা যায় তখন সম্মুখের দিকে ঝুঁকিতে হয়, যখন উচ্চস্থান হইতে নিম্নে আসিতে হয়, তখন পশ্চাদ্দিকে কিঞ্চিৎ হেলিয়া থাকা আবশ্যক।

এই বিষয়োপলক্ষে একটী কৌতুকাবহ পরীক্ষা আছে, যখন আমরা অগ্রবর্ত্তী হই, তখন আমাদিগের শরীরের ভার-মধ্য-স্থানকে অগ্রবর্ত্তী করিতে হয়, কিন্তু যখন আমরা শরীরকে নত করি, তখন ঐ ভার-মধ্য স্থানকে কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ভাগে অপসৃত করা আবশ্যক। সুতরাং শরীরকে অবনত করিতে হইলে পশ্চাৎ দিকে কিঞ্চিৎ স্থান না থাকিলে কোন প্রকারেই পারা যায় না। অতএব যদি কোন ব্যক্তিকে প্রাচী-রের গায়ে পিঠের ঠেস দিয়া দুই পা সংযত করিয়া এবং পায়েরও দুই গোড়ালিকে ঐ প্রাচীর এবং মেজ্যায় সমান করিয়া ঠেকাইয়া

দাঁড়াইতে বলা যায়, আর তাহার সম্মুখে টাকা রাখিয়া বলা যায় তুমি পা না সরাইয়া যদি ঐ টাকা কুড়াইয়া লইতে পার, তাহা হইলে টাকা তোমার হইবে, এমত বলিলে টাকা যাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। কারণ ঐ ব্যক্তি যদি পা এবং পিঠ নিয়মিতরূপে রাখিয়া থাকে, তবে কোন ক্রমেই টাকা লইবার নিমিত্ত শরীর অবনত করিতে পারিবে না।

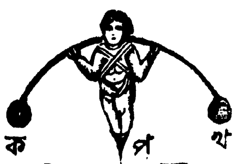
চতুষ্পদ জন্তুদিগের চারিটী পদকে কোন চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের কোণ স্থানরূপে বিবেচনা করিয়া উহার মধ্যে যদি দুইটী কর্ণ-রেখা টানা যায়, অর্থাৎ সম্মুখের দক্ষিণ পদে এবং পশ্চাতের বাম পদে ও সম্মুখের বাম পদে এবং পশ্চাতের দক্ষিণ পদে সংযোগ করিয়া দুইটী রেখা টানা যায়, তবে ঐ কর্ণের সম্পাত-স্থলের প্রায় ঠিক ঊর্দ্ধভাগেই উহার শরীরের ভার-মধ্য নিরূপিত হইয়া থাকে। অতএব যখন ঐ জন্তু চলে তখন একবার সম্মুখের দক্ষিণ পদ এবং পশ্চাতের বাম পদ উত্তোলন করিয়া উক্ত দুই কর্ণ-রেখায় একটীর উপরে ভার-মধ্য সরাইয়া আনে, আবার যখন সম্মুখের বাম পদ এবং পশ্চাতের দক্ষিণ পদ লইয়া আইসে তখন উক্ত দ্বিতীয় কর্ণ-রেখার উপর শীরের ভার-মধ্য স্থানকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দিয়া ঐ জন্তুর গমন-ক্রিয়া সহজেই সম্পন্ন হয়।

যখন বেদেরা বাঁশবাজি করে, অথবা দড়ির উপর দিয়া চলিয়া যায় তখন উহারা আপনাদিগের শরীরের ভার-মধ্যকে ঠিক দড়ির উপরে রাখিবার অভিপ্রায়ে একটী দীর্ঘ যষ্টি হাতে ধরিয়া থাকে। ঐ যষ্টির দুই পার্শ্বে দুইটী ভারী দ্রব্য বাঁধা থাকিলে রজ্জুর উপর দিয়া চলা আরও সহজ হয়। কারণ ভারী দ্রব্য দুই পার্শ্বে থাকাতে তাহাদিগের ভার-মধ্য-স্থান দড়ির উপরেই পড়ে। ঐ যষ্টি হাতে না করিয়া বেদেরা কদাপি বাজি করিতে পারে না।

কোন কোন গ্রন্থকার কহেন যে, পূর্ব্বকালের গ্রীক এবং রোমীয় বাজিকরেরা হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া সেই হাতিকে দুই দিকে

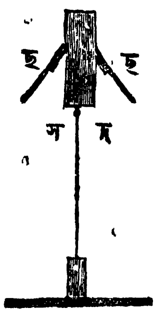
দুই কীলকে বদ্ধ শূন্যোপরিস্থ কাছির উপর দিয়া চালাইত। হস্তী স্বয়ং অতিশয় ভারী জন্তু; উহার ভার-মধ্য-স্থান একবার দড়ির উপর হইতে কোন দিকে সরিলে তাহার বিপরীত দিকে সামান্য ভারী কোন দ্রব্যকে বাড়াইয়া দিলেই ভার-মধ্য সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না; অতএব যাহারা ঐরূপ বাজী করিত তাহাদিগের এবং তাহাদের হস্তী সমস্তের অলৌকিক সুশিক্ষা হইয়াছিল বলিতে হইবে। কিন্তু যাহা হউক যাঁহারা ঐ অদ্ভুতব্যাপার দর্শন করিতেন তাঁহারাও যে উহাকে ভোজ বিদ্যা, অথবা 'মন্ত্রবল' বোধ করিতেন না ইহাই আশ্চর্য্য!

এক প্রকার খেলেনা আছে, তাহাতে এই ব্যাপার অতি স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। উহার নির্ম্মাণকারীরা টিনের পাত লইয়া তদ্দারা একটী ক্ষুদ্র পুত্তলিকা প্রস্তুত করে, সেই পুত্তলিকার দুই হস্তের উপর দিয়া একখানি সরু টিনের পাত থাকে, ঐ পুত্তলিকার পায়ের দিক অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তথাপি পুত্তলিকাকে যেমন করিয়া ফেলা যায়, উহা সেই সূক্ষ্ম পায়ের দিকেই খাড়া হইয়া দাঁড়ায়।



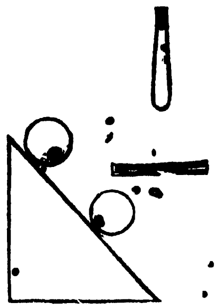
তাহার কারণ এই যে 'ক' 'খ' দুইটী কন্দুক দুই পার্শ্বে থাকাতে ঐ সমুদায় ক্রীড়নকের ভার-মধ্য হইতে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে যে রেখা যায় তাহা 'প' নামক সূক্ষ্ম স্থানের ভিতর দিয়াই গমন করে। সুতরাং উক্ত দ্রব্য ঐ স্থানের উপর বই আর কোন প্রকারে স্থায়ী-ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে না। বাজিকরদিগের বাঁশও ঠিক এইরূপ কার্য্য করে। পূর্ব্বোক্ত রূপে ক্রীড়নক প্রস্তুত করিলে তাহাকে একটী সূচীর অগ্রভাগে রাখিয়া সচ্ছন্দে ঘূর্ণিত করিতে পারা যায়, তাহাতে উহার পতন হয় না।

এইরূপ ক্রীড়নকের বিষয় প্রকারান্তরেও দেখাইতে পারা যায়। এক খণ্ড লম্বা সোলা বা কর্ক্ লইয়া উহার দুই দিকে দুই খানি ছুরিকা তির্য্যকভাবে বিদ্ধকর, আর ঐ কাকের নীচে ঠিক মধ্য স্থলে একটী সিক বা দুয়ানির অর্দ্ধেক বিঁধিয়া দেও। সেই দুয়ানির প্রান্তে এমন একটী স্থান আছে, যথায় সূচীর মুখ দিয়া ধরিলেও সেই সূচীর মুখে উপরিস্থ সমুদায় দ্রব্যটা স্থির হইয়া থাকিবে। যদি ফুৎকার দিয়া, অথবা সাবধান পূর্ব্বক হাত দিয়া উহাকে ঘুরাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও ঐ সূচীর মুখের উপরেই ঘুরিতে থাকিবে, পড়িয়া যাইবে না। আর একটী সূচীকে ঠিক্ লম্বাভাবে বিদ্ধ করিয়া তাহার মুখের



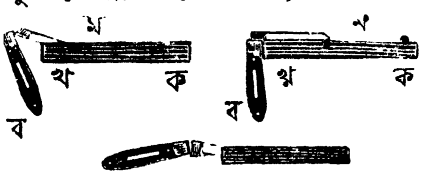
উপর প্রথম সূচীকে রাখিয়াও ঐরূপে ঘূর্ণিত করা যায়। আর এক প্রকার ক্রীড়নক আছে, তাহাও এই ভার-মধ্যের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সরু পাঁকাটী, খাকড়া, পালক অথবা তাদৃশ অন্য কোন পদার্থের ভিতরের এক দিকে কিঞ্চিৎ সীসক বা অন্য কোন ভারী দ্রব্য বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, তাহা করিলেই উহার

ভার-মধ্য-স্থান এক প্রান্তে আইসে, সুতরাং যদি তাদৃশ পাঁকাটী বা খাকড়াকে শুয়াইয়া রাখা যায় তাহা হইলে সে কদাপি তেমন ভাবে থাকে না, বোধ হয় যেন আপনা হইতেই উঠিয়া বইসে। ফলতঃ 'ভার-মধ্যস্থান সর্ব্বদা নিম্ন গামী হয়' এই জন্যই তাদৃশ ব্যাপার ঘটে। একটী কাঠের গোলার এক দিকে ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতর সীসক পূরিয়া দিলে সেই দিক অত্যন্ত ভারী হয়, এবং ভার-মধ্য-স্থানও সেই



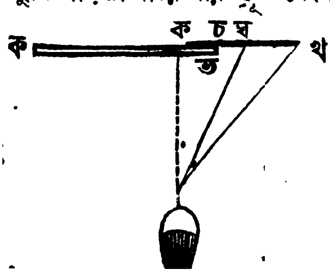
দিকের নিকট হইয়া আইসে। অতএব তাদৃশ কন্দুকের ঐ ভারী দিকটী ঠিক ঊর্দ্ধ-মুখ করিয়া যদি কোন প্রবণ ভূভাগের উপর রাখিয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ গোলা গড়াইয়া ঐ স্থানের উপরের দিকে উঠে। বস্তুতঃ উহার ভার-মধ্য স্থান নামিয়া আইসে, তাহাতেই গোলার ঊর্দ্ধ দিকে তাদৃশ গতি হয়।

ভার-মধ্য-স্থানটী ধৃত হইলেই দ্রব্যের পতন হয় না ইহা আর এক প্রকারে প্রদর্শিত হইতে পারে। অনেকেই দেখিয়াছেন যে একখানি ছুরির মুখ অর্দ্ধেক মুড়িয়া যদি তক্তাপোশের বা ডেক্‌সের ধারে ধারাল মুখটীকে রাখিয়া দেওয়া যায়, তবে রাখিয়া দিবামাত্র বোধ হয় যেন ঐ ছুরির বাঁটের দিক আপনা হইতেই কিঞ্চিৎ ভিতর দিকে আইসে, তাহার কারণ এই যে



ঐ ছুরির ভার-মধ্য-স্থান যত নিম্নে যাইতে পারে তাহা যতক্ষণ না যায়, ততক্ষণ উহা স্থায়ী-ভাব প্রাপ্ত হয় না।

যদি ছুরির ফলে এবং বাঁটে সমকোণ হয় এমন করিয়া মোড়া যায়, তবে সমুদায় ফল সহ তক্তার উপরিভাগ ঠেকিয়া না থাকিলে ছুরি পড়িয়া যায়। যদি স্থূল-কোণ করিয়া মোড়া যায়, তবে ছুরি কোন প্রকারেই ঐরূপে ঝুলিয়া থাকে না, উহাকে কাষ্ঠে বিঁধিয়া রাখিলে তবে থাকে। কিন্তু যদি ফলে এবং বাঁটে সূক্ষ্ম কোণ কর, তবে কোণ যত সূক্ষ্ম করিবে ততই ফলের অল্প ভাগ তক্তার উপর ঠেকিয়া থাকিলেই ছুরি



স্থির থাকিবে কোন প্রকারে পড়িবে না। এই পরীক্ষাটী করিয়া দেখিলেই আর একটী বিষয়ের পরীক্ষা করিতে পারা যায়। দুইখানি বাখারি লইয়া পূর্ব্বপৃষ্ঠার চিত্রানুরূপ পরস্পর যুড়িয়া বান্ধ, অর্থাৎ 'ক এক খানি বাখারি এবং 'খ' হইতে যে রেখা নীচের দিকে আসিয়াছে তাহাই যেন দ্বিতীয় খানি; আর 'ঘ হইতে যে রেখা নীচে আসিয়াছে, তাহা যেন এক গাছি সুত ; এইরূপ বান্ধিয়া দ্বিতীয় বাখারি এবং সূত্রের সংযোগ স্থলে সিকা বান্ধিয়া কোন ভারী দ্রব্য ঝুলাইয়া দেও; এইরূপ করিয়া যদি 'কখ' বাখারির 'কচ' ভাগ মাত্র 'বভ নামক তক্তার উপর ঠেকাইয়া দেওয়া যায় তথাপি সেই অত্যল্প মাত্র অবলম্বনেও উক্ত ভারী দ্রব্য সমেত সমুদায় বাখারিটী চিত্রের অনুরূপ হইয়া ঝুলিতে থাকিবে। তাহার কারণ এই যে, উহাদিগের ভার-মধ্য-স্থান হইতে যে লম্ব রেখা নিম্নে পাতিত হয়, তাহা 'কচ' স্থানকে ভেদ করিয়া যায়, কদাচিৎ তাহার বাহিরে পড়ে না। সুতরাং ইহাই উহাদিগের স্থায়ী-ভাব।

অনেকেরই জানা আছে যে, জাহাজের বোঝাই খালি হইয়া গেলে জাহাজ টাইট হইয়া পড়ে, এই জন্য কখন খালি জাহাজ চালায় না। অন্য ভারী বোঝাই না থাকিলে জাহাজের নীচে বালি, পাথর প্রভৃতি ভারী দ্রব্য দিয়া নীচ ভাগ অধিক ভারী করিয়া লয়। তাহা করিলেই ঐ জাহাজের ভার-মধ্য-স্থান নীচে আইসে। সুতরাং উহার স্থায়ী-ভাব জন্মে। এই জন্যই নৌকায় তুফান লাগিলে সেই সময় নৌকার উপর দাঁড়াইয়া উঠা অতি অবিবেচনার কর্ম্ম। দাঁড়াইয়া উঠিলে নৌকার ভার-মধ্য-স্থান উন্নত হইয়া উঠে। সুতরাং নৌকা উল্টাইয়া পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হয়। এইরূপ গাড়ির ছাদের উপরে অধিক বোঝাই তোলা অকর্ত্তব্য, তাহা তুলিলে উক্ত কারণ বশতই মধ্যে মধ্যে বোঝাই গাড়ি উল্টাইয়া পড়ে।

এই বিষয়োপলক্ষে আর একটী কথা বক্তব্য এই যে, কোন দ্রব্য

যদি বেগে ঘুরিতে থাকে এবং তাহার ভার-মধ্য-স্থান একবার তলার বাহিরে এবং পর-ক্ষণেই তলার ভিতরে বা অপর দিকে বাহিরেও যায়, তথাপি জড় পদার্থ মাত্রের নিশ্চেষ্টত্ব গুণ থাকাতে ঐ দ্রব্য যত ক্ষণ বেগে ঘুরে ততক্ষণ পড়িয়া যায় না। লাঠিম উহার আলের উপর যেমন ঠিক খাড়া হইয়া ঘুরে, না ঘুরিলে কখনই ঠিক তেমন খাড়া হইয়া থাকে না; ইহাতেই বোধ হয় লাঠিমের ভার-মধ্য ঠিক আলের মুখের ভিতর দিয়া পড়ে না। কিন্তু তাহা না পড়িলেও উহা অত্যন্ত বেগে ঘুরিতে থাকিলে উহার ভার-মধ্যও আলের চতুর্দ্দিকে ঘুরে, সুতরাং কোন এক স্থানে স্থির হইতে না পাওয়ায় নিশ্চেষ্টতাগুণে লাঠিমটী স্থির রহিয়া যায়। অর্থাৎ এই এক দিকে পড়িবে পড়িবে হইতে হইতেই ভার-মধ্যকে অন্য দিকে যাইতে হয়—সে দিকেও পড়িতে পড়িতে উহা আর এক দিকে যাইয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং যতক্ষণ অধিক বেগ থাকে, ততক্ষণ লাঠিমের পতন হয় না।

প্রশ্নমালা।

[প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে যে সকল গণিত-সম্পৃক্ত সূত্র শিক্ষা করিতে হয় নিম্নবর্ত্তী অথবা তাদৃশ প্রশ্নের উপপত্তির চেষ্টা করিলে সেই সকল সূত্রের উত্তমরূপ আলোচনা হইবে।]

১। ৩ এবং ২ প্রমিত বল দ্বয় পরস্পর ৪৫ অংশ কোণ করিয়া কার্য্যকারী হইলে ফল কিরূপ হইবে নিশ্চয় কর। উত্তর। ৪.৬৩।

২। ক ১২সের এবং খ ৭ সের ভারী এবং তাহারা উভয়েই এক দিকে ৮ ফুট ও ৫ ফুট বেগে গমন করে উহাদিগের মিলিত-বেগ কত হইবে, এবং 'ক'এর বেগ কি পরিমাণে হ্রস্ব এবং 'খ'এর কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে? উত্তর। ৬ ১৭/১৯, ১ ২/১৯, ১ ১৭/১৯,

৩। 'ক' ১১ ফুট বেগে গিয়া ৫ ফুট বেগে আগত 'খ' কে আঘাত করাতে 'ক এর বেগবল তৃতীয়াংশ ন্যূন হইলে ; 'ক' এবং 'খ' এর পরিমাণের সম্বন্ধ কিরূপ? উত্তর। ৩৭ : ১১

৪। সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক 'ক' এবং 'খ' নামক কন্দুক দ্বয়ের ভারের সম্বন্ধ যথা ৪ : ৩ এবং তাহাদিগের বেগের সম্বন্ধ যথা ৫ : ৪, অভিঘাতের পর উহাদিগের বেগের সম্বন্ধ কিরূপ হইবে?

উত্তর। ২৯ : ৩৬

৫। পাঁচটী অস্থিতিস্থাপক কন্দুকের ভার পরিমাণ ক্রমশঃ ১,৩,৫,৭,৯ ; প্রথমটী ৪ ফুট বেগে গিয়া দ্বিতীয়টীকে আঘাত করিলে শেষেরটীর বেগ কত হইবে?

উত্তর। $\frac{৩৫}{৫১২}$ ফুট

৬। ১১ সেকেণ্ড ধরিয়া কোন বস্তু পড়িলে তাহার পতন দূরত্ব এবং অন্তিম-বেগ কত হয়? উত্তর। ১৯৪৮ ; ৩৫৪ ;

৭। কতদূর হইতে এবং কতক্ষণ ধরিয়া পতন হইলে অন্তিম বেগ ৫০০ ফুট হইতে পারে? উত্তর। ৩৮৮৩ ফুট, ১৫$\frac{৯}{২}$;

৮। ১৫ সেকণ্ড ধরিয়া যে বস্তুর পতন হয় তাহার সপ্তম সেকণ্ডের এবং শেষ সেকণ্ডের পতন দূরত্বের সম্বন্ধ কিরূপ?

উত্তর। ১৩ : ২৯ ;

৯। ৪৪০ গজ উচ্চ হইতে পড়িলে শেষ সেকণ্ডে কত দূর পতন হয়? উত্তর। ২৪৫

১০। কোন পতনশীল দ্রব্যের ৫ম সেকণ্ডের পতন-দূরত্ব তাহার চতুর্থ-শেষ-সেকণ্ডের পতন দূরত্বের ছয় গুণ ; সে সর্ব্বশুদ্ধ কতদূর পড়িয়াছে? উত্তর। ১৫৯৭০ ফুট

১১। পতন কালের শেষ সেকণ্ডে যদি সমুদায় পতন-দূরত্বের তৃতীয়াংশ গমন হয় তবে সমুদায় পতন-দূরত্ব ও পতন-কাল কত হইবে? উত্তর। দূ=৪৭৭.৯ ; কা=৫.৪৪৯ ;

১২। ৪০০ ফুট উচ্চ কোন স্থান হইতে একটী দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইল, ঐ দ্রব্য ৫০ ফুট নামিয়া আসিলে আর একটী নিক্ষিপ্ত হইল, উভয়ে একই সময়ে আসিয়া ভূমি স্পর্শ করিল, দ্বিতীয় দ্রব্যে নিক্ষেপ-বেগ কত প্রদত্ত হইয়াছিল? উত্তর। ৭২.২৫

১৩। ৪৫ অংশ কোণে কোন দ্রব্য বিক্ষিপ্ত হইয়া ৫০০ ফুট অন্তরে পতিত হইল, উহার বিক্ষেপ জনিত বেগ পরিমাণ, গরিষ্ঠ উচ্চতা এবং গমন কাল কত?

উত্তর। বে=১২৬; উ=১২৫ ফুট, কা=৫.৫৭১৩৬;

১৪। কোন সম-দ্বিবাহু ত্রিভুজের বাহু পরিমাণ ২০, ২০, ১২, উহার শীর্ষ কোণ হইতে ভার-মধ্যের দূরত্ব কত। উত্তর। ১১.৭৪,

১৫। ক, খ, গ, তিনটী দ্রব্যের ভার পরিমাণ ক্রমশঃ ৩, ২, ১, এবং 'কখ'=৫, 'খগ=৪ 'গক'=২; গ হইতে ভার-মধ্যের দূরত্ব নিরূপণ কর। উত্তর। ১.৩৯৪৪,

১৬। কোন সম-চতুর্ভুজের পরিমাণ ২০ ইঞ্চি, উহার চারিটী কোণে ১, ৩, ৫, ৭ পরিমিত ভারবিশিষ্ট চারিটী দ্রব্য সংস্থাপিত হইয়াছে; ১ যে কোণে আছে তাহা হইতে ভার-মধ্য কত দূরে হইবে। উত্তর। ১৮.৫২৭৫

১৭। ৬ এবং ৮ ইঞ্চি পরিমিত কোটি এবং ভুজ বিশিষ্ট সম-কোণি ত্রিভুজের তিনটী ভুজের উপর সম-চতুর্ভুজ অঙ্কিত করিয়া সম-কোণ হইতে ঐ ক্ষেত্রের ভার-মধ্য কতদূরে হইবে নিরূপণ কর।

উত্তর। ৫.০৫৯.

যন্ত্র-বিজ্ঞান।

প্রথম অধ্যায়।

[যন্ত্র কি ?—বল কি ?—ভার কি ?—বল এবং ভার পরিমাণের রীতি কি রূপ ?]

যে সকল উপায় দ্বারা এক স্থানে প্রযুক্ত বল স্থানান্তরে ভিন্নরূপে কার্য্যকারী হয়, তাহাকেই যন্ত্র বলা যায়। ঢেঁকির এক দিক্ পায়ে করিয়া চাপিলে তাহার অন্য দিক্ উচ্চ হইয়া উঠে এবং সেই মুখ ধান্যাদির উপর বল-পূর্ব্বক পতিত হইয়া তাহাদিগের শস্যের এবং সেই মুখ ধান্যাদির উপর বল-পূর্ব্বক পতিত হইয়া তাহাদিগের শস্যের এবং খোসার পরস্পর সংযোগ বিনাশ করে। যখন্ হল চালিত হয় তখন্ বলীবর্দ্দ সরল রেখায় চলিয়া যায়, যে ব্যক্তি হল চালন করে সে হলের মুখ-ভাগটী মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া ধরে, কিন্তু ঐ দুই বলে মৃত্তিকা বিস্ফারিত এবং বিপর্য্যস্ত হইয়া দুই পার্শ্বে পড়িতে থাকে। ঘানিগাছের গোরু অবিরত চক্রাকারে ভ্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার বলে উক্ত গাছের ভিতরের শর্ষপাদি মর্দ্দিত হইয়া তৈল নিঃসৃত হয়। মনুষ্য কর্ত্তৃক কুঠার উত্তোলিত হইয়া কাষ্ঠের উপর আহত হইলে কাষ্ঠ পার্শ্বের দিকে ফাটিয়া যায়। এই সকল স্থলে বল প্রয়োগ এক স্থানে এক প্রকারে হইতেছে, কিন্তু তাহার কার্য্য ভিন্ন স্থলে ভিন্ন রূপ বলের কার্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, সুতরাং যাহাদিগের আশ্রয়ে এই রূপ হইতেছে সেই ঢেঁকি, লাঙ্গল, ঘানিগাছ এবং কুঠার এই সকলগুলিই যন্ত্র।

যাহা দ্বারা যন্ত্র পরিচালিত হয়, তাহাকে বল কহা যায়। বল কহা যায়। বল নানা প্রকার হইতে পারে। ঢেঁকি মনুষ্যের বলে উঠে;

লাঙ্গল, মনুষ্য এবং বলীবর্দ্দ উভয়ের বলে চালিত হয়; গোরুর বলে ঘানিগাছের শর্ষপ মর্দ্দিত হয় এবং মনুষ্যের বলে কুঠার উত্তোলিত হয়। এইরূপ, বাষ্পের বলে বাষ্পীয় শকটাদির গমন হয়—বায়ুর বলে বোমায় জল উঠে এবং স্থিতিস্থাপক স্প্রিঙের বলে ঘটী যন্ত্রের কাঁটা চলে যন্ত্রের যে ভাগে বলপ্রযুক্ত হয় তাহার নাম 'প্রয়োগ-স্থান'।

যন্ত্র দ্বারা অসংখ্যপ্রকার কার্য্য সাধন হয়, কিন্তু কার্য্য যে প্রকার হউক না কেন, তাহার সাধনার্থ অবশ্যই উহার কোন রূপ প্রতিবন্ধক নিবারণ করিতে হয়। সেই প্রতিবন্ধকের নাম 'ভার'। ঢেঁকির আঘাত দ্বারা তণ্ডুলের এবং তাহার তুষের পরস্পর সংযোগ বিনাশ করা যায়। ঐ তুষ এবং তণ্ডুল যে বলে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে, সেই সংযোগ-বলকেই 'ভার' কহা যায়। লাঙ্গল দ্বারা মৃত্তিকা উৎপাটিত হয়। যে বলে মৃত্তিকা সংঘত হইয়া থাকে তাহাই 'ভার'। ঘানিগাছে সর্ষপ মাড়া যায়। তৈলের উপর শর্ষপের খোসা যে বলে আবৃত হইয়া থাকে, তাহাই 'ভার'। যখন কোন বাষ্পীয় নৌকা বাষ্পের বলে বায়ুর প্রতিকূল মুখে গমন করিতে থাকে তখন বায়ু যে বলে উহাকে পশ্চাদ্ভাগে আনিতে চেষ্টা করে এবং পৃথিবী উহাকে যত বলে আকর্ষণ করিয়া এক স্থানে বদ্ধ রাখিতে চাহে আর জলের প্রতিকূল ঘর্ষণ যত, এই তিন প্রকার প্রতিবন্ধকই উক্ত বাষ্পীয় যন্ত্রের 'ভার', বলিয়া গণ্য হয়। যন্ত্রের যে ভাগে 'ভার' বিনাশ হয়, তাহার নাম 'কার্য্য-স্থান'।

যন্ত্রের পরিচালক বল এবং তদ্দ্বারা সম্পাদিত কার্য্যও বিবিধ প্রকার হয়। কিন্তু বল এবং কার্য্য এ উভয়ের পরিমাণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রকার বল এবং ভারকে এক জাতীয় করিতে হয়। কারণ এক জাতীয় না করিলে কোন প্রকারেই উহাদিগের পরিমাণ স্থির হইতে

পারে না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, মনুষ্যেরা দাঁড় বহিয়া নৌকা চালাইতেছে—পাইল দ্বারাও বায়ু সংযোগে নৌকার গতি হইতেছে—এবং বাষ্পের বলেও নৌকা চলিতেছে—এই তিন প্রকার বলের পরস্পর সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করা আবশ্যক। অর্থাৎ এমত বলিতে হয় যে, পাইল দিলে পাঁচটা দাঁড়ের কর্ম্ম করে—বাষ্পীয় যন্ত্র যোগে এক শত দাঁড়ের কর্ম হয়, ইত্যাদি। এই রূপ বলিলেই বুঝা যায় যে, ঐ স্থলে বায়ুর বল পাঁচ জন মনুষ্যের বলের সমান এবং বাষ্পের বল ১০০ ব্যক্তির বলের সমান। ইহারই নাম বলের একজাতি-করণ।

পণ্ডিতেরা সর্ব্ব প্রকার বলকে একজাতীয় করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা বায়ুর বল পাঁচ জন মনুষ্যের বলের সমান, এমত না বলিয়া এই বিবেচনা করেন যে, মনুষ্যের বল বা অন্য কোন প্রাণীর বল সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বদেশে ঠিক্ সমান থাকে না, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের বল চিরকাল একই থাকে, অতএব বায়ু বা অপর কোন বল যাহাকে কোন দিকে টানিতেছে সেই দিকে ঠিক্ কত ভারী দ্রব্য কোন রূপ কৌশলে ঝুলাইয়া দিলে উহার পূর্ব্ববৎ গতি থাকিবে; এইরূপ বিবেচনা করিয়াই সকল প্রকার বলকে একজাতীয় করা বিধেয় হইয়াছে। যত ভারী দ্রব্য ঝুলাইয়া দিলে ঐ গতি থাকিবে তাহার ভার পরিমাণই বায়ুর বা অপর কাহার বলের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সর্ব্বপ্রকার বলকেই যে, মণ, সের, ছটাক ইত্যাদি ভার-পরিমাণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাহা স্পষ্ট বোধ হইতে পারে। বোধ কর, যেন একখানি কাষ্ঠের মেজের উপর কোন বস্তু আছে। ঐ দ্রব্যে দড়ি বাঁধিয়া টানা যাইতেছিল। যদি জিজ্ঞাসা হয় যে, উহা কত বলে আকৃষ্ট হইতেছিল, তবে সেই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর করিবার নিমিত্ত ঐ দড়িকে উক্ত মেজের এক পার্শ্বে ঝুলাইয়া তাহার অপর প্রান্তে একটী [illegible] যদি ঐ ভাবে উক্ত বস্তুটী [illegible] আসিতে থাকে,

এবং তাহার বেগও পূর্ব্বের সমান হয় তবে ঐ ভারকে পরিমাণ করিয়া যত সের বা মণ বা ছটাক হইবে, আমরা মেজের উপরিস্থিত দ্রব্যটীকে সেই পরিমিত বলে টানিতেছিলাম ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[যন্ত্রের প্রকৃতি বিবেচনা করিবার রীতি কেমন ?—যন্ত্র সহকারে বলের লাভ হয় এই কথার তাৎপর্য্য কি ?।]

যখন কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হয়, তখন সেই বিষয়টী টিল হইলে, একবারে তাহার সিদ্ধান্ত স্থির করিতে না পারিয়া মরা মনে মনে ঐ বিষয়টীকে ভাগ করিয়া লই এবং ক্রমশঃ তাহার ত্যেক ভাগের প্রতি মনোযোগী হইয়া বিচার করত পরিশেষে সমুদায় বিষয়টী উত্তমরূপে বুঝিতে পারি। যন্ত্র-বিজ্ঞান কাণ্ডেও সেইরূপ করা আবশ্যক। যন্ত্র সমষ্টির প্রকৃতি বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ উহারা যে যে পদার্থে জন্মে তাহাদিগের স্থিতিস্থাপকতা, বন্ধুরত্ব এবং দুর্নম্যতা প্রভৃতি গুণের প্রতি দৃষ্টি করা যায় না, আর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে উহাদিগের যে ভার আছে, তাহাও গণ্য করা যায় না, অপিচ বায়ুর প্রতিবন্ধিতাও তৎকালে স্বীকার্য্য হয় না। কারণ ঐ সকল লইয়া একেবারে বিবেচনা করিতে গেলে অত্যন্ত গোলোযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব প্রথমে কেবল 'যন্ত্রের প্রকৃতি কি কি' ইহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিবেচনা করা আবশ্যক। তাহার পর একে একে, উক্ত গুণ সকল থাকাতে ঐ প্রকৃতির কিরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে তাহা অনুসন্ধান করিতে হয়।

এক্ষণে যেরূপ যন্ত্রের প্রকৃতি কথিত হইবে, অবিকল তেমন যন্ত্র একটীও নির্ম্মিত হইতে পারে না। কারণ, বিবেচনা করিলে হইবে

যে, এই সকল যন্ত্রের কাষ্ঠ লৌহাদি সর্ব্বতোভাবে ভারবিহীন এবং ঘর্ষণ বর্জ্জিত—ইহাতে যে সকল শৃঙ্খল এবং রজ্জু ব্যবহৃত হয় তাহারা সর্ব্বতোভাবে নম্য—আর এই যন্ত্র যে স্থানে চলে সেই স্থানে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণও নাই। যদি বল এমত যন্ত্র যদি, কদাপিই নির্ম্মিত না হইল, তবে তাদৃশ পদার্থের প্রকৃতি অনুসন্ধানে ফল কি? ইহার উত্তর, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সর্ব্ব স্থলেই প্রথমতঃ এইরূপ করিয়া বিবেচনা করিতে হয়—অর্থাৎ যে বিষয়টী বুঝিতে হইবে প্রথমে তাহার স্থূল-তাৎপর্য্য অবগত হইয়া পরে সূক্ষ্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ ঐ বিষয় কদাপি বোধগম্য হয় না।

যন্ত্র সকলের দ্বারা অল্প বল প্রয়োগ করিলে অধিক বলের কার্য্য হয়, অনেকেই এইরূপ কহিয়া থাকেন। যদি বাস্তবিক তাহাই হইত তবে যন্ত্র সকলকে অলৌকিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে, যৎপরিমাণে কারণ প্রবল হইবে তৎপরিমাণে কার্য্যেরও আধিক্য হইবে। বল, ভার নিবারণের কারণ। সুতরাং যদি অল্প বলে অধিক ভার নিবারিত হয় তবে কারণ দুর্ব্বল হইয়াও প্রবল কার্য্যের উৎপাদক হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক কোন স্থলেই এইরূপ হয় না।

যন্ত্র মাত্রেরই কতক গুলি অবলম্ব স্থান আছে। সেই সকল অবলম্বন দ্বারা ভারের অধিকাংশই বাহিত হয়, সুতরাং বলের আপনার যে পরিমাণ উহা সেই পরিমাণ মাত্র ভারকে বহন করে, কদাপি তাহার অধিক বহন করিতে পারে না। বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের বিবরণ কালে এই বিষয় অধিক স্পষ্ট করা যাইবে। সম্প্রতি ইহার একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।—এক খানি বৃহদাকার কাষ্ঠের নীচে এক খণ্ড বাঁশের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট করাইয়া এবং ঐ বাঁশের নীচে একটা ইট্ রাখিয়া যদি বাঁশের অপর প্রান্তে কেহ চাপ দেয় তবে ঐ এক জনের বলে কেমন বড় কাষ্ঠ খণ্ডও উন্নত হইয়া উঠে। এই

স্থলে বোধ হইতেছে যেন, অল্প বলে অধিক ভার উত্থিত হইল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় নাই। উক্ত বাঁশের অবলম্ব ইষ্টক খানি ঐ কাষ্ঠের ভার বহন করিয়াছিল। মনুষ্য কর্তৃক যে অতিরিক্ত বল প্রদত্ত হইল তদ্দ্বারাই কাষ্ঠ উত্তোলিত হইল।

যদি বল যে; ঐ ইষ্টকরূপ অবলম্বের সাহায্যে যদিও পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠ খণ্ড ইষ্টকের উপরেই ভর দিয়া থাকিতে পারে এমত হয় বটে, কিন্তু এক জন সামান্য মনুষ্যের বলে উহা যে, উন্নত হইয়া উঠিল, অর্থাৎ উহার যে ঊর্দ্ধমুখে গতি জন্মিল তাহার কারণ কি?—তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে এই স্থলে কার্য্যের প্রতি বাস্তবিক্ কত বল প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। কাষ্ঠ খানি যদি এক শত মণ ভারী হয় এবং উক্ত বংশখণ্ড সংযোগে যদি উহা এক অঙ্গুল প্রমাণ উন্নত হইয়া উঠিয়া থাকে, তবে ঐ কাষ্ঠের বেগ-বল (মণ ১০০×১ অঙ্গুলি)=১০০ মণ হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি কাষ্ঠকে উন্নত করিয়াছে সে অবশ্য উহার প্রতি ১০০ মণ পরিমিত বল প্রযুক্ত করিয়া থাকিবে। কিন্তু সে এত বল কোথায় পাইল?।

এই স্থলে বিবেচনা করা উচিত যে, যদি ঐ কাষ্ঠ খানি সমান এক শত অংশে বিভক্ত হইত এবং কোন যন্ত্রের সহায়তা ব্যতিরেকে উক্ত ব্যক্তির বলে ঐ এক শত খণ্ড একে একে এক শত বার এক এক অঙ্গুলি করিয়া উন্নত হইতে পারিত, তবে ঐ ব্যক্তির বেগ ঠিক্ ১০০ শত অঙ্গুলি স্থান পরিমিত হইত। সুতরাং তাহার বেগ-বল (১ মণ×১০০ অঙ্গুলি)=১০০ মণ হইত। অতএব বোধ হইতেছে ঐ ব্যক্তির বেগ অধিক হওয়াতেই তাহার বেগ-বল তাদৃশ অধিক হইয়াছে।

ফলে তাহাই দেখা যায়. ঐ কাষ্ঠ যে সময়ে ১ অঙ্গুলি মাত্র উঠিবে সেই সময় মধ্যে যে তাহাকে উত্তোলন করিতেছে তাহার হাতও ১০০ অঙ্গুলি প্রমাণ নত হইয়া আসিবে।

অতএব বলের এবং ভারের বেগ-বল চিরকাল সমান থাকে। বল গুরু হইলে তাহার বেগ অল্প হয়, এবং বল লঘু হইলে তাহার বেগ অধিক হওয়া আবশ্যক। ইহাই যন্ত্র-বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূলসূত্র। ইহার তাৎপর্য্য কখন কখন এরূপে প্রকাশিত হয় যথা, বলের লাভ করিতে গেলে বেগের লোক্‌সান এবং বেগের লাভ করিতে গেলে বলের লোক্‌সান করিতে হয়।

এক্ষণে এই মাত্র বিবেচনা কর যে ' বেগ ' বলেরই কার্য্য। সুতরাং যখন বল লঘু হইয়াছে বলিয়া বেগের আধিক্য দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ করা যায়, তখন বাস্তবিক বলই দেওয়া হয়। সুতরাং যন্ত্র সংযোগে বলের লাভ হয় একথা সামান্যতঃ বুঝা কর্ত্তব্য নহে। কার্য্যের এবং কারণের বেগ-বল সর্ব্বদা সমান থাকে এমত স্মরণ করা কর্ত্তব্য। বল লঘু হইলে বেগের আধিক্য দ্বারা উহা পূরণ করা যায় এ বিষয় পরে সুস্পষ্ট হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

[যন্ত্র দ্বারা বাস্তবিক লাভ কি হয় ?—সাম্যাবস্থা কি ?—বৈষাম্যাবস্থা কি ?]

পূর্ব্বাধ্যায়ে যাহা যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেই বোধ হইবে, যে বংশ-খণ্ড সংযোগে যদিও বাস্তবিক বলের লাভ না হইয়া থাকে, তথাপি কাষ্ঠ উত্তোলন কার্য্যের অনেক সুবিধা ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি ঐরূপে কাষ্ঠ উত্তোলন করে সে নীচের দিকে বল প্রয়োগ করিলেও কাষ্ঠ উপরের দিকে উঠে—দ্বিতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি লঘু বল দেয় তাহাতে কাষ্ঠের গুরু ভার উন্নত হয়, পরন্তু ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বেগ গরিষ্ঠ প্রদত্ত হয়; কিন্তু কাষ্ঠের লঘু বেগ জন্মে।

এই সামান্য যন্ত্রের যেরূপ প্রকৃতি দেখা যাইতেছে বাষ্পীয় যন্ত্র প্রভৃতি অতি অসামান্য যন্ত্রাদিকেও অবিকল সেইরূপ প্রকৃতি দৃষ্ট হইবে। অতএব যন্ত্র মাত্রেরই সামর্থ্য অবধারিত হইল যে, তদ্দ্বারা বল প্রয়োগের দিক্ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, আর বেগের পরিবর্ত্তে বল এবং বলের পরিবর্ত্তে বেগ প্রতিনিহিত হইতে পারে। যদি ইহাও না হইত তবে যন্ত্র নির্ম্মাণের কোন প্রয়োজনই থাকিত না। যে বলের দ্বারা যে কার্য্য সাধন করিতে হইবে তাহা সাক্ষাৎ প্রয়োগ করিলেই হইত।

কিন্তু যন্ত্রের উক্ত কতিপয় গুণ থাকাতে লোকের কতই উপকার হইতেছে। দেখ, শর্ষপকে অন্য প্রকারে মর্দ্দন করিয়া তৈল বাহির করিতে হইলে কতই কষ্ট হইত, কিন্তু ঘানি গাছে শর্ষপ ফেলিয়া দিলে, গোরু সহজে চলিয়া যাইতে থাকে, অথচ তৈল নিঃসৃত হয়। বাষ্পীয় যন্ত্রের অর্গলদ্বয় সরলরেখাক্রমে এ দিক্ ও দিক্ করিতে থাকে, কিন্তু তাহারই দ্বারা যন্ত্র বিশেষ সংযোগে বাষ্পীয় শকট ও বাষ্পীয় নৌকাদির চক্র সকল ঘুরিতে থাকে এবং ঐ সকল যান দ্রুত-বেগে চলিয়া যায়। ঘটী-যন্ত্রের ভিতরে একটা লৌহ পিণ্ড ঝুলে, উহা মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে নীচে নামিয়া আইসে, কিন্তু যন্ত্র সংযোগ দ্বারা উহার সেই অধোগতি, ঘটী-যন্ত্রের কাঁটার চক্রগতির উৎপাদক হয়। চরকায় যত বেগে পাক দেওয়া যায়, চক্রটা তাহার শতগুণ অধিক বেগে ঘূর্ণিত হয় এবং চরকায় যে পাক দেওয়া যায়, চক্র তাহার বিপরীত দিকে ঘূরে। এইরূপ সর্ব্বস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যন্ত্রের দ্বারা বল প্রয়োগের নানাবিধ সুবিধা জন্মে এবং সেই জন্যই যন্ত্র মাত্রের এত গৌরব।

যন্ত্রের বাস্তবিক লাভ এইরূপ। যেমন বণিকেরা আপনাদের স্থানে যে দ্রব্য অধিক থাকে তাহা দিয়া যে দ্রব্যের অভাব তাহা বিনিময় করিয়া লন, মনুষ্যেরাও সেইরূপ যন্ত্র সহযোগে কখন বা বল

দিয়া অধিক বেগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, আর কখন বা এক দিকে এক প্রকারে বল প্রদান করিয়া অন্য দিকে ভিন্ন প্রকার বল প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু মনুষ্যদিগের পরস্পর বাণিজ্যে যেমন দ্রব্যের মূল্য ঠিক ধরা থাকে, কখন অল্প দিয়া অধিক পাওয়া যায় না এবং অধিক দিয়াও অল্প লইতে হয় না, তেমনি মনুষ্যেরা প্রকৃতির সহিত যে বাণিজ্য করেন তাহারও দরদাম চিরকাল একই প্রকার নিরূপিত থাকে। অর্থাৎ সকল যন্ত্রেরই 'কার্য্য-স্থানের' বেগ-বল এবং প্রয়োগ স্থানের বেগ-বল সর্ব্ব সময়ে ঠিক সমান থাকে। অতএব যদি 'ব' অর্থে বল এবং 'প' অর্থে তাহার পতন বা বেগ বুঝা যায় আর 'ভা' অর্থে ভার এবং 'উ' অর্থে তাহার উন্নতি কিম্বা বেগ বোধ হয়, তবে গণিত শাস্ত্রের সঙ্কেতানুসারে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম এইরূপে লেখা যাইতে পারে, যথা—ব×প=ভা×উ।

যখন কোন যন্ত্র এই অবস্থান্বিত থাকে, অর্থাৎ উহাতে যে বল প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাকে সেই বলের বেগ দ্বারা গুণ করিলে যাহা হয় ঐ যন্ত্র দ্বারা যে ভার বিনষ্ট হইতেছে, সেই ভারের বেগ দ্বারা ভারকে পূরণ করিলে যদি তত হয়, তবে যন্ত্রের সাম্যাবস্থা হইয়াছে বলা গিয়া থাকে। সাম্যাবস্থায় যন্ত্র যেমন ছিল তেমনি থাকে। যদি সচলাবস্থায় উক্ত সাম্য হইয়া থাকে তবে যন্ত্র চলিতেই থাকিবে, আর যদি অচলাবস্থায় যন্ত্রের সাম্যভাব হইয়া থাকে, তবে যন্ত্র নিশ্চল থাকিবে, ইহার প্রমাণ দেখ, যদি কোন ঘোটক ১০মণ ভারী একখানি শকট বহন করিয়া প্রতি ঘণ্টায় দুই ক্রোশ পথ যাইতে থাকে তবে, ঘোড়ার বেগ-বল ঐ শকটের বেগ-বলের সমান, অর্থাৎ উভয়ই (১০×২)=২০মণ পরিমিত হয়। যদি ঘোটক অবিরত ঐ কুড়ি মণ বেগ-বল প্রদান করিতে পারে তবে শকটও সমান বেগে চলিতে থাকিবে। সুতরাং সচল থাকিয়াই উহার সাম্যাবস্থা হইবে। আবার দেখ, যদি কোন এক মণ ভারী দ্রব্যকে কোন ব্যক্তি উত্তোলন

করিয়া ধরিয়া থাকে তবে ঐ এক মণ ভারী দ্রব্যের যত বেগ-বল, যে ধরিয়াছে তাহারও তত বেগ-বল, সুতরং ঐ এক মণের অধিক বেগ-বল প্রয়োগ না করিলে ঐ এক মণ পরিমিতি দ্রব্য আর অ, উঠিতেও পারিবে না, নামিতেও পারিবে না। সুতরাং অচল থাকি-যাই উহার সাম্যাবস্থা জন্মিবে।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘোটক যদি শকটকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলে টানে তাহা হইলে শকটের বৈষম্যাবস্থা হয়। কিন্তু পরক্ষণেই শকটের বেগ বৃদ্ধি হইয়া পুনর্ব্বার সাম্যাবস্থা ঘটে। আবার যদি ঘোটক শকটকে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প বলে টানে তাহা হইলেও একবার বৈষম্য হয়। কিন্তু সেই ক্ষণেই শকটের বেগ হ্রস্ব হইয়া সাম্যাবস্থা জন্মে।

অতএব সাম্যাবস্থাই যন্ত্র মাত্রের স্থায়ী ভাব। বৈষম্যাবস্থা উহাদিগের ব্যভিচারী ভাব মাত্র। এই হেতু যন্ত্রের প্রকৃতি বর্ণন করিতে হইলে উহাদিগের স্থায়ীভাব বর্ণন করিলেই হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

[যন্ত্র কত প্রকার ? বিশুদ্ধ যন্ত্র কত প্রকার ? যন্ত্র মূল কি কি ?]

আমাদিগের দেশে পূর্ব্বকালাবধি যত প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার ছিল আর সম্প্রতি ইংরেজেরা এই দেশে যত প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছেন, বিশেষতঃ ইউরোপ খণ্ডে যত প্রকার যন্ত্র এক্ষণে ব্যবহৃত হইতেছে, আর তথায় দিন দিন যত নূতন নূতন যন্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে, সেই সকল গুলির সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। ইউরোপের অনেক দেশে এমত অনেক যন্ত্রের ব্যবহার আছে, যাহার নামও তথাকার অপর দেশীয় লোকের শ্রুতিগোচর হয় নাই।

কিন্তু যন্ত্রের প্রকার ভেদ যতই হউক না কেন, তাহারা প্রথমতঃ বিশুদ্ধ এবং বিমিশ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। বিশুদ্ধ যন্ত্র গুলির প্রকৃতি এই যে, তাহাদিগের কার্য্য-স্থান এবং বল-প্রয়োগ স্থান এই দুই স্থানের মধ্যে অপর কোন যন্ত্রের কার্য্য হয় না, ঐ যন্ত্র একাকীই কার্য্যকারী হয়। যখন এক খানা বাঁশে চাড়া দিয়া কাষ্ঠ বা অপর কোন ভারী দ্রব্যকে সরান যায়, তখন ঐ বাঁশ একটা বিশুদ্ধ যন্ত্রের কার্য্য করে। বিমিশ্র-যন্ত্রের প্রকৃতি ইহার বিপরীত। উহার অনেক ভাগ থাকে। সেই এক এক ভাগ এক একটী বিশুদ্ধ যন্ত্র। উহারা প্রথমতঃ পরস্পরের প্রতি কার্য্যকারী হইয়া পরিশেষে অভিপ্রেত সাধন করে। চরকা একটী বিমিশ্র-যন্ত্র। চরকার কর্ণে পাক দিলে সেই পাকে উহার কাঠি ঘুরে, কাঠি ঘুরিলে উহার হাঁড়ি ঘুরে, সেই হাঁড়িতে যে তাঁইত বেষ্টিত থাকে তাহা হাঁড়ির সহিত ঘুরে, তদ্দারা টক্রু ঘূর্ণিত হয় পরে টক্রুর ঘুরণে তুলায় পাক লাগিয়া ক্রমশঃ সুত্র হইতে থাকে।

কোন বিমিশ্র-যন্ত্র দ্বারা কত কার্য্য হইতেছে নিরূপণ করিতে হইলে ঐ যন্ত্রটী যত গুলি বিশুদ্ধ-যন্ত্রের সংযোগ জন্মিয়াছে সেই সকল গুলির কার্য্য-ক্ষমতা পরিমাণ করিতে হয়। ঐ সকল গুলির কার্য্য ক্ষমতা সমুদয়ে যত হয়, বিমিশ্র-যন্ত্রের কার্য-ক্ষমতা ঠিক্ তাহারই সমষ্টি হইবে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে বিশুদ্ধ যন্ত্রের প্রকৃতি অনুসন্ধান করাই আবশ্যক বোধ হইতেছে।

বিশুদ্ধ-সর্ব্ব সমেত তিন প্রকার বই নাই। যেমন কোন ভাষায় যতই কেন কথা থাকুক না, সেই ভাষায় যয়টি বর্ণ সেই গুলি মিলিয়াই সকল কথা হয়, যেমন জগতের পদার্থ ভেদ যতই হউক না কেন, পঞ্চষষ্টি প্রকার পরমাণুর দ্বারাই সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় তেমনি যে দেশে যতপ্রকার যন্ত্র থাকুক না কেন, উক্ত তিন প্রকার

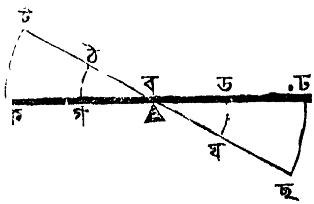
বিশুদ্ধ-যন্ত্র ব্যতিরেকে তাহার কাহাতেও কিছু অধিক থাকে না। ঐ তিনটী যন্ত্র এই;

১ বলম্ব সমন্বিত কঠিন দণ্ড।

২ নম্য রজ্জু বা শৃঙ্খল।

৩. কঠিন এবং মসৃণ ক্রমনিম্ন ধরাতল।

ইহাদিগের প্রথমটীর প্রকৃতি এই যে, উহাকে অবলম্বের উপর চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত করা যায়। সুতরাং ঐরূপে ঘূর্ণিত করিলে উহার সকল ভাগই বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে, এবং যে ভাগ অবলম্ব-স্থান হইতে যতদূর তাহার বেগ তত অধিক হয়। কারণ অবলম্ব-স্থান ঐ সকল বৃত্তেরই কেন্দ্র এবং অবলম্ব-স্থান হইতে যে ভাগ যত দূর সে ভাগ তত বৃহদ্বৃত্ত-পরিধিতে ভ্রমণ করে।



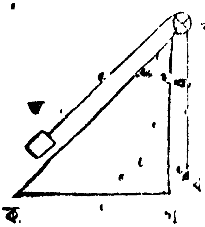
এই প্রতিকৃতি দেখিলেই বোধ হইবে যদি 'কচ' নামক দণ্ড 'ব' নামক অবলম্বের উপর ঘুরিয়া 'টছ' রেখায় যাইয়া উপস্থিত হয় তবে 'কচ' এর 'গ' 'ড' 'ক' 'চ' প্রভৃতি যে 'ব' হইতে যতদূর, তাহাকে তত অধিক পথ, যথা 'গঠ' 'ঘড' 'কট' 'ছচ' এক সময়ে যাইতে হইবে। সুতরাং উহাদিগের দূরত্বানুসারে বেগের তারতম্য হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার বিশুদ্ধ-যন্ত্র একটী রজ্জু মাত্র। উহার প্রকৃতি এই যে, উহার এক স্থানে কোন বল প্রযুক্ত হইলে তাহা সর্ব্ব স্থানে সমান লাগে। যদি ঐ রজ্জুকে কোন কঠিন দ্রব্যের বেড় দিয়া লওয়া যায় তথাপি সেই প্রকৃতির অন্যথা হইতে পারে না। কারণ উহা যে, সর্ব্বতোভাবে নম্য এবং ঘর্ষণ-বিহীন ইহা পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।



'কগখ' নামক একটী ঐরূপ রজ্জু। উহাকে 'গ' নামক কোন চক্রের উপর বেড় দিয়া এক প্রান্তে 'ক' এবং অপর প্রান্তে 'খ' নামক ভার ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'ক' যত ভারী 'খ' ঠিক্ তত ভারী না হইলে ঐ রজ্জু কখন সাম্যাবস্থ থাকিবে না, যে দিকে অধিক ভার সেই দিক নামিয়া পড়িবে।

তৃতীয় প্রকার বিশুদ্ধ যন্ত্র একটী কঠিন ক্রমনিম্ন ধরাতল। উহার উপর ভারী দ্রব্যাদি গড়াইয়া, অথবা টানিয়া তুলিতে পারা যায়। সেই দ্রব্য উত্তোলন করিতে যে বল প্রযুক্ত হয় তাহাকে গতি-বিভাগের নিয়মানুসারে দুই ভাগে ভাগ করিয়া লইতে হয়। নিম্নবর্ত্তী চিত্রে 'কখগ' একটী ক্রমনিম্ন ধরাতল।



উহার উপর 'ড' নামক ভার উত্থিত করণার্থে উহাতে একটী রজ্জু বদ্ধ করিয়া 'খ' নামক স্থানের উপর দিয়া ঐ রজ্জু নীচে ঝুলাইয়া দেওয়া গিয়াছে এবং সেই প্রান্তে 'ব' নামক ভার বদ্ধ হইয়াছে। 'ব' ভার 'ড' অপেক্ষা ন্যূন। অথচ উহা দ্বারা যে, 'ড' সাম্যাবস্থ রহিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, 'ড' নামক ভার পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে 'খগ' লম্ব রেখা ক্রমে ঠিক্ নীচে আসিতে চাহে। কিন্তু ঐ বল গতি-বিভাগের নিয়মানুসারে দুইটী বলের সমান। পরন্তু ঐ দুয়ের মধ্যে একটী 'কখ' এর উপর লম্বমান হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহা ঐ কঠিন ক্রমনিম্ন ধরাতলের

প্রতিঘাতেই সাম্যাবস্থ হইতেছে। অতএব ঐ দুইয়ের একটী মাত্র এই স্থলে কার্য্যকারী হয়। যদি সেই বস্তুটী 'ব' এর আকর্ষণ পাইয়া সাম্যবস্থ হয় তবে সুতরাং টি ভার স্থির হইয়া থাকে। উপরে বা নীচে কোন দিকেই যাইতে পারে না। ক্রমনিম্ন ধরাতলে যেরূপ গতি-বিভাগ হইয়া থাকে তাহা প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে ১৫৩ পৃষ্ঠের চিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে সুস্পষ্ট বোধ হইবে।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই বোধ হইবে যে, বিশুদ্ধ-যন্ত্র এই এই তিন প্রকার বই আর নাই, কিন্তু যন্ত্র বিজ্ঞান বেত্তারা পাঠকবর্গের বোধ-সৌকার্য্যের নিমিত্ত ঐ তিনেরই প্রকার ভেদ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছয় প্রকার বিশুদ্ধ-যন্ত্র কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি ঐরূপ কল্পনা করা আবশ্যক হয় তবে, ছয় প্রকার না বলিয়া বিশুদ্ধ-যন্ত্র আট প্রকার বলাই অধিক যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে। সেই আট প্রকারকে যন্ত্র-মূল বলা যায়। তাঁহাদিগের এক একটীর বিশেষ বিশেষ নাম এই।

১. সরল-দণ্ড-যন্ত্র। ৫. অবদ্ধ-কপি-যন্ত্র।
২. বক্র-দণ্ড-যন্ত্র। ৬. ক্রমনিম্ন-ধরাতল-যন্ত্র।
৩, অক্ষ-চক্র-যন্ত্র। ৭, কাজলা বা ছেনি যন্ত্র।
৪, বদ্ধ-কপি-যন্ত্র।

এই আটটীর মধ্যে ১ম ২য় ... সর্ব্ব প্রথমোক্ত বিশুদ্ধ-যন্ত্রের প্রকার বিশেষ মাত্র—৪র্থ এবং ৫ম দ্বিতীয় প্রকার বিশুদ্ধ-যন্ত্রের অন্তর্গত আর ৬ষ্ঠ ৭ম ৮ম তৃতীয়ের অন্তর্ভূত।

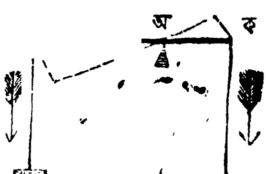
যাঁহারা যন্ত্র-মূল ছয়টী বলেন তাঁহারা ২য়কে প্রথমের অভিন্ন এবং ৪র্থ ও ৫ম দুইকেই এক বোধ করেন।

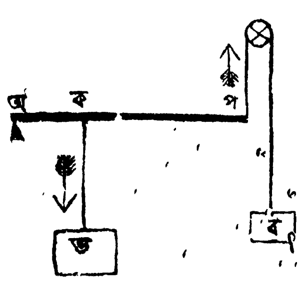
এই সমস্ত যন্ত্র-মূলের প্রকৃতি ক্রমশঃ কথিত হইবে।

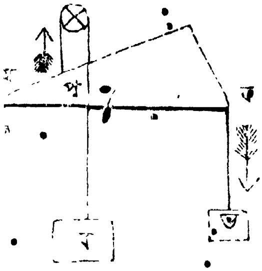
পঞ্চম অধ্যায়।

[সরল দণ্ডযন্ত্র—তুলা দণ্ড—উদাহরণ—অবলম্বের উপর চাপ।]

একটা কঠিন এবং দীর্ঘাকার দণ্ড যদি কোন অবলম্বের উপর ঘুরে তাহা হইলেই দণ্ড-যন্ত্র হয়। দণ্ড যন্ত্রের তিন অঙ্গ—একটী অবলম্ব এবং দুইটী ভুজ। যাহার উপর নির্ভর করিয়া দণ্ড ঘূর্ণিত হয় তাহার নাম অবলম্ব, এবং ঐ অবলম্ব হইতে প্রয়োগ-স্থানের দূরত্বকে একটী ভুজ এবং কার্য্য স্থানের দূরত্বকে আর একটী ভুজ বলা যায়। অবলম্বের, কার্য্য-স্থানের প্রয়োগ-স্থানের বিভিন্ন প্রকার বিনিবেশ হইতে পারে। কোন কোন দণ্ড-যন্ত্রে অবলম্ব-স্থান মধ্যে এবং কার্য্য ও প্রয়োগ-স্থান উক্ত অবলম্বের দুই দিকে হয়। ঐ দণ্ডযন্ত্রকে অবলম্ব-মধ্যক কহে। কোন কোন দণ্ড-যন্ত্রের কার্য্যস্থান মধ্য ভাগে এবং অবলম্ব ও প্রয়োগ স্থান দুই প্রান্তে হয়। তাদৃশ যন্ত্রকে ভার-মধ্যক বলা যায়। আর কোন কোন দণ্ড-যন্ত্রের প্রয়োগ-স্থান মধ্যে ও কার্য্য-স্থান এবং অবলম্ব উভয় পার্শ্বে থাকে। সেই সকল দণ্ড-যন্ত্রের নাম বল-মধ্যক। এ প্রতিকৃতিতে 'কঅপ একটী কঠিন দণ্ড। 'অ' উহার অবলম্ব 'ক' কার্য্য-স্থান এবং 'প প্রয়োগ-স্থান, 'ভ' ভার এবং 'ব' বল। এই স্থলে 'ক' এবং 'প' উভয়ের মধ্যভাগে 'অ রহিয়াছে—অতএব ইহা প্রথম প্রকার অর্থাৎ অবলম্ব-মধ্যক-দণ্ড-যন্ত্র হইল। এই দ্বিতীয় প্রতিকৃতিতে ভার-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্রের আকার দৃষ্ট হইতেছে। তৃতীয় চিত্রটি বল-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্রের প্রতিকৃতি।







দণ্ড-যন্ত্র যে প্রকার হউক না কেন, উহার সাম্যাবস্থায় ভারের এবং বলের বেগ-বল সমান থাকা আবশ্যক। অতএব অবলম্ব-স্থান হইতে বলের দূরত্বকে বলের গুরুত্ব দ্বারা পূরণ কর, এবং ভারের দূরত্বকে ভারের গুরুত্ব দ্বারা পূরণ কর, যদি ঐ দুই গুণ-ফল সমান হয় তাহা হইলেই সাম্যাবস্থা জানিতে পারিবে।

পূর্ব্বগত তিনটী চিত্রের প্রথমটীর 'অপ' ভুজ যদি ৬ হাত এবং 'অক' ভুজ ২ হাত দীর্ঘ হয় আর 'ক' স্থলে বদ্ধ হইয়া যে 'ভ' নামক ভার ঝুলিতেছে সে যদি ১২ সের পরিমিত হয় তবে বিবেচনা করিতে হইবে যে, এই স্থলে ভারের উন্নতি বা বেগ 'অক' দ্বারা এবং বলের পতন বা বেগ 'অপ' দ্বারা পরিমিত হইতে পারে। কারণ উহাদিগের গতি যে বৃত্ত পরিধিতে হইবে সেই বৃত্তের একটীর ব্যাসার্দ্ধ 'অক' এবং অপরটীর 'অপ'। অতএব এই স্থলে সাম্যাবস্থার নিয়ম এইরূপ হইতেছে, যথা—ভা×অক=ব×অপ।

পরন্তু 'অক' ২ হাত এবং 'অপ' ৬ হাত, আর ভার ১২ সের, সুতরাং

$$১২\times২=৬\times ব$$

$$\therefore ব=\frac{১২\times২}{৬}=৪ \text{ সের}$$

অর্থাৎ 'ব' /৪ সের পরিমিত হইলেই ঐ যন্ত্র সাম্যাবস্থ থাকিবে। দেখ, এই স্থলে বেগের ক্ষতি হইয়া বলের লাভ হইল, কারণ উপরিস্থ সমীকরণের প্রথমাংশে বেগ ২, এবং অপরাংশে ৬; সুতরাং বল লাভ হইয়াছে, কিন্তু বেগ অধিক যাইতেছে।

দ্বিতীয় প্রতিকৃতিতে যদি এমত কল্পনা করা যায় যে, 'অক'

২ হাত 'অপ' ৬ হাত এবং 'ভা' ১২ সের তাহা হইলেও

$$\text{অক} \times \text{ভা} = \text{অপ} \times \text{ব}$$

$$২ \times ১২ = ৬ \times \text{ব}$$

$$\text{ব} = \frac{২ \times ১২}{৬} = ৪.$$

এস্থলেও বেগের ক্ষতি হইয়া বলের লাভ হইতেছে। কিন্তু তৃতীয় প্রতিকৃতিতে যদি 'অপ' ২ হাত এবং 'অক' ৬ হাত আর 'ভা' ১২ সের হয় তবে

$$\text{অপ} \times \text{ব} = \text{অক} \times \text{ভা}$$

$$২ \times \text{ব} = ৬ \times ১২$$

$$\therefore \text{ব} = \frac{৬ \times ১২}{২} = ৩৬ \text{ সের}$$

এই স্থলে ৩৬ সের বলে ১২ সের ভার সাম্যাবস্থ হয়। অতএব বলের অনেক ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু বলের যত ক্ষতি হইতেছে বেগের ঠিক তদনুসারেই লাভ হইতেছে। ঐ প্রতিকৃতি দেখিলেই বোধ হইবে যে, 'প' আকৃষ্ট হইয়া যে সময়ে উহার উপরিস্থ হয়, সেই কালের মধ্যে 'ক' ও তাহার উপরিস্থ রেখায় যাইয়া পৌঁছে। কিন্তু 'প' যে বিন্দুতে পৌঁছিয়া যত স্থান যাইতেছে তাহা অপেক্ষা 'ক' যে বিন্দুতে পৌঁছিয়া যত স্থান যাইতেছে তাহা তিন গুণ অধিক, অতএব যেমন ১২ সের ভারকে উত্তোলন করিতে তাহার তিন গুণ অধিক বল, অর্থাৎ ৩৬ সের বল লইতে হইয়াছে, তেমনি বেগেও তিন গুণ লাভ হইয়াছে, অর্থাৎ বল ১ হাত মাত্র নামিয়া ভারকে ৩ হাত উত্তোলিত করিয়াছে।

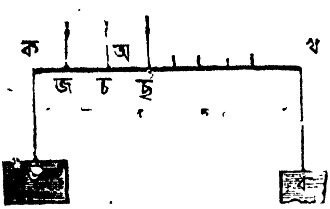
অতএব নিশ্চিত হইল যে, অবলম্ব-স্থান হইতে বলের দূরত্ব যত

অধিক এবং ভারের দূরত্ব যত অল্প হয় ততই বলের লাভ এবং বেগের ক্ষতি হয়, আর বলের দূরত্ব যত অল্প এবং ভারের দূরত্ব যত অধিক হয় ততই বলের ক্ষতি এবং বেগের লাভ হইয়া থাকে। যদি বলের এবং ভারের দূরত্ব সমান হয় তবে লাভ লোক্সান্ কিছুই হয় না। এক দিকে যত ভার দেওয়া যায় অপর দিকে ঠিক্ তাহার সমান বল দিতে হয়, নচেৎ যন্ত্র সাম্যাবস্থ থাকে না। নিক্তি এইরূপ সম-ভুজ-দণ্ড-যন্ত্র। উহার মধ্যে অবলম্ব এবং দুই দিকে দুই ভুজ সমান। সুতরাং এক দিকে যত ভার দেওয়া যায় অপর দিকে ঠিক্ তত ভার না দিলে ঐ যন্ত্র সাম্যাবস্থ হয় না; যে দিক্ ভারী সেই দিক্ ঝুলিয়া পড়ে।

অতএব নিক্তি মাত্রেরই দুই ভুজ সমান ভারী এবং সমান দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই ওজন ঠিক্ হইতে পারে। পরন্তু যদি তাহা না হয়; তথাপি একবার এক পাল্লায় এবং দ্বিতীয় বার অপর পাল্লায় রাখিয়া দ্রব্যাদির পরিমাণ করিয়া লইলেও ওজন প্রায় ঠিক্ পাওয়া যায়। লোকে যখন্ একেবারে অধিক দ্রব্য ক্রয় করে তখন্ প্রায়ই ঐরূপে 'পাল্লা-বদল' করিয়া লয়। কিন্তু যদি অল্প দ্রব্য ক্রয় করিতে হয়, তখন্ পুনঃ পুনঃ ওজন করিতে হয় না বলিয়া প্রথমে নিক্তির দুই দিক সমান ভারী আছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখে এবং যে দিক্ লঘুবোধ হয় সেই দিকে অপর কোন ভার দিয়া, অর্থাৎ 'পাষাণ ভাঙ্গিয়া' উভয় দিক্ সমান করিয়া লয়। কিন্তু 'পাষাণ ভাঙ্গা' অপেক্ষা একটী আরও উত্তম উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিলে অতি নিকৃষ্ট তুলা-দণ্ড দ্বারাও পরিমাণ ঠিক হইতে পারে। প্রথমে যে দ্রব্যের ওজন করিবে তাহা এক পাল্লায় রাখিয়া অপর পাল্লায় বালুকা ইষ্টক বা যাহা কিছু দিয়া দুই দিক্ সমান করিয়া লইবে, পরে ঐ দ্রব্যকে নামাইয়া সেই পাল্লায় বাটখারা তুলিয়া দিবে। যে পরিমাণ বাটখারা তুলিলে অপর পাল্লার ইষ্টকাদির ঠিক্ সমান হইবে, তাহাই ঐ দ্রব্যের পরিমাণ। তুলা-দণ্ড

যেমন হউক না কেন, যদি বাটখারা ঠিক থাকে, তবে এইরূপ করিলে অবশ্য প্রকৃত পরিমাণ জানা যাইবে।

দণ্ড-যন্ত্রের ভুজ দ্বয় সমান না হইলেও ঐ যন্ত্রের প্রকৃতি জানা থাকিলে তদ্দ্বারা দ্রব্যাদির ভার পরিমাণ হইতে পারে। পরবর্ত্তী

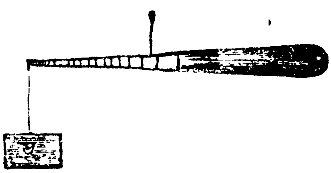


চিত্রে 'কখ' দণ্ডের যদি অবলম্ব স্থান 'অ' হয় এবং 'অক' ভুজ ৪ অঙ্গুলি আর 'অখ' ভুজ ২০ অঙ্গুলি প্রমাণ হয় তবে 'খ' হইতে 'ব' নামক /২সের ভার ঝুলাইয়া দিলে 'ক' হইতে $\left(\frac{২০\times২}{৪}\right)$=১০ সের ভার ঝুলাইতে হইবে, নচেৎ দণ্ড সাম্যাবস্থ থাকিবে না। সুতরাং যদি এই দণ্ডে 'ব' এবং 'ভ' সাম্যাবস্থ থাকে তবে 'ব' কত জানিলেই 'ভ' কত আছে জানিতে পারা যায়, অতএব ইহা দ্বারাও ভার নিশ্চয় হইতে পারে।

কিন্তু যদি এই রূপ না হইয়া 'ব' সর্ব্বদা সমান থাকে। আর 'অ'কে যথা ইচ্ছা সরাইতে পারা যায়, তাহা হইলেও পরিমাণ হয়। কারণ দেখ যদি অবলম্ব 'অ' হইতে 'ছ' স্থানে সরিয়া আইসে এবং 'অছ' দুই অঙ্গুল প্রমাণ হয় তবে এই স্থলে ভাবের দূরত্ব ৬ অঙ্গুল এবং বলের দূরত্ব ১৮ অঙ্গুল হইবে। সুতরাং 'ব' /২ সের হইলে 'ভ' $\left(\frac{১৮\times২}{৬}\right)$=৬ সের হওয়া আবশ্যক। যদি অবলম্ব স্থান আরও 'খ' এর দিকে দুই অঙ্গুল আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে ভারের দূরত্ব ৮ অঙ্গুল এবং বলের দূরত্ব ১৬ অঙ্গুল হইবে। সুতরাং 'ব' যদি সেই /২ সের

থাকে তবে 'ভ' $\left(\frac{১৬ \times ২}{৮}\right)$=৪ সের পরিমিত হইবে। পরন্তু যদি অবলম্ব স্থান 'ক'এর দিকে দুই অঙ্গুল প্রমাণ গিয়া 'জ' স্থানে উপস্থিত হয়, তবে 'ভ' এর দূরত্ব ২ অঙ্গুল এবং 'ব' এর দূরত্ব ২২ অঙ্গুল হইয়া উঠে। সুতরাং 'ব' পূর্ব্ববৎ ২ সের থাকিলে 'ভ' $\left(\frac{২২ \times ২}{২}\right)$=২২ সের হওয়া আবশ্যক।

এইরূপ তুলাদণ্ডের লাভ এই যে, অনেক বাটখারা লইয়া বেড়াইতে হয় না। আর যদি 'ব'কে স্বতন্ত্র না রাখিয়া 'খ'এর সহিত যুড়িয়া দেওয়া যায় অথবা ঐ দণ্ডের 'খ' স্থান কিঞ্চিৎ স্থূল করা যায়, তাহা হইলে 'ব'কেও ঝুলাইয়া দিবার আবশ্যকতা থাকে না।



আমাদিগের দেশে অতি প্রাচীন কালাবধি যে তুলদাঁড়ির ব্যবহার হইত তাহার প্রকৃতি অবিকল এই রূপ।

যখন কাষ্ঠের কুদার নীচে যষ্টি প্রবিষ্ট করিয়া এবং সেই যষ্টির নীচে এক খানি প্রস্তর বা ইষ্টক রাখিয়া অপর প্রান্ত ধরিয়া চাপ দেওয়া যায় তখন দুই প্রকার বিষম ভুজ অবলম্ব মধ্যক দণ্ড-যন্ত্রেরই ব্যবহার হয়। কাঁচি দুইটী অবলম্ব-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্রের যোগে জন্মে। কাঁচির খিল ঐ দুইটী যন্ত্রের অবলম্ব স্থান, হাত দিয়া যে চাপ দেওয়া যায় তাহাই বল এবং উহাতে যে দ্রব্য কাটা যায়, তাহার প্রতিবন্ধকতা ভার। ঢেঁকিও একটী অবলম্ব-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্র। উহার পোয়া অবলম্ব, মনুষ্যের পায়ের চাপ বল এবং ধান্যাদির খোসার সংযোগ ভার।

এইরূপ অবলম্ব-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্রের উদাহরণ স্থল শত শত আছে। ভার-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্রের একটী উদাহরণ যাঁতি। যাঁতির এক প্রান্তে যে খিল থাকে তাহাই অবলম্ব, উহার মধ্যে যে গুবাকাদি দ্রব্য থাকে তাহাই ভার, এবং অপর প্রান্তে যে চাপ দেওয়া যায় তাহা বল। ভারমধ্যক-দণ্ডের আর একটী উদাহরণ নৌকার দাঁড়। দাঁড়ের মুখে জলের যে প্রতিঘাত হয় তাহা অবলম্ব, দাঁড়ের মধ্য ভাগে যে নৌকা বদ্ধ থাকে তাহা ভার, এবং দাঁড়ের অপর প্রান্তে মনুষ্য কর্ত্তৃক যে আকর্ষণ প্রদত্ত হয় তাহাই বল। হাইলও এইরূপ দণ্ড-যন্ত্র। কবাটও এইরূপ। কবাট যে কব্জা বা হাঁস্‌কলে ঝুলান থাকে তাহাই উহার অবলম্ব, উহার 'ভার' মধ্যে থাকে এবং অপর প্রান্তে যখন হাত দিয়া ঠেলা যায় তখন হস্তের 'বল' প্রযুক্ত হয়। হাত-গাড়িরও মধ্যে ভার এক পার্শ্বের চক্র অবলম্ব এবং অন্য প্রান্তের মনুষ্যের হস্ত বল। বগি গাড়ি প্রভৃতি যত দ্বিচক্র শকট আছে সকলই এইরূপ। মই দিয়া যখন উপরে উঠা যায় তখন যে উঠে তাহার ভার উক্ত মইএর মধ্যে থাকে, নীচে মৃত্তিকা অবলম্ব হয় এবং যাহাতে মই ঠেকিয়া থাকে সেই প্রাচীরাদি বলের কার্য্য করে। বেহারাদিগের স্কন্ধের পাল্কিকেও এইরূপ দণ্ড-যন্ত্র বলা যাইতে পারে। কারণ উহাতেও ভার-মধ্যে থাকে এবং এক পার্শ্বের বেহারাদিগের স্কন্ধ অবলম্বের কার্য্য করে ও অপর পার্শ্বে বেহারাদিগের স্কন্ধ বলের কার্য্য করে।

পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার দণ্ড-যন্ত্রের উদাহরণ যত অধিক পাওয়া যায় বল-মধ্যক দণ্ড যন্ত্রের উদাহরণ তত পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, এই প্রকার দণ্ড-যন্ত্রের আশ্রয়ে বল ব্যয় করিয়া বেগ লাভ হয়। অতএব যে স্থলে বেগের প্রয়োজন সেই স্থলেই এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাণীদিগের সর্ব্বদা নানাস্থান বিচরণ করা আবশ্যক, সুতরাং তাহাদিগের শরীরে বেগের বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে। এই হেতু জগদীশ্বর তাহাদিগের অনেক অঙ্গে এইরূপ বল-

মধ্যাক দণ্ড-যন্ত্রের প্রয়োগ করিয়াছেন। মনুষ্যের হস্ত পদ তাহার অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। আমাদের হাতের কনুই অবলম্ব, সেই কনুইর নীচে যে মাংসপেশী আছে তাহারই সঙ্কোচ্যতা এবং বিস্তার্য্যতা বল, এবং হাতে করিয়া যাহা তুলা যায় বা ফেলা যায় তাহাই ভার। দেখ, যখন আমরা হাত গুড়াইয়া লই, তখন কফোনিধ্র সন্নিহিত ভাগ অতি অল্পমাত্র সরে, কিন্তু তাহাতেই হস্তের অগ্রভাগ অনেক দূর সরিয়া যায়। অতএব ঐ স্থলে বেগের লাভ হইতেছে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। পায়েও ঠিক এইরূপ হয়। আঁটু অবলম্ব তাহার নীচের মাংসপেশী বল, ঐ মাংসপেশী অতি অল্প মাত্র সঙ্কুচিত বা বিস্তৃত হইলেই পায়ের অগ্রভাগ অনেক দূর সরে।

দণ্ড-যন্ত্রের অবলম্বের উপর কিরূপে কত চাপ পড়ে জানা আবশ্যক। অবলম্ব-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্রের ভার এবং বল উভয়েই দণ্ডীটীকে এক দিকে আকর্ষণ করে, সুতরাং দণ্ড সাম্যাবস্থ থাকিলে ঐ দুয়ের চাপ মিলিত হইয়া যে, অবলম্বনের উপর পড়িবে ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

[১৫৮ পৃষ্ঠের প্রথম প্রতিকৃতিতে যে দিকে শরের মুখ সেই দিকে চাপ বুঝিতে হইবে।]

ভার-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্রে বল এবং ভার উভয়ে একাভিমুখে চাপ দেয় না। যদি 'বল' নীচের দিকে যায় তবে ভার উপরের দিকে উঠিতে চেষ্টা করে। অতএব এই স্থলে ঐ দুই চাপের পরস্পর বিভিন্নতা বা ব্যবকলন-ফল যত অবলম্বের উপরে তত চাপ পড়িয়া থাকে। [১৫৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্রতিকৃতিতে ইহা সপ্রমাণ করিয়া লও।]

যদি 'ভ' ১২ সের এবং 'অক' ২ হাত আর 'অখ' ৬ হাত হয় তবে 'ব' $\left(\frac{১২\times২}{৬}\right)$=/৪ সের হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সাম্যাবস্থায় 'অ'এর উপর (ভা—ব=১২—৪=) ৮ সের ভার পড়ে।

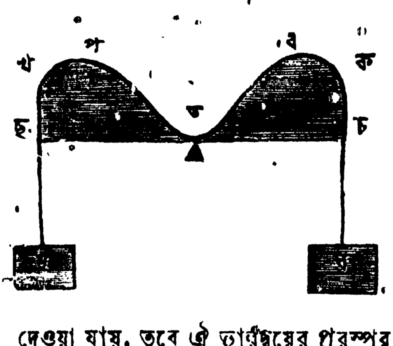
যখন দুই জন মুটে কোন ভারী দ্রব্য বাঁশে বান্ধিয়া লইয়া যায়, তখন তাহারা ঐ ভার ঠিক মধ্যস্থলে বান্ধে। নচেৎ যাহার নিকট হয় তাহাকে অধিক ভার সহ্য করিতে হয়।

বল-মধ্যক দণ্ড-যন্ত্রেও ঠিক এইরূপ বিবেচনা করিলেই ভারের এবং বলের ব্যবকলন-ফল যে অবলম্বের উপরের চাপ হইবে ইহা নিশ্চয় বোধ হইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[বক্র দণ্ড-যন্ত্র—মিশ্র দণ্ড-যন্ত্র—উদাহরণ।]

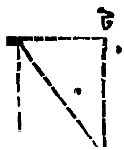
যদি দণ্ড-যন্ত্র ঠিক সরল না হয়, তাহা হইলেও উহার পূর্ব্ব প্রকৃতির কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত্ত ঘটে না। কিন্তু তাহার ভারের এবং বলের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণার্থে অবলম্ব হইতে উহাদিগের দূরত্ব কত তাহা কিঞ্চিদ্বিবেচনা করিয়া বুঝা আবশ্যক।



'কখ' নামক একখানি বক্র কাষ্ঠখণ্ড 'ত' নামক অবলম্বের উপর অবস্থিত আছে। যদি 'ক' এবং 'খ' হইতে দুই দিকে দুইটী ভার ঝুলাইয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ ভারদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ হইবে? ইহা জিজ্ঞাসা হইলে এই স্থলে প্রথমতঃ বিবেচনা কর যেন, ঐ কাষ্ঠের উপবিভাগ ক্রমশঃ চাঁচিয়া ফেলা গেল। উহাতে কুব্জাকার যে 'প'

এবং 'ব' ভাগ ছিল তাহা আর রহিল না। সুতরাং ঐ বক্র কাষ্ঠ খণ্ড 'ছতচ'এর অনুরূপ একটী সরল দণ্ড-যন্ত্র হইল। এইক্ষণে সরল দণ্ডের যে প্রকৃতি ইহারও সেই প্রকৃতি হইল। অর্থাৎ সাম্যাবস্থায়, তছ × ভা = তচ × ব, হইল। সকল বক্র দণ্ডেরই এইরূপ। বলের এবং ভারে যে যে দিকে কার্য্য হইতেছে অবলম্ব স্থান হইতে তাহার উপর লম্বপাত করিতে হয়। এবং সেই লম্বদ্বয়ের পরিমাণ করিয়া লইলেই ভারের এবং বলের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়।

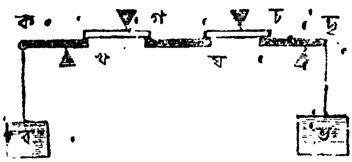
যদি কোন দণ্ড-যন্ত্রের প্রতি এমতরূপে ভার এবং বল প্রযুক্ত হয় যে, তাহাদিগের প্রয়োগাভিমুখ পরস্পর সমান না থাকে, তাহা হইলে গতি-সঙ্ঘাত এবং গতি-বিভাগের সূত্র স্মরণ করিয়া ভার এবং বলের সম্বন্ধ নিশ্চয় করা আবশ্যক।



এই প্রতিকৃতিতে 'ভ' নামক ভার 'ক' হইতে লম্ব রেখা ক্রমে ঝুলিতেছে, কিন্তু 'ব' নামক বল 'খব' নামক বক্র রেখানুসারে আকর্ষণ করিতেছে, এই স্থলে কিরূপ কার্য্য হইতেছে বিবেচনা করিতে হইলে ঐ 'খব' বলকে দুই ভাগে বিভাগ করিতে হয়। ঐ বিভক্ত বলদ্বয়ের এক ভাগ 'কভ'র সমান্তরাল এবং সমান হইবে যেহেতু ঐ বল দ্বারাই উক্ত ভার সাম্যাবস্থ হইতে পারে। সেই ভাগ যেন 'খচ'। তাহা হইলেই অপর ভাগ 'খট' হইবে, অতএব বোধ হইতেছে যে, ঐ বল-ভাগ সমুদায় যন্ত্রকে 'খট' অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। সুতরাং তদ্দ্বারা অবলম্বের উপর পার্শ্বে টান পড়িতেছে।

অনেক গুলি দণ্ড-যন্ত্রকে একত্রে মিলিত করিলে বিমিশ্র দণ্ড-যন্ত্র হয়। পরপৃষ্ঠার চিত্রে 'কখ' 'খগ' 'গঘ' 'ঘচ', এবং 'চছ' এই

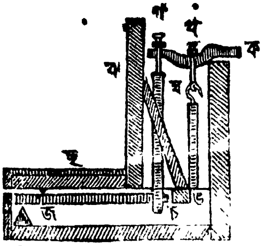
পাঁচটী দণ্ড-যন্ত্র এমতরূপে সন্নিবেশিত হইয়া আছে, যে 'ব' দ্বারা



প্রথম দণ্ডের 'ক' স্থান নত হইলে যেমন 'খ' উন্নত হয়, তেমনি তৎসহ যোগে দ্বিতীয় দণ্ডের ঐ 'খ' ভাগ উন্নত হওয়াতে 'গ' নত হইয়া পড়ে এবং 'গ' নত হইলেই 'ঘ' উত্থিত হয় আর 'ঘ'এর উত্থানে 'চ'এর অবনতি ও তৎসহ যোগে 'ছ'এর উন্নতি হইয়া থাকে। এস্থলে বিবেচনা করা আবশ্যক যদি সমুদয় দণ্ড গুলির অবলম্বের বাম ভাগস্থ প্রত্যেক ভুজগুলি ১০ অঙ্গুলি পরিমিত হয়, আর দক্ষিণ ভাগস্থ ভুজগুলি প্রত্যেকে দুই অঙ্গুলি করিয়া হয়, তবে ,ক' স্থানে 'ব' /১ সের পরিমিত হইলে 'খ স্থানে উহার বল $\frac{(১\times১০)}{২}$=/৫ হইবে; 'খ' স্থানে /৫ সের হইলে উহা 'গ' স্থানে ($\frac{৫\times১০}{২}$)=২৫ সের হইবে, আবার 'গ' স্থানের ২৫ সের বল 'ঘ' স্থানে ($\frac{২৫\times১০}{২}$)=১২৫ সের হইবে, 'ঘ'এর ১২৫ 'চ' স্থানে ৬২৫ এবং 'ছ' স্থানে ৩১২৫ হইবে। অথবা ক্রিয়া লাঘব করিবার নিমিত্ত ঐ অঙ্ক এমত করিয়া কসিলেও হইতে পারে, যথা, $\frac{১\times১০\times১০\times১০\times১০\times১০}{২\times২\times২\times২\times২}$

১×৫×৫×৫×৫×৫=৩১২৫ সের। যদি ঐ সকল ভুজ প্রত্যেকেই দশ অঙ্গুলি এবং দুই অঙ্গুলি না হইয়া পরস্পর বিভিন্ন হয় তাহা হইলেও এই নিয়মানুসারে ক্রিয়া করিলে ফল স্থির হইতে পারে। মিশ্র দণ্ড-যন্ত্রের গুণ এই যে, উহা দ্বারা অল্প স্থানের মধ্যে

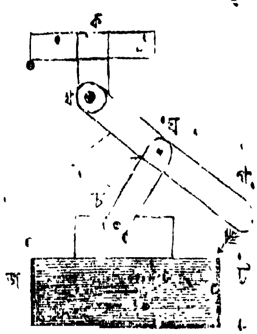
অধিক বলের কার্য্য করা যায়। একটী বিশুদ্ধ দণ্ড-যন্ত্র দ্বারা অধিক বল লাভ করিতে গেলে, দণ্ডকে অত্যন্ত বৃহৎ করিতে হয়, সুতরাং তাহার নিমিত্ত সুদীর্ঘ স্থান করিবার আবশ্যকতা হয়, কিন্তু বিমিশ্র দণ্ড গুলিকে উপরে নীচে পার্শ্বে নানা প্রকারে বাঁকাইয়া রাখা যায়, সুতরাং অল্প স্থানেই উহাদিগের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতি গুরুভার দ্রব্য সকল অনায়াসে ওজন করিবার জন্য রেইলওয়ে আ-



ফিসে যে তুলাযন্ত্র থাকে তাহা কেবল একটী মিশ্র দণ্ড-যন্ত্র মাত্র। 'ছ'এর উপরে কোন ভার স্থাপিত করিলে, যে চাপ পড়ে তাহার কতক 'জ'এর ঊর্দ্ধ-বর্ত্তী ক্ষুদ্র অবলম্ব দ্বারা 'জচ' দণ্ডের উপর পতিত হয়। তদ্দ্বারা 'জচ' কিঞ্চিন্নত হইলেই 'গচ' দণ্ড দ্বারা 'গ' স্থানে টান পড়ে। আবার ঐ ভারের কতক চাপে 'ঝ' স্থান নত হয়, তদ্দ্বারা 'ঝঙ' নামিয়া আসিবার চেষ্টা করে, সেই বলে 'ঙ' অবনত হয়। সুতরাং সেই চাপও 'ঙঘথ' দণ্ড দ্বারা গিয়া 'গথক' নামক দণ্ডে উপস্থিত হয়।

এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে 'ছ' স্থানে যে চাপ পড়ে তাহা 'জ' স্থানে এবং তথা হইতে 'চ' ও 'গ' স্থানে অনেক ন্যূন হইয়া যায়। আর 'ঝ' স্থানে যে চাপ পড়ে তাহাও ন্যূন হইয়া 'গথক' দণ্ডে কার্য্যকারী হয়। এইরূপে 'ছ' স্থানের চাপ কত ন্যূন হইয়া আসিয়াছে জানা থাকে। অতএব যে বলের দ্বারা যন্ত্রের সাম্যাবস্থা হয় তাহার পরিমাণ করিয়া তাহাকে তত বৃদ্ধি করিয়া লইলেই প্রকৃত পরিমাণ জানা যাইতে পারে।

বিমিশ্র দণ্ড-যন্ত্রের আর একটী ব্যবহার মুদ্রা যন্ত্রে দেখিতে পাওয়া



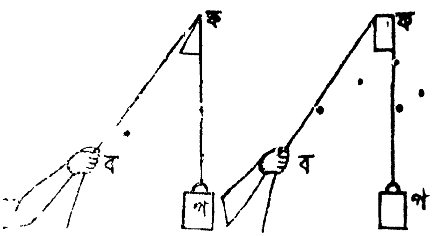
যায়। মুদ্রা-যন্ত্রে একেবারে অধিক চাপের আবশ্যক। অথচ ঐ যন্ত্র যত সংকীর্ণ স্থান ব্যাপক হয় ততই উত্তম।

'ক' নামক এক খানি কাষ্ঠ স্বস্থানে বদ্ধ আছে, উহা কোন দিকেই সরে না। ঐ কাষ্ঠ খণ্ডে 'খগ' নামক একটী দণ্ড কীলক দ্বারা এমত রূপে বদ্ধ আছে যে, তাহাকে 'গ' স্থান ধরিয়া টানিলে ঐ কীলকের উপর ঘুরিয়া আইসে। 'খগ' দণ্ডের মধ্য ভাগে 'ঘ' নামক আর একটী কীলক দ্বারা 'ঘচ' নামক আর একটী দণ্ড সংযুক্ত আছে, ঐ দণ্ডের অপর প্রান্তে 'চ' নামক কীলক দ্বারা একটা কঠিন এবং মসৃণ তাম্র বা লৌহ ফলক আছে। 'গ' স্থান ধরিয়া শরাভিমুখে আকর্ষণ করিলে 'ঘ' সম্মুখের দিকে ঋজুভাবে সরিয়া যায়, সুতরাং 'চঘ' দণ্ডক্রমশঃ লম্বামান হইয়া উঠিতে থাকে, তাহা হইলেই উহার চাপ উপরে 'ক'এর দিকে এবং নীচে 'চ'এর অভিমুখে হয়। কিন্তু 'ক' স্ব স্থানে বদ্ধ, সুতরাং কিছু মাত্র সরিতে পারে না, অতএব উহার প্রতিঘাতও 'চ'এর উপর লম্বরেখাক্রমে হয়। তাহাতে 'চ' স্থানে বদ্ধ যে ধাতু ফলক আছে, তাহা অত্যন্ত বলে নীচে সরিয়া যায়। উৎকৃষ্ট মুদ্রা-যন্ত্র সকলে এইরূপ মিশ্র দণ্ডের ব্যবহার হয়। ইহাতে যে কেমন শীঘ্র কত অধিক চাপ পড়ে তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে।

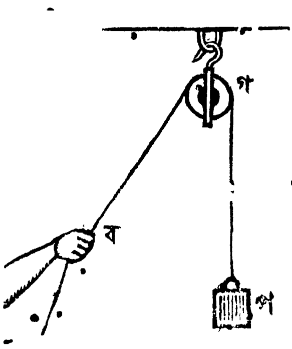
সপ্তম অধ্যায়।

[কপিকল—বদ্ধ-কপি—অবদ্ধ-কপি—কপি-সংহতি।]

যদি রজ্জু শৃঙ্খলাদি দ্রব্য সমুদায় সর্ব্বতোভাবে নম্য এবং ঘর্ষণ বিহীন হইত তবে এক্ষণে কপি-কলে যে প্রকার একটী একটী চক্র দেখা যায় তাহা দিবার প্রয়োজন হইত না। যে কোন প্রকার দ্রব্য হউক রজ্জ্বাদিকে তাহাতে বেড় দিয়া এক পার্শ্বে ধরিয়া টানিলেই অন্য পার্শ্বে টান পড়িত। অর্থাৎ তাহা হইলে 'ক'এর ন্যায় সূক্ষ্ম বা 'ক' এর ন্যায় স্থূল মুখ কাষ্ঠাদির উপর দিয়াও 'বপ' দড়ির যোগে বল

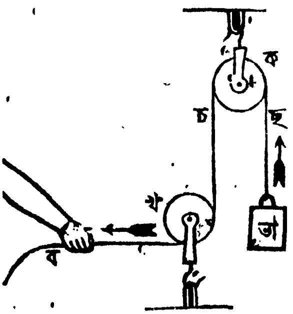


প্রয়োগ হইতে পারিত। কিন্তু বাস্তবিক কোন রজ্জুই সর্ব্বতোভাবে নম্য এবং মসৃণ নহে। সুতরাং কপি-যন্ত্রে ঘর্ষণাদি দোষ পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে রজ্জুকে এক এক খানি চাকার উপরে বেড় দিয়া রাখা যায়। তাহাতে কপি-যন্ত্রের আকার এইরূপ



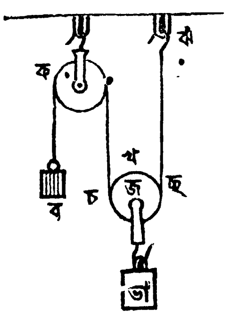
হয়। 'গ' নামক এক খানি ক্ষুদ্র চক্র, উহার ধারের মধ্যভাগ কিঞ্চিন্নত তাহাতে রজ্জু বসিয়া যায়। এবং 'ব' হইতে টান দিলে ঐ চক্র আপন কীলকের উপর বেগে ঘুরিতে থাকে; তাহাতে রজ্জুর উপর ঘর্ষণ অধিক হইতে পায় না।

কপি-যন্ত্র দ্বারা এক দিকে বল প্রয়োগ করিয়া অন্য কোন দিকে বল প্রয়োগ করিলে যে ফল হইত সেই ফল উৎপন্ন করা যাইতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, 'ক' 'খ' দুইটী কপির যোগে 'ব' সন্নিহিত শরের অভিমুখে হইতেছে, কিন্তু 'ভা' নামক ভা'র উন্নত হইয়া উঠিতেছে।



এই খানে কত বলে, কত ভার উঠিতেছে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, এইরূপ কপি কলের দ্বারা বল বা বেগ কিছুরই লাভ হয় না। যত বল দ্বারা 'ব' টানিবে 'চ' স্থানেও ঠিক তত বল পড়িবে, এবং 'ছ' স্থলেও সেই বল লাগিবে। আর যদি 'ব' এক হাত সরিয়া যায় তবে 'বচছ' দড়ির অপর প্রান্তও একহাত সরিবে। অতএব 'ভা'ও ঠিক সেই এক হাত উঠিবে। তবে এই প্রকার কপিকল ব্যবহার করিবার ফল এই যে, ইহা দ্বারা বল প্রয়োগের দিক পরিবর্ত্তন করিয়া অনেক কার্য্যের সুবিধা করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু ইহাও সামান্য উপকার নহে। কপিকল না থাকিলে 'ভা'কে উন্নত করিয়া তুলিবার নিমিত্ত 'ছক' রজ্জু দ্বারা উর্দ্ধ হইতে আকর্ষণ করিতে হইত। তাহাতে অনেক প্রকার বিঘ্নের সম্ভাবনা। আর সেইরূপে বলপ্রয়োগ করিতে পশ্বাদির সামর্থ নাই। কিন্তু কপিকল দ্বারা দড়ি যেরূপে সংস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে 'ব' স্থলে কোন অশ্ব বা বলীবর্দ্দকে নিযুক্ত করিয়া দিলেও অনায়াসে ভার উত্থিত হইতে পারে। এইরূপ কপি স্বস্থানে বদ্ধ থাকে। বল এবং

রের স্থানান্তর ঘটিলেও ইহার কোন দিকে গতি হয় না। এই জন্য
ার নাম বদ্ধ-কপি। আর এক প্রকার কপিকল আছে, তাহা ইহার
ায় বদ্ধ নহে এবং তৎকর্ত্তৃক বলের লাভ হইতে পারে। তাহা
ার্শ্ববর্ত্তী প্রতিকৃতির এক ভাগে দৃষ্ট হইবে। 'ক'টী বদ্ধ-কপি,

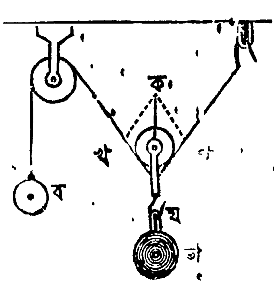


অতএব উহা কর্ত্তৃক বেগের বা বলের, কিছুই সাহায্য হইতেছে না। 'খ' কপিটী অবদ্ধ আছে। তদ্দ্বারা প্রযুক্ত বলের দ্বৈগুণ্য লাভ হইতেছে। কারণ ঐ 'খ' কপিটীকে একটী দণ্ড-যন্ত্র স্বরূপ বোধ করা যাইতে পারে। সেই দণ্ড-যন্ত্রের এক পার্শ্বে অর্থাৎ 'চ' স্থলে বল,
জ' স্থানে ভার এবং 'ছ' স্থানে অবলম্ব। সুতরাং কপির চক্রটী যতই
ছোট বা বড় হউক না কেন, উহা বৃত্তাকার হইলে "ছ" হইতে 'জ'
ত দূরে আছে 'চ' তাহার অবশ্যই দ্বিগুণ দূরে হইবে। তাহা হইলেই
ণ্ড-যন্ত্রের নিয়মানুসারে বলের লাভও দ্বিগুণ হইবে।

পরন্তু যেমন বলের লাভ দ্বিগুণ, তেমনি বেগের অপচয়ও দ্বিগুণ
য়। কারণ স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে 'ব' এক হাত নামিলে 'ভা' পূর্ণ
ক হাত ঊর্দ্ধে উঠিবে না; 'ছ' এর দিকের ½ হাত আর 'চ' এর
িকের ½ হাত এই দুইয়ে এক হাত দড়ি কমিবে। সুতরাং ভারের
ন্নতি অর্দ্ধহস্ত পরিমিত হইবে।

যদি কোন অবদ্ধকপি যন্ত্রে বল এবং ভারের সন্নিবেশ ঠিক পরস্পর
মান্তরাল না হয়, অর্থাৎ উহারা কোণাকোণী হইয়া টানে তাহা
ইলে বল ঠিক দ্বিগুণ লব্ধ হয় না। সেই স্থলে গতি সংঘাতের নিয়মা-

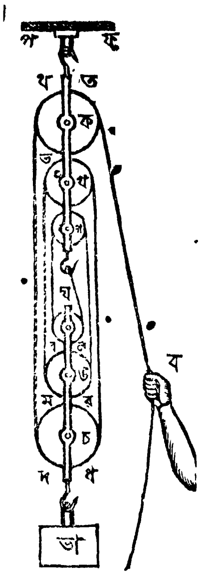
বলম্বন করিয়া একটী সমান্তরাল চতুর্ভুজ প্রস্তুত করত বলের এবং ভারের পরিমাণ করিতে হয়। নিম্নবর্ত্তী প্রতিকৃতিতে, যদি 'ব' /৪ সের হয় তবে 'ঘ' হইতে 'খ' স্থল পর্য্যন্ত ৪ ইঞ্চি বা অঙ্গুলি পরিমাণ করিয়া লও এবং 'ঘগ' এর দিকের টান ঘখ' এর দিকের সমান হয়



বলিয়া 'ঘগ'কেও ঐ ৪ ইঞ্চি বা অঙ্গুলি পরিমিত কর। তাহার পর 'কখগঘ নামক সমান্তরাল চতুর্ভুজ প্রস্তুত করিয়া; উহার 'ঘক' কর্ণরেখার পরিমাণ কর। সেই কর্ণরেখা যত অঙ্গুলী প্রমাণ; 'ভা' নামক ভারও তত সের হইলে ঈদৃশ কপি-যন্ত্র সাম্যাবস্থ থাকিবে।

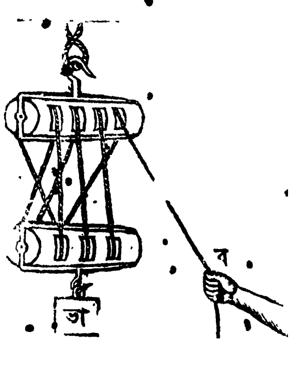
যদি ভার পরিমাণ জানা থাকে এবং কত বলে ঐ ভার সাম্যাবস্থ হইবে জানিবার প্রয়োজন হয়, তবে ঐ 'ভা' যত সের 'ঘ' হইতে ঊর্দ্ধদিকে তত অঙ্গুলি বা ইঞ্চি প্রমাণ একটী 'ঘক' রেখা পাত কর, পরে ঐ 'ক হইতে দুই দিকের দুই রজ্জুর সমান্তরাল করিয়া 'কখ' এবং 'কগ' নামক দুইটী রেখা টান, 'ঘখ' যত অঙ্গুলি বা ইঞ্চি হইবে বল তত সের হওয়া আবশ্যক।

একটী অবদ্ধ কপিতে যে রূপ বলের লাভ হয় বলাগিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলেই বোধ হইবে যে; একেবারে দুইটী তিনটী ঐরূপ কপির প্রয়োগ করিতে পারিলে ততোধিক বল লাভের সম্ভাবনা। এই জন্যই অনেক স্থলে কপি-সংহতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত কতিপয়ের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করা যাইতেছে।



'ক 'খ' 'গ' এই তিনটী কপিকে একত্রিত করিয়া যে কপি-সংহতি হইয়াছে তাহা 'পফ স্থানে বদ্ধ, আর 'ঘ 'ঙ 'চ নামক যে তিন-টীতে মিলিয়া আর একটী কপি-সংহতি হইয়াছে তাহা অবদ্ধ। বদ্ধ তিনটীও যেমন পরস্পরে সম্বদ্ধ হইয়া এক 'ফ্রেমের ভিতর ঘুরে অবদ্ধ তিনটীও সেইরূপ এক ফ্রেমের ভিতরে থাকিয়া ঘুরে।

বদ্ধ কপিতে বলের পূর্ব্বাবস্থাই রাখে; অতএব বল 'বত' রজ্জু ভাগেও যেরূপ আছে 'থদ' রজ্জু ভাগেও ঠিক সেইরূপ থাকে; কিন্তু 'ধ' স্থানে উহা দ্বিগুণ হয়; আবার 'ধ'য়েও যেরূপ 'ভম'তেও সেইরূপ থাকিয়া যায় কিন্তু 'র' স্থলে দ্বিগুণ হয়, আবার তাহাও 'ল' স্থানে দ্বিগুণ হয় এবং সেই বলেই ভার উঠে অতএব এইরূপ কপি-সংহতিতে যত গুলি অবদ্ধ কপি থাকে বল তত বার দ্বিগুণিত হয়। সুতরাং এই স্থলে গণিতের সঙ্কেতানুসারে ব×২×২×২=ভা, অথবা $ব \times ২^{৩} =$ 'ভা' সুতরাং যদি 'ব' /৪ সের হয়, তবে 'ভা' ৪×৮=৩২ সের হইবে।



এ স্থলেও উপরকার ৪টা কপি বদ্ধ এবং নীচের ৪টা অবদ্ধ। অতএব বলের এবং ভারের সাম্যাবস্থা পূর্ব্ব সূত্রানুসারে নিরূপিত হইতে পারে।

অর্থাৎ, ব×২×২×২+=ভা, অথবা $ব \times ২^{৪} =$ ভা; কপি যন্ত্রটী অতি

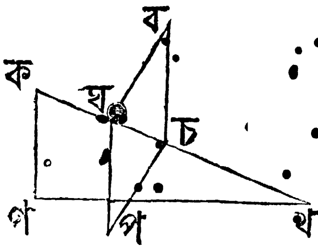
অল্প ব্যয়ে অল্প আয়াসে প্রস্তুত হয়, আর ইহা এতাদৃশ ভারী বা বৃহদাকার নহে যে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে বিশেষ কষ্ট হয়, এই সকল কারণে কপি কলের ব্যবহার সচরাচরই হইয়া থাকে। গৃহাদি নির্ম্মাণ কালে বৃহৎ, বৃহৎ কড়িকাট এই যন্ত্র দ্বারা উত্তোলিত হয়। জাহাজের পাইল বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত করিবার সময়ে কপির অত্যন্ত প্রয়োজন।

কিন্তু কপি দ্বারা যত বল লাভ হইবে গণনা করিয়া নির্দ্ধারিত করা যায়, কার্য্যে কখনই তত লাভ দেখিতে পাওয়া যায় না। তত কি? ঘর্ষণাদি নানা কারণে সমুদায় বলের প্রায় তিন ভাগ নিষ্ফল হইয়া যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

(ক্রম-নিম্ন ধরাতল।)

যখন একখানি তক্তা অথবা অন্য কোন সমতল দ্রব্যের উপর কেন ভারী বস্তু থাকে, তখন সেই দ্রব্য পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলে নিম্নগামী হইতে চাহে, কিন্তু উক্ত তক্তার প্রতিঘাত পাইয়া যাইতে পারে না সুতরাং উহার সাম্যাবস্থা থাকে; কিন্তু যদি ঐ তক্তার এক দিক ধরিয়া কিঞ্চিৎ উত্তোলন করা যায়, তাহা হইলে উহার প্রকৃতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইবে। তখন উহার ভার-মধ্য স্থলে পৃথিবীর যে আকর্ষণ পড়িতেছে তাহা পূর্ব্ববৎ লম্ব রেখাক্রমেই পড়ে কিন্তু তক্তার প্রতিঘাত ঠিক সেই রেখার প্রতিকূল মুখে হয় না। তখন (পর পৃষ্ঠার প্রতিকৃতিতে) আকর্ষণ 'ঘপ' অভিমুখে এবং প্রতিঘাত 'ঘব' অভিমুখে

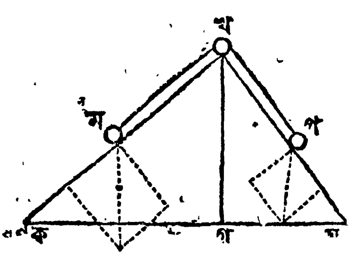


হইতে থাকিবে। সুতরাং এই দুই বলের দ্বারা 'ঘ' নামক দ্রব্যের 'ঘচ' রেখাক্রমে গতি জন্মিবে। এই স্থলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'ঘপ' যত বড় 'ঘচ' কদাপি তত বড় নয়। অতএব 'ঘ' এর নীচে কখ তক্তাটী না থাকিলে ঐ দ্রব্য যত বলে পড়িয়া যাইত, ঐ তক্তা থাকাতে উহা তত বলে পড়িতে পারে না। সুতরাং 'ঘ' যত ভারী তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প ভারী কোন দ্রব্য 'ঘক' রেখায় টানিলেই 'ঘ' স্বস্থানে থাকে। অর্থাৎ উহার 'ঘচ' অভিমুখে গতি নিবারিত হয়।

অতএব বোধ হইতেছে, কোন দ্রব্যকে ঐ তক্তার ন্যায় ক্রম-নিম্ন ধরাতলের উপর ঠেলিয়া তুলিতে অথবা উহার উপর হইতে যে দ্রব্য পড়িতেছে তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিতে অপেক্ষাকৃত অল্প বল লাগে; ইহার উদাহরণ অনেক স্থলে সর্ব্বদাই দৃষ্টিগোচর করা যাই-তেছে। যখন গাড়োয়ানেরা কিঞ্চিদুন্নত স্থানে গাড়ি তুলিবার চেষ্টা করে তখন সহজে না পারিলে যেখান দিয়া গাড়ির চাকা যাইবে সেই স্থানে তক্তা পাতিয়া দেয় তাহা করিলেই গাড়ি তুলিতে পারে। যখন আমরা কোন উচ্চস্থানে উঠিবার চেষ্টা করি, তখন একেবারে আপনাদিগের শরীরকে তত উন্নত করিতে পারিব না জানিয়া মইকে ঈষদ্বক্রভাবে রাখিয়া তদ্বারা উঠিতে থাকি। ঐ মই একটী ক্রম-নিম্ন-ধরাতলের কার্য্য করে। গরুর গাড়িতে বড় বড় পিপা তুলিবার সময় ঐ গাড়ির পশ্চাদ্দিক নত করিয়া দেয়, তাহাতে ঐ গাড়ি ক্রম-নিম্ন ধরাতল হয়। এবং উহাতে অনায়াসে অতি গুরু-ভার দ্রব্য সকল উত্তোলিত হইতে পারে।

ক্রম-নিম্ন ধরাতল যত অল্প উচ্চ, এবং অধিক দীর্ঘ হয় উহা দ্বারা ততই বলের লাভ হইতে পারে। পূর্ব্ব প্রতিকৃতিতে 'ঘচ' 'ঘপ' 'ঘব' এই তিনটী রেখা পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, 'ঘপ' 'কখ' এর সমান অর্দ্ধাংশ বা যে কোন ভাগ হবে 'ঘচ' ও 'কগ' এর সমান বা সেই সেই ভাগ হইবে। কিন্তু 'ঘপ' দ্রব্যের ভার স্থানীয়, 'ঘচ' উহার বল স্থানীয়। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, কখ: কগ=ভা: ব; অর্থাৎ যদি 'কখ'এর নাম দৈর্ঘ্য এবং তাহার সঙ্কেত 'দৈ' হয় আর 'কগ'এর নাম উচ্চতা এবং তাহার সঙ্কেত 'উ' হয় তবে দৈ×ব=উ×ভা।

এই নিয়ম স্মরণ করিয়া, কিরূপ ক্রম-নিম্ন ধরাতলে কত বলে কি পরিমাণ ভার সাম্যাবস্থ হয় তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। কোন ক্রম-নিম্ন ধরাতল ১২ হাত দীর্ঘ এবং ৪ হাত উচ্চ, তাহার উপরে ১৫ সের ভার সাম্যাবস্থ রাখিতে কত বলের আবশ্যক? এই স্থলে দেখা যাইতেছে যে, $১২ \times ব = ৪ \times ১৫, \therefore ব = \frac{৪ \times ১৫}{১২} = ৫$, অর্থাৎ ৫ সের বলের প্রয়োজন।



কোথাও কোথাও দুইটী ক্রম-নিম্ন ধরাতলের কার্য্য এক কালেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এই প্রতিকৃতিতে দৃষ্টি করিয়া দেখ; এই সকল স্থলে যেমন এক দিকে একটী ভার নামিতে থাকে; তেমনি অপর দিকের আর একটী ভার উঠিয়া আইসে। 'প' এবং 'ম'এর পরিমাণ কত হইলে উহাদিগের সাম্যাবস্থা হইবে তাহা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুযায়ী বিচার দ্বারা অনা-

য়াসে সিদ্ধ হয়। এই স্থলে 'ম'কে সাম্যাবস্থ করিতে $\frac{\text{খগ}}{\text{কখ}}\times \text{ম}$ এত বলের প্রয়োজন হয়। আবার 'প'কে সাম্যাবস্থ রাখিতে $\frac{\text{খগ}}{\text{ঘগ}}\times \text{প}$, এত বলের প্রয়োজন! অতএব $\frac{\text{ম}}{\text{কখ}}$ আর $\frac{\text{প}}{\text{ঘখ}}$ সমান হইলেই সাম্যাবস্থা হইবে। যদি 'ম' ১৬ সের 'কখ' ৪ হাত এবং 'ঘখ' ৮ হাত হয় তবে $\frac{১৬}{৪}=\frac{\text{প}}{৮}$ ∴ ৮×১৬=৪×প ∴ প=$\frac{৮\times১৬}{৪}$=৩২ সের, অর্থাৎ 'ম' ১৬ সের হইলে 'প' ৩২ সের হওয়া আবশ্যক।

যদি ক্রম-নিম্ন ধরাতলের উপর কোন ভারী দ্রব্য তুলিবার সময় বল ঐ ধরাতলের সমান্তরাল রেখাক্রমে প্রযুক্ত না হইয়া অন্য কোন দিকে বক্রভাবে প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে গতি-বিভাগের নিয়মানুসারে ঐ বলের ফল নিরূপণ করা আবশ্যক।

'গঘ' নামক ধরাতলের উপর 'ক' নামক একটী ভারী-দ্রব্য 'কখ' অভিমুখে তৎপরিমিত বল দ্বারা সাম্যাবস্থ হইয়া আছে এমত স্থলে একটী 'চকরখ' নামক সমান্তরাল চতুর্ভুজ কল্পনা করিয়া উক্ত 'কখ' বলকে 'কচ' ও 'কর' এই দুই ভাগে বিভক্ত করা গেল। ঐ দুয়ের মধ্যে 'কর' যে বল তাহা দ্বারাই দ্রব্যটী ক্রম-নিম্ন ধরাতলের উপর উত্থিত থাকিবে আর "কচ" বলের দ্বারা ঐ ধরাতলের উপর উহার যে ভার পড়িতেছিল, তাহার কতক ন্যূন হইবে।

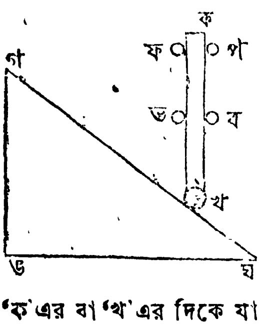
যদি 'কখ' বল নিম্নাভিমুখে অর্থাৎ 'খক' অভিমুখে প্রযুক্ত হয়,

তবে উহাকে ভাগ করিয়া 'রক' 'চক' এই দুইটী বলের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'রক' দ্বারা দ্রব্য নামে আর 'চক' দ্বারা উহা ঐ ধরাতলের উপর চাপিয়া বইসে।

নবম অধ্যায়।

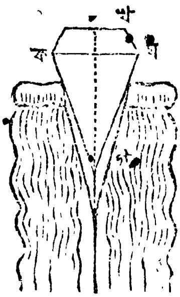
[কাজলা বা ক্লোন।]

যদি ক্রম-নিম্ন ধরাতলের উপর কোন দ্রব্যকে না তুলিয়া দ্রব্যটা স্বস্থানের তথা স্থির করিয়াই রাখা যায় এবং ধরাতলকে তাহার নীচে বল দ্বারা প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই ঐ ক্রম-নিম্ন ধরাতলের নাম কাজলা অথবা ছেনি হয়। এই প্রকার ক্রম-নিম্ন ধরাতল কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইলে কাজলা এবং ধাতু নির্ম্মিত হইলে ছেনি নামে অভিহিত হয়।



'কখ' একটী লৌহময় অর্গল; উহা 'প' 'ফ' 'ব' 'ভ' প্রভৃতি ইস্‌ক্রুপের দ্বারা দুই দিকে এমত বদ্ধ আছে যে উহা কদাপি ঐ দুই দিকে কিঞ্চিন্মাত্র সরিতে পারে না। কিন্তু উহার উর্দ্ধাধো গতির অর্থাৎ 'ক'এর বা 'খ'এর দিকে যাইবার কোন প্রতিবন্ধক নাই। এক্ষণে যদি 'গঘঙ' নামক একটা কাজলা লইয়া তাহার সূক্ষ্ম মুখের দিক্ অর্থাৎ 'ঘ'এর দিক্ ঐ অর্গলের নিম্নে প্রবিষ্ট করাইয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে অর্থাৎ 'গঙ'র উপর হাতুড়ির আঘাত করা যায়, তবে ঐ 'গঘঙ' ক্রমশঃ কখ'র নীচে প্রবিষ্ট হইতে থাকে সুতরাং 'খক' উন্নত হইয়া উঠে।

সচরাচর লোকে কাজলার আকার যেরূপ করিয়া থাকে তাহাতে দুইটী ক্রম-নিম্ন ধরাতল পরস্পর তলভাগে সংযুক্ত হইলে যেরূপ হয় ঠিক সেই রূপ দেখায়।



দেখ, এই 'কগঘ' নামক যে কাজলা সে কেবল 'কখগ' এবং 'ঘখগ' এই দুইটীর সংযোগে জন্মিয়াছে বোধ হয়।

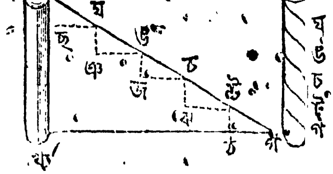
কাজলার ব্যবহার অনেক কর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায়। কাষ্ঠ চিরিতে কাজলা বসাইয়া চিরে; জাহাজ প্রভৃতি অতি গুরুভার দ্রব্য সমস্তকে উন্নত করিতে হইলে তাহাদিগের নীচে কাজলা প্রবিষ্ট করে; কঠিন ধাতু সকলকে কাটিতে ছেনির উপর আঘাত করিয়া কাটে। ফলতঃ কর্ত্তনের যত প্রকার উপায় আছে সকলই এই যন্ত্র-মূলের প্রকার ভেদ মাত্র। ছুরী, কাটারী কুঠার সূচী প্রেক প্রভৃতি যত যন্ত্র সকলেরই মুখ সূক্ষ্ম এবং ক্রমে স্থূল। উহারা সকলেই কাজলা। কার্য্য বিশেষে কাজলার মুখ-কোণ স্থূল বা সূক্ষ্ম করিতে হয়। যে সকল বাটালি দিয়া কাষ্ঠ কাটা যায় তাহাদিগের মুখ কোণ ৩০ ত্রিশ অংশ। লৌহ কাটিবার ছেনির মুখ ৫০ হইতে ৬০ অংশ পরিমিত হয়, যাহাতে পিত্তল কাটা যায় তাহাদিগের মুখ ৮০ হইতে ৯০ অংশ পর্য্যন্ত হয়। কাজলা-যন্ত্রের সাম্যাবস্থা কত বলে এবং কত ভারে হয় তাহা অদ্যাপি উত্তমরূপে নিরূপিত হয় নাই। এই যন্ত্রটীর চমৎকার প্রকৃতি এই যে; ইহার ব্যবহারে আঘাতরূপ বলই আবশ্যক হয়, অন্য প্রকারে প্রযুক্ত বল ইহার সর্ব্বস্থানে কার্য্যকারী হয় না। আরও ইহার বিশেষ গুণ এই যে, যত আঘাতে কার্য্য করিতেছে সেই আঘাতের বল নিরূপণ করিয়া ঐ বলের সমান চাপ দিলেও কাজলা পূর্ব্ব-

রূপ কার্য্য করে না। সুতরাং চাপকে যেরূপ সকল প্রকার বলের প্রতিনিধি বিবেচনা করিয়া অন্যান্যস্থলে পরিমাণ করিতে পারা যায় এই স্থলে তাহাও পারা যায় না। এই জন্য এই যন্ত্রের সাম্যাবস্থা নিরূপণ করা অতি দুর্ঘট হইয়াছে। উহা অদ্যাপি কেহ নিশ্চিত করিতে পারেন নাই। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, কুঠার দ্বারা কাষ্ঠ বিদীর্ণ হয় এস্থলে বোধ কর যেন কোন কুঠার দশ সের ভারী আর তাহা প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ হাত স্থান নামিতে পারে তাদৃশ বেগে প্রযুক্ত হইয়া কাষ্ঠের ভিতর ½ হাত বসিয়া যায়। তবে ঐ কুঠারের বল ঠিক ৫০×১০=৫০০ সের বা ১২½ মণ। কিন্তু যদি ঐ কুঠারকে কাষ্ঠের উপর বসাইয়া তাহার উপরি ১২½ মণ ভারী কোন দ্রব্যকে ১হাত ঊর্দ্ধ হইতে চাপাইয়া দেওয়া যায় তাহাতে উক্ত কুঠার কখনই ½ হাত প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা যে কি জন্য পারে না তাহা বলা অতি কঠিন। কিন্তু এ স্থলে যে চাপ আঘাত-বলের প্রতিনিধি হইতে পারে না তাহা স্পষ্টই দেখাইতেছে।

দশম অধ্যায়

(স্ক্রু যন্ত্র।)

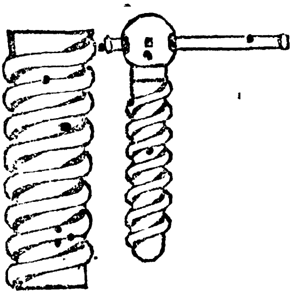
(স্ক্রু যন্ত্রও ক্রম নিম্ন ধরাতলের প্রকার ভেদ মাত্র।)



'কখ' নামক স্তম্ভাকার কাষ্ঠ দণ্ডে 'কখগ' নামক কাগজ নির্ম্মিত একটী সমকোণ ত্রিভুজের 'কখ' দিক আঁটা দিয়া যুড়িয়া দেও। তাহার পর ঐ কাগজখানিকে

'কখ'এর গায়ে যড়াইয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, উহা ঠিক্ পার্শ্ব-বর্ত্তী অপর প্রকৃতির ন্যায় হইয়াছে। উহাই স্ক্রু যন্ত্রের প্রতিরূপ। এই স্থলে দেখা যাইতেছে যে, সমুদায় কাগজ নির্ম্মিত ধরাতলটা সমান পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া স্তম্ভের গাত্রে পাঁচটী সূত্রাকারে পরিণত হইয়াছে। সেই সূত্রের এক এক পাক 'কখ' 'ঘঙ' 'ঙচ 'চট' ইহারা সকলেই পরস্পর সমান, আর সেই সূত্রদিগের পরস্পর দূরত্ব 'কছ' বা 'ঘঞ' অথবা 'ঙজ' কিম্বা 'চঝ' ইহারাও পরস্পর সমান। অতএব এতাদৃশ যন্ত্রে এক এক পাক ঘুরিয়া যাইলে বাস্তবিক 'কঘ' প্রভৃতি স্থান মাত্র উন্নত হওয়া যায়। অতএব ক্রম নিম্ন ধরাতলে যেমন দৈর্ঘ্যকে বল দ্বারা, এবং উচ্চতাকে ভার দ্বারা পূরণ করিয়া গুণ-ফল সমান হইলেই সাম্যাবস্থা নিরূপিত হয়, এই স্থলেও অবশ্য সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ সূত্র-দূরত্বকে ভার দিয়া গুণ, আর সূত্রের বেষ্টনকে বল দ্বারা পূরণ করিয়া ঐ দুই গুণ-ফল সমান হইলেই স্ক্রু-যন্ত্রের সাম্যাবস্থা অবধারিত হইবে।

পরন্তু স্ক্রু-যন্ত্রের ব্যবহারে প্রায়ই উহার সহিত একটী দণ্ড যন্ত্রের সংযোগ থাকে, তাহা হইলে বলের আরও লাভ হয়। ঐ দণ্ড যন্ত্রের ঘুরণে যে পরিধি জন্মে সেই পরিধি-



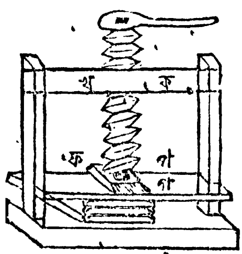
পরিমাণ দ্বারা বল গুণিত হয় আর সূত্র-দূরত্ব দ্বারা ভার গুণিত হয়। সুতরাং দণ্ড-যন্ত্রকে যত বড় করা যাইবে আর সূত্র দূরত্বকে যত অল্প করা যাইবে এই যন্ত্র দ্বারা ততই বলের লাভ হইতে পারে।

পরন্তু কার্য্যকালে এইরূপ হইয়া উঠে না। কারণ দণ্ড-যন্ত্রকে অধিক দীর্ঘ করিতে গেলে তাহাকে সচল করা দুষ্কর হয় আর স্ক্র

সূত্রদিগকে অধিক সূক্ষ্ম না করিলে পরস্পর নিকটবর্ত্তী করা যায় না। কিন্তু অধিক সূক্ষ্ম করিতে গেলেই ঐ সূত্রগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সুতরাং অল্প চাপ পড়িলেই ভাঙ্গিয়া যায়।

স্ক্রুর ব্যবহারে প্রায়ই দুইটী স্ক্রুর ব্যবহার হয়। তন্মধ্যে একটীর সূত্র স্ক্রুর উপরিভাগে কাটা থাকে, আর একটী ঠিক তাহার বিপরীত রূপ হয়। সেই দ্বিতীয় স্ক্রুর নাম আবরণ স্ক্রু। ঐ আবরণ স্ক্রু শূন্য-গর্ভ এবং তাহার সূত্র সকল ভিতরের দিকে থাকে। উহার যে স্থান উচ্চ প্রকৃত স্ক্রুর সেই স্থান খাত। এইরূপে উহারা পরস্পর কামড়াইয়া বইসে। কোন কাষ্ঠে স্ক্রু বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তুলিয়া লইলে ঐ কাষ্ঠ-ছিদ্রে ঠিক স্ক্রুর দাগ পড়িয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দাগ যেমন দেখায় আবরণ স্ক্রুর ভিতরে অবিকল ঐরূপ সূত্র কাটা থাকে।

স্ক্রু প্রয়োগের প্রথা নানাপ্রকার। কোথাও আবরণটী স্থির থাকে প্রকৃত স্ক্রুটী তাহার ভিতর দিয়া যায়, কোথাও বা প্রকৃত স্ক্রু ঘুরে না কিন্তু আবরণটীকে ঘুরাইলেই উহা নামিতে উঠিতে পারে। এই, উভয়বিধ স্ক্রুর নিম্ন ভাগে প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইতেছে। ইহার 'কখ'

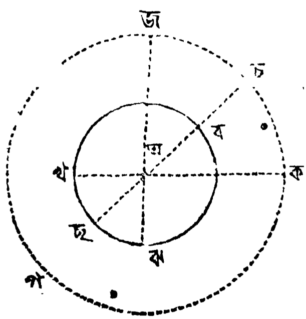


স্থানে আবরণ স্ক্রু আছে। ঐ স্থান সরে না, কিন্তু দণ্ড-যন্ত্র দ্বারা স্ক্রুতে পাক দিলে উহা স্বয়ং নামিয়া আইসে, সুতরাং ঐ স্ক্রুর মুখস্থিত 'পফ' ফলকের নিম্নস্থিত তাবৎ বস্তুতে চাপ পড়ে।

একাদশ অধ্যায়।

[অক্ষ-চক্র—বিষম-অক্ষ—নিক্ষনী—দন্তুর চক্র—মুকুট দন্তুর—পার্শ্ব দন্তুর—সবল-দন্তুর—ধাবক দন্তুর।]

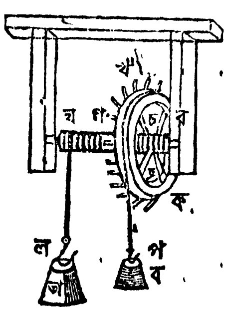
দণ্ড-যন্ত্র অবলম্বের উপর ঘুরে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং দণ্ড-যন্ত্রের প্রয়োগ কালীন তাহার দীর্ঘ ভুজ দ্বারা একটী বৃহদ্বৃত্ত, এবং ক্ষুদ্র ভুজের দ্বারা একটী অপেক্ষা-কৃত ক্ষুদ্র বৃত্ত জন্মে। ঐ দুই বৃত্ত চিত্রিত করিলে, কিরূপ হয় নিম্নে তাহার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। এই স্থলে বোধ হইতেছে যে, 'খক' দণ্ড 'অ'এর উপর ঘুরিয়া কখন 'ছচ' এবং কখন 'ঝজ' ইত্যাকারে 'অ'এর চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইয়াছিল। আর 'ক' স্থানে বল প্রয়োগ করাতে ভার এবং বলের যে সম্বন্ধ ছিল, যখন ঐ 'ক' 'চ' স্থানে



এবং 'খ' 'ছ' স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল; তথনও সেই সম্বন্ধের কিছু মাত্র অন্যথা হয় নাই। অতএব যদি 'খক' একটী মাত্র দণ্ড না থাকিয়া 'অ' নামক অবলম্বের উপর 'খক'এর সমান যথা, 'চছ' 'ঝজ' প্রভৃতি অনেক গুলি দণ্ড থাকে, এবং বল প্রয়োগ কালীন তাহার কখন একটীকে কখন অপরটীকে, ধরিয়া বল প্রযুক্ত করা যায় তাহা হইলেও ফলের অন্যথা হইতে পারেনা।

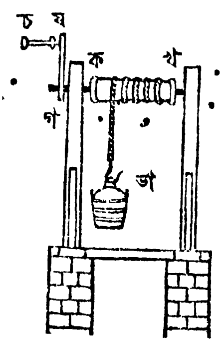
এই প্রকার যন্ত্রের নাম অক্ষ-চক্র। এই স্থলে দীর্ঘ ভুজের দ্বারা যে বৃত্ত জন্মে তাহাই চক্র, যথা 'কচজপ' এবং ক্ষুদ্র ভুজের দ্বারা যে

বৃত্ত জন্মে তাহাই অক্ষ; যথা 'খছবাব'। এই যন্ত্রের সাম্যাবস্থা নিরূপণ করিতে হইলে দীর্ঘ ভুজ বা চক্রের ব্যাসার্দ্ধ লইয়া বলের সহিত গুণ করিতে হয়, আর ক্ষুদ্র ভুজ বা অক্ষের ব্যাসার্দ্ধ লইয়া ভারের সহিত পূরণ করিতে হয়। ঐ দুইগুণ-ফল সমান হইলেই যন্ত্রের সাম্যাবস্থা জানা যায়। যেমন দণ্ড-যন্ত্রকে বলমধ্যক করিলে বলের ক্ষতি হইয়া বেগের লাভ হয়, আর ভার-মধ্যক করিলে তাহার বিপরীত ঘটে, অর্থাৎ বেগের ক্ষতি হইয়া বলের লাভ হয়, এই যন্ত্রেও অবিকল সেইরূপ ঘটে। অক্ষে বল এবং চক্রে ভার থাকিলে বেগের লাভ আর চক্রে বল এবং অক্ষে ভার থাকিলে বলের লাভ হয়।

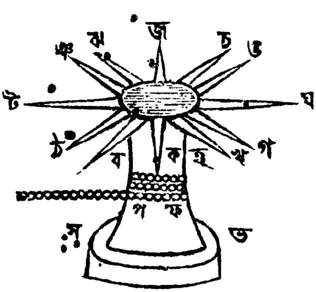


এই একটী অক্ষ-চক্র যন্ত্রের প্রতিকৃতি। 'কখগ' নামক চক্রের এক স্থানে এক গাছি রজ্জুর এক দিক জড়াইয়া বদ্ধ আছে। সেই রজ্জুর অন্য প্রান্ত 'প' নামক স্থান হইতে বল প্রদত্ত হয়। 'গঘল' নামক অপর এক গাছি রজ্জু 'ঘগচ' নামক অক্ষেতে 'বখর' রজ্জুর বিপরীত ভাবে জড়ান আছে; অতএব ঐ রজ্জু দ্বারা 'ভা' নামক ভার ঝুলিতেছে তাহা যদি যন্ত্রের বাম পার্শ্বে থাকে তবে চক্রবদ্ধ 'বখর' রজ্জু 'ব' নামক বল সমেত যন্ত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে ঝুলিবে। এইরূপ হইলে যখন 'ব' আপন ভারে নামিবে তখন চক্র 'খগছ' অভিমুখে ঘুরিবে, অক্ষও ঐ চক্রের সহিত ঘুরিবে, সুতরাং 'ঘল' রজ্জু তাহাতে গুটাইয়া যাইবে এবং তাহা হইলেই 'ভা' উঠিতে থাকিবে। যদি এই স্থলে চক্রের ব্যাসার্দ্ধ ২ হাত এবং অক্ষের আধহাত এবং বলের পরিমাণ/৪ সের হয় তবে ভার (২×৪ ÷ ½)=১৬ সের হইবে। এস্থলে যদি 'ব' কত নামিল

এবং 'ভা' কত উঠিল ইহা পরিমাণ করিতে হয়, তবে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, 'ব'য়ের দড়ি ৪ হাত খুলিয়া আসিলে 'ভা'য়ের দড়ি ১ হাত মাত্র গুটাইবে। অতএব দেখ যেমন বলে চতুর্গুণ লাভ হইতেছে তেমনি বেগ চারি ভাগ মাত্র পাওয়া যাইতেছে।

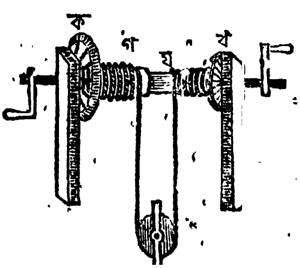


ইটীও একটী অক্ষ-চক্র যন্ত্রের প্রতিকৃতি। 'ঘচ' নামক দণ্ড ধরিয়া ঘুরাইলে 'গঘ' দণ্ডটা ঘুরিতে থাকে, তদ্দ্বারা 'কখ'ও ঐ ঘূর্ণনাভিমুখে ভ্রামিত হয়, সুতরাং যদি 'ভা' নামক ভারে বদ্ধ রজ্জু 'কখ' অক্ষে জড়ান থাকিয়া ঘূর্ণনের বিপরীত দিক্ হইতে লম্বমান থাকে তাহা হইলে ঐ রজ্জু অক্ষে জড়াইয়া 'ভা' উন্নত হইয়া উঠে। এই যন্ত্রে চক্র দৃষ্ট হইতেছে না বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া বুঝিলে 'গঘ' দণ্ডকেই 'চক্রের ব্যাসার্দ্ধ স্থানীয় বলিয়া বোধ হইবে। অতএব যদি 'গঘ' ২ হাত, অক্ষের ব্যাসার্দ্ধ ½ হাত এবং বলের পরিমাণ /৪ সের বলিয়া অবধারিত হয়, তবে ভার (২×৪) ÷ ½ = ১৬ হইবে।



জাহাজের উপর এবং যে ঘাটে জাহাজ লাগায় এমন ঘাটে, এই প্রকার অক্ষ-চক্র থাকে উহার মাথার চারি দিকে 'ক' 'খ' 'চ' 'ঝ' প্রভৃতি দণ্ড সকল আছে। এক এক জন লোক উহার এক একটী দণ্ড ধরিয়া পাক দিলেই 'বলভহ' নামক অক্ষ ঘুরিতে থাকে। সুতরাং তাহাতে 'ফপ' নামক যে রজ্জু জড়ান থাকে তাহাও বিপরীত দিকে

ঘাটের কাছে আসিয়া থাকে। এই যন্ত্রের ইংরাজী নাম "কাপ-ষ্টান" শব্দের অপভ্রংশে এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকে উহাকে 'কাপ্তান' বলে। এই যন্ত্রে কত বলে কতভার সাম্যাবস্থ হয় বিবেচনা করিতে হইলে যত গুলি লোকে যত বল দিয়া দণ্ড সকলে পাক দেয় তাহার সমষ্টি লইতে হয়। যদি কোন কাপ্তান-যন্ত্রের দণ্ড ৪ হাত পরিমিত হয় ও তাহার মধ্যস্থলের অর্থাৎ অক্ষের ব্যাসার্দ্ধ $\frac{1}{2}$ হাত হয় আর তাহাকে ৫ জনে, প্রতি ব্যক্তি ৬ মণ পরিমিত বল দিয়া ঘুরাইয়া থাকে, তবে বলের পরিমাণ ৫×৬=৩০ মণ অবধারিত হইল। সুতরাং ভার (৩০×৪) ÷ $\frac{1}{2}$=২৪০মণ হইবে। ঘুড়ি উড়াইবার লাটাই, সূত্র গুটাইবার চরকি, এ সমুদায়ও অক্ষ চক্র যন্ত্র। উহাদিগের বাঁট অক্ষ এবং পেট চক্র। চরকাও একটী অক্ষ-চক্রের উদাহরণ স্থল। চরকার কাণ্ড চক্রের কার্য্য করে, উহার ব্যাস সেই চক্রের অক্ষ হয় ঐ অক্ষ ঘুরিলে পাখি সমেত হাঁড়ি ঘুরে, সেই হাঁড়িও বাস্তবিক একটী চক্র মাত্র। পূর্ব্বে যাহা যাহা কথিত হইল তদ্দ্বারা অবশ্য বোধ হইয়া থাকিবে যে, এই যন্ত্রে চক্রকে যত বড় এবং অক্ষকে যত সরু করা যায়, ততই বেগের ক্ষতি, ও বলের লাভ হয়। কিন্তু চক্র নিতান্ত বৃহৎ হইয়া উঠিলে উহা হইয়া কোন কার্য্যই করা যায় না আর অক্ষও নিতান্ত সূক্ষ্ম হইলে কিছুমাত্র ভার সহিতে পারে না, অর্থাৎ অত্যল্প মাত্র ভারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই বৈষম্য নিবারণার্থে একটী অতি সুন্দর উপায় অবধারিত হইয়াছে।



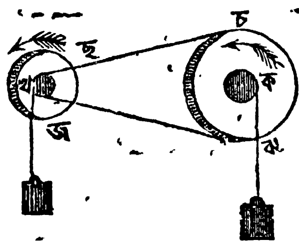
'কখ' অক্ষের এক ভাগ 'কগ' কে স্থূল করিতে হয় এবং অপরভাগ 'ঘখ' কে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম করিতে হয়। এইরূপ করিয়া একগাছি দড়ি এমত রূপে জড়াইয়া দিতে হয় যে, তাহার

থাকিলে 'খঘ' হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খুলিয়া আইসে। এক্ষণে দেখ ঘুরিবার সময়ে সমুদায় অক্ষে একেবারে পাক লাগিবে, কিন্তু সেই এক পাকে 'কগ'য়ে যত দড়ি জড়াইয়া যাইবে, 'কখ' হইতে কদাপি তত খুলিবে না; সুতরাং কপি-বদ্ধ ভার কিঞ্চিৎ উন্নত হইবে। ফলতঃ 'কগ' ভাগের পরিধি-পরিমাণ ঐ ভারের উন্নতি, আর 'কখ' য়ের পরিধি-প্রমাণ উহার অবনতি হইতে থাকিবে। অতএব 'কগ' ভাগের ব্যাসার্দ্ধ পরিমাণ বিযুক্ত করিলে যে সংখ্যা হয় সেই পরিমাণ ব্যাসার্দ্ধ একটী অক্ষ ব্যবহারের যে ফল, আর এই বিষমাক্ষ ব্যবহার করাতেও ঠিক্ সেই ফল হইবে। অথচ সেই অক্ষকে অধিক সরু করিয়া অশক্ত করিতে হয় নাই।

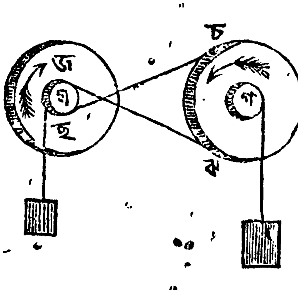
যেমন অনেকগুলি দণ্ড-যন্ত্রকে একত্রিত করিয়া মিশ্র-দণ্ড-যন্ত্র প্রস্তুত করা যায় এবং তাহা করিলে অনেক প্রকার কার্য্যের সুবিধা হয়, সেইরূপ অনেকগুলি অক্ষ-চক্রের মিলনে মিশ্র-অক্ষ-চক্র জন্মে, তাহার দ্বারাও কার্য্যের যথেষ্ট সৌকর্য্য ঘটিয়া থাকে। বিশেষ এই যে, দণ্ড-যন্ত্রের দ্বারা একেবারে অতি শীঘ্র অতি প্রবলতর চাপ পড়ে, মিশ্র-অক্ষ-চক্র দ্বারা বহুক্ষণ ধরিয়া সমভাবে বল প্রয়োগ হয়, কিন্তু সেই বলের পরিমাণ করিবার নিয়ম মিশ্র-দণ্ড-যন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র নহে। অর্থাৎ যতগুলি চক্র থাকে, তাহাদিগের ব্যাসার্দ্ধ সমস্তের গুণ-ফলকে বল দ্বারা পূরণ করিয়া এবং যতগুলি অক্ষ থাকে, তাহাদিগেরও ব্যাসার্দ্ধ সমস্তের গুণ-ফলকে ভার দ্বারা পূরণ করিয়া ঐ দুই পূরণ-ফল সমান হইলেই যন্ত্রের সাম্যাবস্থা জানা যায়। মিশ্র-অক্ষ-চক্র প্রস্তুত করিবার নানাবিধ উপায় আছে। তন্মধ্যে একটীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

একটী চক্র ঘুরিতেছে, যদি এক গাছি দীর্ঘ রজ্জু বা চর্ম্ম, অথবা শৃঙ্খল ঐ চক্রের গাত্রে বেষ্টিত করিয়া আর একটা চক্রের অক্ষে পরিবেষ্টিত করিয়া বন্ধন করা যায়, তাহা হইলে ঐ দ্বিতীয় চক্রও

ঘুরিতে আরম্ভ করে। চরকার টক্রু যে প্রকারে ঘুরে তাহা বিবেচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট বোধ হইতে পারিবে। চরকার হাঁড়ি ঘুরে এবং সেই হাঁড়িকে বেষ্টন করিয়া এক গাছি তাঁইত টক্রুতে পরিবেষ্টিত হয়, সেই যোগেই টক্রুর ভ্রমণ হইতে থাকে। এইরূপে যে রজ্জ্বাদি ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম 'বন্ধনী'। বন্ধনী সরলভাবে দেওয়া যায়, এবং ফের দিয়াও দেওয়া যায়। সরলভাবে বন্ধনী পরিহিত করাইলে উভয় চক্রের গতি এক দিকে হয়, ফের দিয়া দিলে চক্রদ্বয় পরস্পর বিপরীত মুখে চলে।



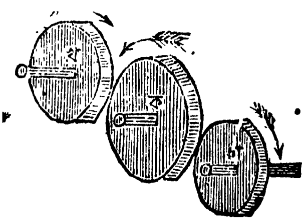
'ক' এবং 'খ' নামক দুই চক্র 'চছজঝ' নামক একটী সরল-বন্ধনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে। যদি 'ক' নামক চক্রের গতি উহার অন্তর্গত শরাভিমুখে হইতে থাকে তবে 'খ' চক্রও তৎসন্নিহিত শরাভিমুখে গমন করিবে। সুতরাং উহাদিগের উভয়ের গতি এক দিকেই হইবে।



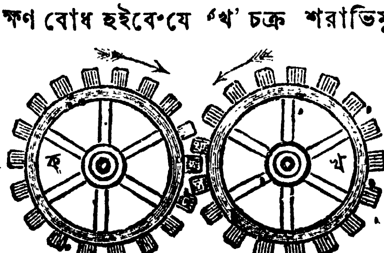
কিন্তু 'গ' 'ঘ' নামক যে এই অপর দুই চক্র বিপর্য্যস্ত-বন্ধনী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছে তাহাদিগের গতি পরস্পর বিপরীত দিকে স্ব স্ব শরাভিমুখে হয়। বন্ধনী দ্বারা অতি দূরে হইতেও গতিসংক্রমণ হইয়া থাকে। কোন যন্ত্রালয়ের ছাদের নিকট যদি একটী চক্র বা অক্ষ-দণ্ড ঘুরিতে থাকে, বন্ধনী যোগে সেই গৃহের নীচের চক্রকেও তদ্দ্বারা ঘূর্ণিত করিতে পারা যায়—প্রাচীরাদিতে

ছিদ্র করিয়া এক ঘর হইতে অন্য ঘরেও ঐ গতি সংক্রামিত করা যায়—আর বন্ধনী সংযোগের প্রকার ভেদ করিলে এক প্রকার গতি হইতে নানাপ্রকারের গতি উৎপাদন করা যায়।

কিন্তু যেখানে অল্প স্থানের মধ্যেই কার্য্য সম্পন্ন করা আবশ্যক হয়, সে স্থলে বন্ধনীর ব্যবহার হইতে পারে না। তথায় কার্য্য বুঝিয়া—চক্রের প্রকার ভেদ করিতে হয়। যদি অধিক বলের আবশ্যকতা না থাকে তাহা হইলে চক্র গুলির ধার চর্ম্মাবৃত করিয়া গায়ে লাগাইয়া রাখিলেই একটী ঘুরিলে সকল গুলি ঘুরে চর্ম্ম দ্বারা আবৃত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, চর্ম্মে চর্ম্মে ঘর্ষণ হয়, ঘর্ষণ না হইলে কেবলমাত্র গায়ে ঠেকিয়া থাকিলেই একটী ঘুরিলে সকল চক্রগুলি ঘুরিতে পারে না। সূতার কলে এইরূপ করে। তাহার প্রতিকৃতি এই। 'ক' একটী বৃহৎ চক্র। উহার পার্শ্ব চর্ম্মে মোড়া। উহা ঘুরিলেই উহার পার্শ্বে যে, 'গ' 'খ' প্রভৃতি চক্র থাকে তাহারাও ঘুরে। ঐ সকল চক্রের মধ্য ভাগে এক একটী টকু থাকে। তদ্দ্বারা সূত্র প্রস্তুত হয়।



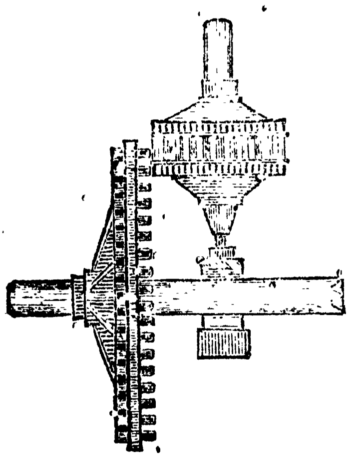
কিন্তু গতি সংক্রমণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ উপায় দন্তুর-চক্র। এক প্রকার দন্তুর-চক্রের প্রতিকৃতিই এই। এই প্রতিকৃতি দর্শনে বিলক্ষণ বোধ হইবে যে 'খ' চক্র শরাভিমুখে ঘুরিলে উহার 'প' দন্ত 'ক' চক্রের 'চ' দন্তকে নীচে ঠেলিয়া দিবে তাহার পর ক্ষণেই আবার 'ফ' আসিয়া 'ছ'কে ঠেলিয়া দিবে,



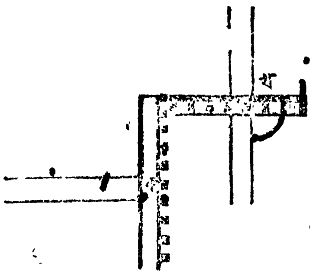
এবং ক্রমাগত এইরূপ

হওয়াতে 'ক' চক্রটীও নিজ শূরাভিমুখে ভ্রামিত হইবে। দন্তগুলির আকার এমত করা আবশ্যক যেম পরস্পর ঘর্ষণে ভগ্ন বা শীঘ্র ক্ষয় হইয়া না যায়। এই জন্য অধিক স্থলেই দন্তের আকার এমত করা যায় যেন, তাহারা পরস্পরে অধিক ঘর্ষণ না করিয়া গাড়ির চাকা রাস্তার উপর দিয়া যেরূপ গড়াইয়া যায়, সেইরূপ উপরে উপরে গড়াইয়া পড়ে।

কিন্তু ঐ প্রতিকৃতিতে চক্রদ্বয়ের দন্তগুলি যে প্রকার তাহা দেখিলেই বোধ হইবে যে, উহারা উভয়ে এক সমতলে থাকিলেই পরস্পর যোগে ঘূর্ণিত হইতে পারে। অর্থাৎ যদি ঐ দুই চক্র, গাড়ির চাকা যেমন খাড়া হইয়া থাকে, সেই প্রকার, অথবা কুম্ভকারের চক্র যেমন



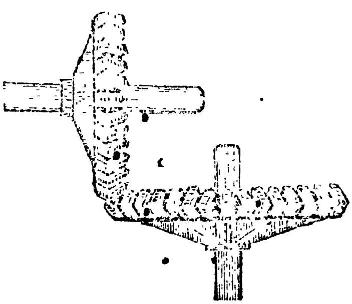
শুইয়া থাকে সেইরূপে, পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া সন্নিবেশিত হয় তাহা হইলেই ঐরূপ দন্তুর চক্রের কার্য্য হইতে পারে। কিন্তু যদি একখানি চক্রকে গাড়ির চাকার ন্যায় অর্থাৎ লম্ব ভাবে, এবং অপর চক্রকে কুমারের চক্রের ন্যায়, অর্থাৎ সমতলে ঘূর্ণিত করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রকার চক্র দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। তজ্জন্য যে প্রকার দন্তুর চক্রের প্রয়োজন তাহার নাম মুকুট-দন্তুর। তাহার



প্রতিকৃতি এই। 'ক' নামক চক্র মুকুট দন্তুর, 'খ' সামান্য দন্তুর। 'ক' গাড়ির চাকার ন্যায় লম্বমানে ঘুরিতেছে। তাহার দন্ত যোগে 'খ' নামক চক্র কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় সমতলে ঘূর্ণিত হইতেছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী দুই প্রতিকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ঘটী-যন্ত্রের ভিতর মুকুট-চক্র কিরূপ চক্রকে সমতলে ভ্রামিত করে তাহা স্পষ্ট অনুভূত হইবে।

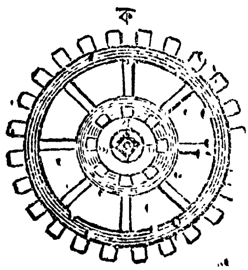
কিন্তু যেখানে ঠিক লম্বমান ঘূর্ণিত কোন চক্র দ্বারা ঠিক সমতলে ঘূর্ণিত চক্রের গতি উৎপাদন করিতে না হয়, প্রত্যুত ঐ চক্রদ্বয় পরস্পর তির্য্যক্ ভাবে থাকে তথায় মুকুট-চক্রেও কোন কার্য্য হয় না। সেই স্থলে চক্রদ্বয়ের দন্ত গুলিও উচিতরূপে বক্র করিয়া গঠন করিতে হয়। তাদৃশ চক্র সকলের নাম 'বক্র-দন্তুর'। পার্শ্ব ভাগে তাহার একটী প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। বাষ্পীয় যন্ত্রে এইরূপ পুষ্পাকার চক্র দেখিতে পাওয়া যায়।



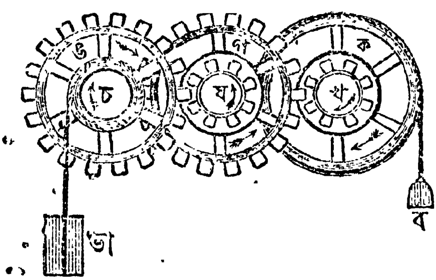
এইরূপে চক্র সকল নানাবিধ হয়, এবং সেই বিবিধ প্রকার চক্র গতিকে বিবিধ প্রকারে সংক্রামিত করিয়া অশেষ প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

যদি চক্রের অক্ষটী দন্তুর হয়, তাহা হইলে উহার নাম পরিবর্ত্তিত

হইয়া যায়। 'দন্তুর-অক্ষকে' অক্ষ না বলিয়া 'পক্ষ' বলা গিয়া থাকে, এবং তাহার দন্ত সমস্তকে দন্ত না বলিয়া 'পত্র' বলা যায়। 'ক' দন্তুর



চক্র, 'খ' উহার 'পক্ষ' এবং 'চ' 'ছ' প্রভৃতি সেই পক্ষের 'পত্র'। দন্তুর চক্র এবং পক্ষাদি সংযোগে ভার এবং সাম্যাবস্থা কিরূপ নিরূপিত হয় এক্ষণে কথিত হইতেছে। পরবর্ত্তী প্রতিকৃতিতে 'ক' নামক চক্রের 'খ' পক্ষে 'গ' দন্তুর চক্র সংলগ্ন হইয়াছে, আবার সেই 'গ' এর 'ঘ' নামক পক্ষে 'ঙ' নামক দন্তুর চক্র লগ্ন রহিয়াছে। সেই 'ঙ'র 'চ' নামক অক্ষে রজ্জুবদ্ধ 'ভা' নামক ভার ঝুলিতেছে। যদি 'ক' এর ব্যাসার্দ্ধ ২ হাত, 'গ'এর ব্যাসার্দ্ধ



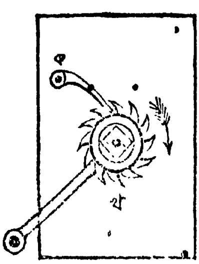
৩ হাত, 'ঙ'এর ব্যাসার্দ্ধ ৪ হাত, 'খ'এর ব্যাসার্দ্ধ $\frac{১}{২}$ হাত, 'ঘ'এর ব্যাসার্দ্ধ $\frac{১}{৩}$ হাত, 'চ'এর ব্যাসার্দ্ধ $\frac{১}{৪}$ হাত হয়, আর 'ব' /৪ সের থাকে, তবে $২\times৩\times৪\times\text{ব}=\frac{১}{২}\times\frac{১}{৩}\times\frac{১}{৪}\times\text{ভা}\;\therefore\;২৪\times\text{ব}=\frac{১}{২৪}\times\text{ভা}\;\therefore\;২৪\times২৪\text{ব}=\text{ভা}$, অথবা $২৪\times২৪\times৪$ সের $=$ ভা, $\therefore$ ভা $=২৩০৪$ সের, বা ৫৭॥৪।

কিন্তু যদিও এইরূপ পরিমাণ মিথ্যা নয় বটে, তথাপি দন্তুর চক্রের বল নিরূপণ করিতে হইলে যেখানে অক্ষ এবং চক্র উভয় দন্তুর হয় তথায় উহাদিগের দন্ত-সংখ্যা লইয়া বিবেচনা করাই নিয়ম। তাহার কারণ, যাহার যেমন পরিধি তাহার দন্ত সংখ্যাও অবশ্য তদনুযায়ী হয়, অর্থাৎ ৪ হাত ব্যাস সম্বলিত যে 'ক' নামক চক্র তাহার দন্ত-সংখ্যা যদি ২৪, অর্থাৎ ব্যাসের ছয় গুণ হয়, তবে সেই অনুসারে 'গ' এর দন্ত সংখ্যা ৩৬, 'ঘ' এর ৪, 'ঙ'র ৪৮, এবং 'চ' এর ৩টী মাত্র হইবে।

$$\text{সুতরাং } ২৪\times৩৬\times৪৮\times ব = ৬\times৪\times৩\times ভা \therefore ভা = \frac{২৪\times৩৬\times৪৮\times৪}{৬\times৪\times৩}$$

$= ৪\times৯\times১৬\times৪ = ২৩০৪$ সের $=$ ৫৭॥৪.

দন্তুর-চক্রের আর একটী কৌশল আছে, তাহাও জানা আবশ্যক। যখন কোন চক্র কোন বিশেষ দিকে ঘূর্ণিত হইলেই কার্য্য হয়, এবং তাহার বিপরীত দিকে ঘুরিলে কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে, এমত স্থলে দন্তুর চক্রের নিকটে একটী 'ধারক-দন্ত' বদ্ধ করিয়া রাখে। যখন চক্র উচিত দিকে ঘুরিয়া যায়, তখন ঐ দন্ত, চক্রের এক দন্ত হইতে অপর দন্তে ঠক্ ঠক্ করিয়া পড়িতে থাকে, তাহার গমনের কোন প্রতিবন্ধকতা করে না, কিন্তু চক্রটা অন্য দিকে ফিরিতে গেলেই ঐ দন্ত দ্বারা ধৃত হয়, সুতরাং উহা কোন প্রকারেই ফিরিতে পারে না।



'ক' একটী উক্তরূপ ধারক-দন্ত; 'খ' নামক দন্তুর চক্র যখন শরাভিমুখে ঘুরিতে থাকে তখন 'ক' তাহার ঘূর্ণন নিবারণ করে না, কিন্তু উহা বিপরীত দিকে ঘুরিতে গেলেই, 'ক' এর মুখ 'খ' এর দন্তে বদ্ধ হইয়া যায়।

বাষ্পীয় যন্ত্র।

প্রথম অধ্যায়।

ইউরোপীয়দিগের নির্ম্মিত সর্ব্বপ্রকার যন্ত্র অপেক্ষা বাষ্পীয় যন্ত্র অধিক কার্য্যে লাগে। বাষ্পীয় যন্ত্রের প্রয়োগ প্রায় সকল কর্ম্মেই হইতে পারে। জলতুলা, গাড়ি টানা, জাহাজ টানা, সূত্র প্রস্তুত করা, বস্ত্র বুনা, পুস্তকাদি মুদ্রিত করা প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্ম এক বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বাষ্পীয় যন্ত্রকে যেমন যেমন কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়, ইহার প্রকৃতিও সেইরূপে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। কিন্তু সেই সকল উহার অবান্তর ভেদ মাত্র। বাষ্পীয় যন্ত্র মাত্রেরই মূল প্রকৃতি একপ্রকার। এই প্রকরণে তাহাই বর্ণিত হইবে।

কিন্তু এই যন্ত্রের কএকটী প্রধান প্রধান অঙ্গ আছে, তাহার বিবরণ অগ্রে অবগত না হইলে সমুদায়টী একবারে হৃদ্গত করা কঠিন হয়, অতএব ক্রমশঃ একটী একটী করিয়া এই যন্ত্রের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

[বাষ্প কি ?]

তাপ-বিজ্ঞানে এই প্রশ্নের উত্তর সবিশেষ করা যাইতে পারে, এক্ষণে এই মাত্র বক্তব্য যে, তাপের একটী প্রধান ধর্ম্ম বিস্তারণ। যে দ্রব্য তাপ সংযুক্ত করা যায় সেই বিস্তৃত হয়। কত তাপে কোন্ দ্রব্য কত বিস্তৃত হইতে পারে, তাহা পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত করিয়াছেন; এবং তাঁহারা এ প্রকার এক যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা কোন্ দ্রব্যে কখন কত তাপ সংযুক্ত হইয়াছে তাহা

নিশ্চয় বলিতে পারেন। সেই যন্ত্রের নাম ‘তাপমান-যন্ত্র’। তাপমান-যন্ত্র দ্বারা অবধারিত হয় যে, জলে ২১২ অংশ তাপ প্রবেশিত হইলেই জলের যোগাকর্ষণ শক্তি এত ন্যূন হইয়া যায় যে, উহা তারল্য ভাব পরিহার পূর্ব্বক বায়বীয় ভাব ধারণ করে। জল সেই বায়বীয় ভাব প্রাপ্ত হইলেই তাহার নাম বাষ্প হয়।

জল যখন বাষ্প হয় তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয়তন সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা নিরূপিত হইয়াছে যে, জল বাষ্প হইলে পূর্ব্বায়তনের ১৭২৮ গুণ অধিক বিস্তৃত হয়। সুতরাং যে পাত্রে জল থাকে তাহার সমুদায় জল বাষ্প হইলে উহা কদাপি আর সেই পাত্রে নিরুদ্ধ থাকিতে পারে না। তাহার বিস্তৃতি অধিক হওয়াতে বাষ্প ঐ পাত্রকে বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা পায়। এই জন্যই কখন কখন ‘ভাপ্‌রার হাঁড়ী’ ফাটিয়া যায়—ভাতের হাঁড়ীর মুখে কিয়ৎক্ষণ শরা চাপা থাকিলে সেই শরা উদ্ঘাটন করিয়া বাষ্প বাহির হইতে থাকে—এবং বাষ্পের এইরূপ বলকেই অবলম্বন করিয়া ইউরোপীয়দিগের বাষ্পীয় যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে।

পরন্তু ২১২ তাপাংশে জল বাষ্প হয় বটে। কিন্তু যদি যেমন বাষ্প জন্মে অমনি বাহির হইয়া যাইতে পায়, তাহা হইলে বাষ্পের বল অধিক হয় না। বাষ্পকে পাত্রের মধ্যে বদ্ধ করিয়া যদি জলে জ্বাল দেওয়া যাইতে থাকে তাহা হইলেই বাষ্পের বল অধিক হয়। ইহার কারণ এই যে, জলের উপর, যত অধিক চাপ থাকে তত অধিক তাপাংশে তাহার বাষ্পোদ্গম হয়, এবং যত অল্প চাপ থাকে তত অল্প তাপাংশে বাষ্প জন্মে। অল্প তাপাংশে যে বাষ্প জন্মে তাহার বিস্তারণ শক্তি কখনই অধিক তাপাংশজাত বাষ্পের তুল্য হইতে পারে না। যে হেতু তাপের বিস্তারণ ধর্ম্মেই বাষ্পের বিস্তারণ গুণ জন্মে। সুতরাং তাপাংশের তারতম্যানুসারে বাষ্পেরও বিস্তারণ গুণের ন্যূনাধিক্য হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি?।

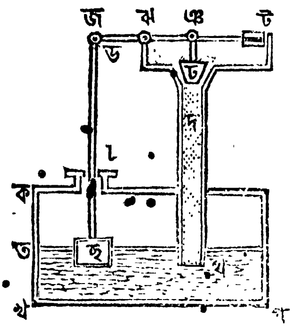
[হাঁড়ি।]

যে পাত্রে জল রাখিয়া অগ্নিসংযোগ দ্বারা সেই জলকে বাষ্প করা যায়, সেই পাত্রের নাম হাঁড়ি। বাষ্পীয় যন্ত্রের হাঁড়ির গঠন নানা প্রকার হয়। কিন্তু গোলাকার হইলে জলের অধিক স্থানে তাপ পায় বলিয়া হাঁড়ির আকার শূন্য-গর্ভ গোল স্তম্ভের ন্যায় করাই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

লোহের বা তাম্রের অতি স্থূল স্থূল পাত প্রস্তুত করিয়া সেই সকল পাত যুড়িয়া বাষ্পীয় যন্ত্রের হাঁড়ি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কিন্তু হাঁড়ি যতই শক্ত হউক না কেন তাহার নীচে যেরূপ জ্বাল পায়, তাহাতে উহা অতি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সকলেরই বিদিত আছে, কোন মৃণ্ময় পাত্রকে চুল্লীর উপর সংস্থাপিত করিয়া যদি উহাতে কিয়ৎক্ষণ জলাদি কোন পদার্থই না দেওয়া যায়, তাহা হইলে পাত্রটী অতি শীঘ্রই ফাটিয়া যায়। ধাতু পাত্রেও এইরূপ ঘটিতে পারে। ধাতু মাত্রেই অধিক উত্তপ্ত হইলে তাহার সহিত ভূবায়ুস্থিত অম্লকর-বায়ুর রাসায়নিক সংযোগ হয়। সেই সংযোগ বশতঃ ধাতু মাত্রেই মড়িচা পড়ে এবং উহারা ক্ষয় হইয়া যায়। কিন্তু যদি ধাতু পাত্রে জল থাকে তবে পাত্রটা যতই কেন উত্তপ্ত হউক না, তাহার অধিকাংশ তাপ জলে যায়, এবং জলও বাষ্প হইয়া ঐ তাপকে অন্তর্হিত করিতে থাকে। সুতরাং জল-পূর্ণ থাকিলে পাত্র বিদীর্ণ হয় না।

[জল-নিয়ামক।]

অতএব বাষ্পীয় যন্ত্রের হাঁড়ি যাহাতে সর্ব্বদা জল-পূর্ণ থাকে এমত কোন উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক। তন্নিমিত্ত অতি সুকৌশলপূর্ব্বক বাষ্পীয় হাঁড়িতে একটী যন্ত্র-বিশেষ সংযুক্ত থাকে। তাহার নাম 'জল-নিয়ামক' উহার প্রকৃতি পর পৃষ্ঠার প্রতিকৃতি দর্শনে স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইবে।



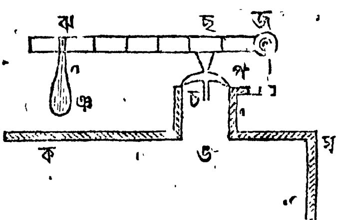
'কখগঘ' যেন বাষ্পীয় যন্ত্রের হাঁড়ি। উহার উপরিভাগে 'চ' নামক একটী ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া 'জচছ' নামক একটী দণ্ড প্রবিষ্ট থাকে। দণ্ডটী ঐ ছিদ্রে এমনি ঠিক্ হইয়া বইসে যে, কি বাহিরের বায়ু, কি হাঁড়ির ভিতরের বাষ্প, কিছুই উহা দ্বারা গমনাগমন করিতে পারে না। ঐ দণ্ডের নিম্নভাগে ধাতু নির্ম্মিত যে 'ছ' নামক শূন্যগর্ভ বস্তুটী আছে তাহা হাঁড়ির জলে ভাসিতে থাকে। যখন জল কমিয়া যায় তখন ঐ 'ছ' ভারী হওয়াতে 'জচছ' নামক দণ্ডে টান পড়ে। তাহা হইলেই 'জঝঞট' নামক দণ্ড-যন্ত্রের 'জঝ' ভুজ অধিক ভারী হওয়াতে অপর ভুজ 'ঝঞট' কিঞ্চিৎ উঠে। পরন্তু ঐ ভুজ উন্নত হইলেই উহার 'ঞ' স্থানে যে 'ঢ' নামক সিপি বদ্ধ থাক তাহাও উন্নত হয়। সুতরাং 'দথ' নামক প্রণালীর মুখ উন্মুক্ত হওয়াতে সেই প্রণালীর দ্বারা 'ঢ'এর উর্দ্ধবর্ত্তী-পাত্রস্থিতজল গিয়া হাঁড়ির ভিতরে পড়ে।

জল হাঁড়ির ভিতর পড়িলেই আবার 'ছ' ভাসিয়া উঠে, 'ছ' ভাসিয়া উঠিলেই 'চজ' দণ্ড উন্নত হয়, এবং উহা উন্নত হইলেই 'ঝট' ভুজ নামে, আর সেই ভুজ নামিলেই সিপি নামিয়া 'দথ' প্রণালীর মুখ বদ্ধ হইয়া যায়। আর অধিক জল হাঁড়ির ভিতর যায় না।

আরক্ষ কবাট।

বাষ্পীয় হাঁড়ি কেবল অগ্নিতাপেই নষ্ট হইতে পারে, এমত নহে। উহার ভিতর যে বাষ্প জন্মে তাহার বিস্তারণ শক্তি সমধিক হইয়া উঠিলে হাঁড়ি বিদীর্ণ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। যেমন অগ্নিতাপ নিবা-

রণের নিমিত্ত জল-নিয়ামক যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে সেইরূপ এই দ্বিতীয় আশঙ্কা নিবারণার্থ আর এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই যন্ত্রের নাম আরক্ষ-কবাট।

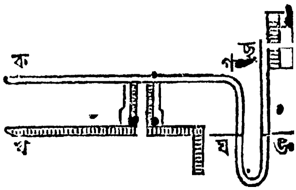


'কঙ' হাঁড়ি; 'ঙ' উহার একটী ছিদ্র, সেই ছিদ্রের মুখে 'চ' নামক কবাট রুদ্ধ আছে। আর 'জছঝ' একটী দণ্ড-যন্ত্র, উহার অবলম্ব স্থান 'জ' এবং 'ছ' স্থানে একটী বিপর্য্যস্ত ত্রিকোণ সূচী আছে যদ্দারা দণ্ড-যন্ত্রটী 'চ' নামক কবাটের উপর ভার দিয়া থাকে। দণ্ডের অপর প্রান্তে 'ঞ' নামক কোন ভারী দ্রব্য ঝুলিয়া আছে।

যখন হাঁড়ির অন্তর্গত বাষ্পের বল অধিক হয়, তখন উহা 'চ' নামক কবাটকে ঠেলিয়া তুলে, এবং সেই পথ দিয়া বাহির হইয়া যায়। 'জছঝ' দণ্ডটা তুলাযন্ত্রের ন্যায় অঙ্কিত আছে। 'ঞ' ভারকে তাহার যেমন স্থানে আনা যায় সেই পরিমাণ বাষ্পের চাপ হইলে কবাট খুলে। এইরূপে যত বলের বাষ্প প্রস্তুত করা আবশ্যক সেই পরিমিত বলেরই বাষ্প জন্মাইতে পারা যায়।

সুতরাং এমত বলা যাইতে পারে যে এই আরক্ষ-কবাটের দ্বারা বাষ্পীয় হাঁড়ির রক্ষা হয় এবং তদ্গত বাষ্পের বলও কখন্ কত থাকে তাহা জানিতে পারা যায়। পরন্তু এই দুইএর মধ্যে হাঁড়ির রক্ষাই এই কবাটের তাৎপর্য্য—বাষ্পের বল জানিবার উপায়ান্তর আছে। সেই যন্ত্রের নাম বাষ্প-মাপক; উহার প্রতিরূপ পরপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইতেছে।

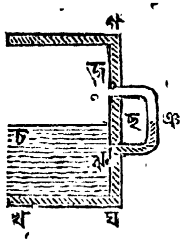
বাষ্প মাপক।



'খ' বাষ্পীয় হাঁড়ি। উহা হইতে 'গঘঙছচ' নামক একটী কাচনির্ম্মিত বক্র নল বাহির হইয়া আসিয়াছে। সেই নল পারদে পরিপূর্ণ এবং তাহার উপরের দিক খোলা। যদি হাঁড়ির ভিতর হইতে যে বাষ্প আইসে তাহার চাপ বাহিরে বায়ুর চাপের সমান হয় তাহা হইলে উক্ত পারদ 'গঘ' নল ভাগে যত উন্নত হইয়া থাকে 'চঙ' নল ভাগেও ঠিক্ তত উচ্চ হইয়া থাকিবে। কিন্তু ক্রমে বাষ্পের চাপ যত অধিক হইতে থাকে ততই 'গঘ' এর দিকে পারা নত হইয়া আইসে এবং 'চঙ' এর দিকে উন্নত হইয়া উঠে। 'ঘ' অপেক্ষা 'ঙ' এর দিকে পারা যত ইঞ্চি অধিক উন্নত হইয়া উঠে প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থানের উপর বাষ্পের চাপ তত পোয়া হইতেছে জানিতে পারা যায়।

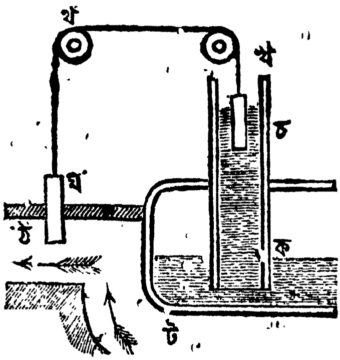
জল-মাপক।

পূর্ব্বে যে 'জল নিয়ামক' যন্ত্রের বিবরণ করা গিয়াছে তদ্দ্বারা বোধ হইয়া থাকিবে, যে বাষ্পীয় হাঁড়িতে আপনা হইতেই জল যোগায়, সুতরাং হাঁড়ি কথনই জলশূন্য হইতে পারে না। বাস্তবিক তাহাই হয় বটে; ঐ যন্ত্রদ্বারা হাঁড়ির ভিতর সর্ব্বদাই উপযুক্ত পরিমাণ জল থাকে। কিন্তু বিজ্ঞ যন্ত্রকরেরা, পাছে জল নিয়ামক যন্ত্রে কোন ব্যাঘাত ঘটে, এই শঙ্কা প্রযুক্ত হাঁড়ির ভিতরে জল কখন কত আছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিবার আর একটী উপায় করিয়াছেন। তাহার নাম 'জল-মাপক'। উহার প্রতিকৃতি পরপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইতেছে।



'খগঘ' বাষ্পীয় হাঁড়ি। উহাতে যেন 'চছ' পর্য্যন্ত জল থাকা আবশ্যক; তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে 'ঝ' নামক একটী ছিদ্র আছে আর কিঞ্চিদূর্দ্ধে 'জ' নামক আর একটী ছিদ্রে আছে। ঐ দুই ছিদ্রে 'জঞঝ' নামক একটী কাচ-নির্ম্মিত বক্র নল বসাইয়া দিলে, হাঁড়ির ভিতরে জল যে পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া আছে কাচের নলেও ঠিক তত উচ্চ হইয়া থাকিবে। সুতরাং হাঁড়িতে কত দূর পর্য্যন্ত জল আছে তাহা বাহিরের কাচ নল দেখিয়াই জানিতে পারা যায়। ঐ 'জঞঝ' নলেরই নাম 'জল-মাপক'।

বাষ্প, সকল সময়ে সমান পরিমাণে প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হয় না। কখন অধিক কখন অল্প বাষ্পের আবশ্যকতা হয়। এই নিমিত্তে মধ্যে মধ্যে চুল্লীর তাপ কখন বর্দ্ধিত আর কদাপি হ্রস্ব করা আবশ্যক হইয়া থাকে। সেই কার্য্য সাধনার্থে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম 'তাপ-নিয়ামক'। 'কট' হাঁড়ি, 'ঠট' চুল্লী। হাঁড়ির



ভিতর 'কচ' নামক একটী নল প্রবেশিত আছে। হাঁড়ির ভিতরে জলের উপর বাষ্পের চাপ যত অধিক হয়, জল ঐ নলের ভিতর দিয়া ততই উচ্চ হইয়া উঠে। কিন্তু ঐ জলের উপরিভাগে 'ঘথখ' রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া কোন শূন্য-গর্ভ-ধাতু-পাত্র ভাসমান আছে। জল উত্থিত হইলে তাহার সহিত ঐ পাত্রও উত্থিত হয় এবং উহা উঠিলেই 'খথঘ' রজ্জু শ্লথ

হইয়া যায়, সুতরাং ঐ রজ্জুর অপর প্রান্তে যে 'ঠ' নামক ধাতুময় পীঠ আছে তাহা নামিয়া চুল্লীর মুখ বন্ধ করে। চুল্লীর মুখ বন্ধ হইলেই আর তাহার ভিতর অধিক বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। বায়ু প্রবেশ অল্প হইলেই চুল্লীর জ্বলনও হ্রস্ব হয়। এইরূপে চুল্লী ক্ষণকাল স্তিমিত-তেজঃ হইয়া থাকিলেই হাঁড়ির ভিতর অল্প বাষ্প জন্মে, তাহাতে উহার অন্তর্গত জলের উপর চাপ কমিয়া যায়, সুতরাং নলের ভিতরকার জলও নামিয়া আইসে এবং তাহার সহিত 'ভাসমান ধাতু-পাত্র'ও নামে, আর ঐ পাত্র নামিলেই 'ঠ' উঠিয়া চুল্লীর মুখ উন্মুক্ত করিয়া দেয়—সুতরাং তাহাতে পুনর্ব্বার বায়ু প্রবেশ হওয়াতে উহা অধিক পরিমাণে জ্বলিয়া পুনর্ব্বার সমধিক বাষ্প জন্মায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

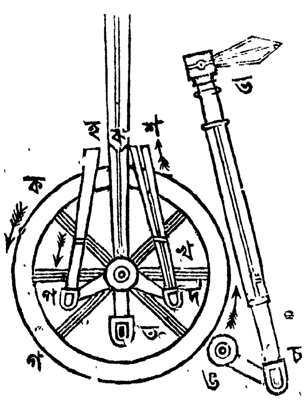
বাষ্পীয় হাঁড়ির প্রধান প্রধান অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্থূল স্থূল বিবরণ কথিত হইল. এক্ষণে ঐ বাষ্পীয়-হাঁড়ি-জাত বাষ্পকে যে, কিরূপ করিয়া কার্য্য-সাধনোপযোগী করা যায় তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

কোন যন্ত্রদ্বারা যেরূপ কার্য্য সাধন করা আবশ্যক হউক না কেন, তদ্দ্বারা একবার চক্র-গতি উৎপাদন করিতে পারিলেই অপর সকল ক্রিয়া সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব বাষ্পের বিস্তারণ শক্তিকে অবলম্বন করিয়া কি প্রকারে চক্রগতি উৎপাদিত হইয়াছে এ স্থলে তাহাই বলা যাইবে। কিন্তু কেবল চক্রগতি উৎপন্ন হইলেই হয় না। সেই চক্রগতির সর্ব্বাবস্থাতে সমান বেগ করিয়া রাখাও আবশ্যক, কারণ সমবেগ না হইয়া একবার অধিক বেগ এবং একবার অল্প বেগ হইলে কোন কার্য্যই সুনির্ব্বাহিত হয় না; আর যন্ত্রটীও অতি শীঘ্র জীর্ণ

এবং ভগ্ন হইয়া যায়। অতএব বাষ্পীয় যন্ত্রের 'গতি-নিয়ামক' যে যে অতি উৎকৃষ্ট উপায় সমস্ত অবলম্বিত হইয়াছে এই প্রকরণে তাহারই স্থূল স্থূল বিবরণ প্রকাশ করা যাইবে।

(ক্রাঙ্ক বা ঘূর্ণন দণ্ড।)

চক্রগতি নানা প্রকারে উৎপাদিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। গাড়ির চাকা, কুম্ভারের চক্র, চড়ক গাছের মোচ্ প্রভৃতি অনেক স্থলে, চক্র গতির উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু বাষ্পীয় যন্ত্রের চক্র-গতি উৎপাদনার্থ এই প্রকার কোন উপায়ই অবলম্বিত হয় নাই। যাঁতা ঘুরাইবার সময়, লোকে যে প্রকারে করিয়া ঘুরায় বাষ্পীয় যন্ত্রেও সেই প্রথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁতা ঘুরাইতে হইলে একটী কাষ্ঠিকাকে ঐ যাঁতার পার্শ্ববর্ত্তী ছিদ্রে বদ্ধ করিয়া হস্ত দ্বারা সেই কাষ্ঠিকার অপর প্রান্ত ধরিয়া টানিতে হয়। হস্তকে চক্রাকারে ভ্রামিত করিবার আবশ্যকতা হয় না। হস্তকে সরল রেখা ক্রমে শীঘ্র শীঘ্র একবার অগ্রবর্ত্তী ও পরক্ষণে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিলেই যাঁতা ঘূর্ণিত হইয়া থাকে।



বাষ্পীয় যন্ত্রে উক্তরূপ ঘরট্টের কাঠি এবং হস্তের কার্য্য যে যন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহার নাম 'ক্রাঙ্ক'। ঐ 'ক্রাঙ্ক' যন্ত্রের প্রতিকৃতি পার্শ্বভাগে প্রদর্শিত হইতেছে।

এই প্রতিকৃতিতে 'ঙচ' 'ক্রাঙ্ক'-যন্ত্রের কাষ্ঠিকা এবং 'ভচ' উহার 'যোজক-দণ্ড'। ঐ কাষ্ঠিকা এবং

যোজক-দণ্ড একটী সুবৃহৎ চক্রে সংযুক্ত হয় এবং তাহা হইলে যেরূপ দেখায় তাহাও ঐ প্রতিকৃতিতে দৃষ্ট হইবে।

সেই স্থলে 'দশ নামক ক্র্যাঙ্কের' যোজক-দণ্ড শরাভিমুখে উত্থিত হইলেই 'কখগ' নামক চক্রটী স্বপার্শ্বস্থ শরাভিমুখে ভ্রামিত হয়; আবার ক্র্যাঙ্কটী 'হপম' আকারে অবস্থিত হইলে 'হপ' যোজক-দণ্ডের শরাভিমুখে নিম্ন গতি হওয়াতে চক্রও স্বপার্শ্ববর্ত্তী শরাভিমুখে ঘুরে।

এইরূপে যোজক-দণ্ডের গতি ক্রমশঃ উপর নীচে হইলেই চক্র ভ্রামিত হয়। কিন্তু ঐ ভ্রমণের মধ্যে ক্র্যাঙ্ক দুইবার এমত দুই স্থানে উপস্থিত হয় যে তথায় 'ক্র্যাঙ্কের' বল কোন কার্য্যকারী হইতে পারে না। তাহার এক স্থান, যখন ক্র্যাঙ্কের কাষ্ঠিকা যোজক-দণ্ডের ঠিক নীচে আইসে এবং অপর স্থান, যখন উহারা উভয়ে এক সরলারেখায় আসিয়া চক্রের ব্যাস স্বরূপে অবস্থিত হয়। ঐ দুই সময় 'ক্র্যাঙ্কের' টানে চক্র না ঘুরিয়া উহার অক্ষে, অর্থাৎ মধ্য স্থানে সমুদায় বল পড়ে। হাতে করিয়া একটী যাঁতা ঘুরাইয়া দেখিলেই ইহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইবে। যদি হাত না ঘুরাইয়া কেবল কাঠিকে ঠেলিয়া এবং টানিয়া অল্পে অল্পে যাঁতা ঘুরাইবার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে, যে, দুইবার যাঁতার কীলক এবং কাঠিকার মাথা ও হস্তের কফোণি সমসূত্র পাতে হয় সেই দুইবার হাতের টান যাঁতার কেন্দ্র-স্থিত কীলকের উপরে পড়ে, ঐ টানে যাঁতা ঘুরিতে পারে না। 'ক্র্যাঙ্কে' ও এইরূপ হইতে পারে। এবং এই জন্যই ক্র্যাঙ্কের উক্ত দুই অবস্থাকে 'অকর্ম্মণ্যাবস্থা' বলা গিয়া থাকে। যাঁতাকে অল্পে অল্পে ঘুরাইতে গেলে এইরূপ হয় বটে। কিন্তু যদি উক্ত যাঁতাকে অত্যন্ত বেগে ঘূর্ণিত করা যায় তাহা হইলে, কীলকের প্রতি আকর্ষণ হয় না অর্থাৎ যাঁতা এক বারও অকর্ম্মণ্যাবস্থায় অবস্থিত না হইয়া ঐ দুই স্থান হইতে বেগে বাহির হইয়া পড়ে। জড় পদার্থের নিশ্চেষ্টতা গুণই এইরূপ হইবার একমাত্র কারণ।

কোন কোন বাষ্পীয় যন্ত্রে দুইটী 'ক্রাঙ্ক' সংযুক্ত থাকে। তাহারা এমত ভাবে অবস্থিত হয় যে, একটীর অকর্ম্মণ্যাবস্থায় অপরটী কার্য্যকারী হইয়া চক্রের ঘূর্ণন সম্পাদন করে। ক্রাঙ্কদ্বয় পরস্পর ৯০ অংশ অন্তর থাকিলেই এইরূপ ঘটিতে পারে।

আড়া।

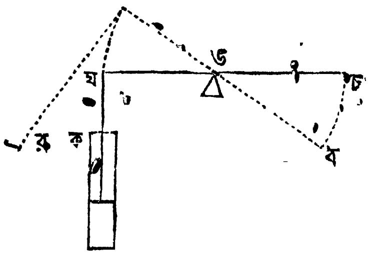
'ক্রাঙ্ক' যন্ত্রটী ঊর্দ্ধাধোভাবে সঞ্চালিত হইলেই চক্রের ভ্রমণ হয় ইহা বোধগম্য হইয়া থাকিবে। এইক্ষণে ক্রাঙ্কের গতি কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহার বিবরণ করা আবশ্যক।

সকলেই দেখিয়া থাকিবেন যে, ঢেঁকির এক দিক পায়ে করিয়া চাপিয়া ধরিলে তাহার অপর দিক উন্নত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ অবলম্ব-মধ্যক-দণ্ড-যন্ত্র মাত্রেরই এই প্রকৃতি যে, উহার এক দিক নত হইলে অপর প্রান্ত উন্নত হয়। ক্রাঙ্কের যোজক-দণ্ড ঐরূপ একটী অতি বৃহৎ দণ্ড-যন্ত্রের এক প্রান্তে সংলগ্ন থাকে। সেই দণ্ডের নাম 'আড়া'। ক্রাঙ্ক এবং চক্র সমন্বিত আড়ার প্রতিকৃতি ২০৯ পৃষ্ঠে প্রদর্শিত হইয়াছে।

'কখ' আড়া; 'গ' উহার অবলম্ব; 'খজ' ক্রাঙ্কের যোজক-দণ্ড এবং 'চঘঙ' চক্র আর 'ঝ' সেই চক্রের অক্ষ। আড়ার 'ক'এর দিক নত হইলে 'খ'এর দিক উঠে আর 'ক' উন্নত হইলে 'খ' নত হয়। সুতরাং পর্য্যায়ক্রমে 'খ' নতোন্নত হইলেই 'ক্রাঙ্ক'-সংযোগে 'চঘঙ' চক্র এবং 'ঝ' তাহার অক্ষ ঘুরিতে থাকে। আড়ার অপর দিক, অর্থাৎ 'ক'এর দিক কিরূপে সঞ্চালিত হয় তাহা পরে বলা যাইবে।

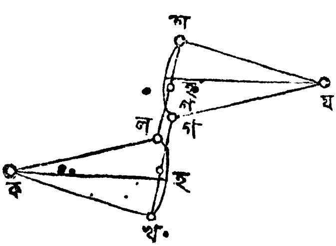
সমান্তরাল গতি নিয়ামক।

বল-মধ্যক-দণ্ড-যন্ত্রের দুই প্রান্ত সরল রেখাক্রমে সঞ্চালিত হয় না। উহার উভয় দিকই ধনুরাকার পথে গমন করে। দেখ 'ঙথ'



দণ্ড যন্ত্র যদি ‘ঙ’ অবলম্বের উপর পরিচালিত হইয়া ‘বঙ’ ভাবে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে উহার দুই প্রান্ত অবশ্য ধনুরাকার পথে গমন করিবে। অর্থাৎ ঐ দুই পথ সরল রেখা হইবে না—দুইটীই বৃত্ত-পরিধির অংশ হইবে। অতএব যদি ‘ঘ’এর দিকে এক যষ্টি বন্ধন করিয়া দেওয়া যায়, তবে সেই যষ্টিও কদাপি লম্বরেখাক্রমে উত্থিত বা পতিত হয় না। ‘ঘ’ উত্থিত হইলে ঐ যষ্টির প্রান্ত ‘র’ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়।

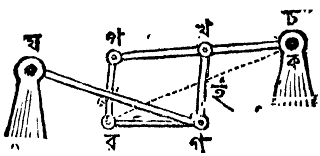
বাষ্পীয় যন্ত্রে একটী চুঙ্গীর ভিতর অর্গল সঞ্চালিত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু যেরূপ কথিত হইল তাহাতে অবশ্য বোধ হইয়া থাকিবে যে, সেই অর্গলকে কেবল আড়ার মুখে বাঁধিয়া দিলেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই হেতু বিজ্ঞবর ওয়াট্ সাহেব ‘সমান্তরাল-গতি-নিয়ামক’ নামে এক প্রকার অতি বিচিত্র উপায় সৃষ্ট করেন। নিম্নবর্ত্তী প্রতিকৃতি দেখিলে তাহার প্রকৃতি স্পষ্ট বোধ হইবে।



‘কখ’ এবং ‘গঘ’ দুই দণ্ড, উহারা পরস্পর সমান এবং আপনাপন কীলকের অর্থাৎ ‘ক’ এবং ‘ঘ’ এর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে পারে আর তাহাদিগের উভয়ের ‘খ’ এবং ‘গ’ প্রান্তভাগ ‘গখ’ দণ্ড দ্বারা সংযুক্ত আছে, ‘হ’ ঐ যোজক দণ্ডের মধ্য স্থান। দেখ, যদি ‘খক’ এবং ‘ঘগ’ উভয়েই একেবারে

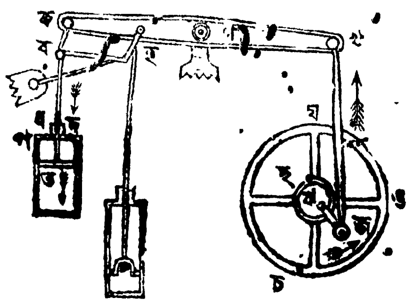
ঘুরিয়া প্রথমটীর মুখ 'ল' পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয়টীর মুখ 'শ' পর্য্যন্ত উঠে তাহা হইলে 'গখ' দণ্ডও উহাদিগের সহিত উঠিয়া 'লশ' রেখাক্রমে অবস্থিত হইবে। তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে 'গখ' এর 'খ' প্রান্ত 'ল' স্থানে যাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে আসিয়াছে, কিন্তু 'গ' ও 'শ' স্থানে যাওয়াতে ঠিক সেই পরিমাণে বাম দিকে গিয়াছে। সুতরাং 'গখ' দণ্ডের মধ্য ভাগ, অর্থাৎ 'হ' স্থান সরল রেখাক্রমেই চালিত হইয়াছে। ফলতঃ ঐ স্থান পার্শ্বের দিকে সরে না, কেবল নতোন্নত ভাবেই চলিতে থাকে।

এক্ষণে বাষ্পীয় যন্ত্রের আড়াডে কি প্রকারে উক্ত দণ্ড সকল সংযুক্ত হইয়া থাকে তাহা স্পষ্ট করা যাইতেছে। এই পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিকৃতিতে 'কখ' এবং 'ঘগ' স্ব স্ব কীলকের উপর চালিত হইলে 'খগ' যোজকদণ্ডের মধ্যস্থান 'হ' ঠিক সরল রেখায় চালিত হয়। পরন্তু 'পর' 'খগ' রেখার সমান এবং সমান্তরাল আর 'রগ' ও 'পখ' এর সমান এবং সমন্তরাল আর 'পর' যে দিকে যেমন সরে 'খগ' ও সেই দিকে তেমনি সরে, সুতরাং 'পরগখ' চতুর্ভুজ ক্ষেত্রটী সকল সময়েই সমন্তরাল থাকিয়া যায়, সুতরাং 'হ' স্থানের গতি যেরূপ হয় 'র' স্থানের গতিও সেইরূপ হয়। পরন্তু 'হ' এর গতি সরল রেখাক্রমে হয় ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, অতএব 'র' এরও তাহাই হয়। ফলতঃ ঐ 'র' স্থানে বাষ্পীয় যন্ত্রের চুঙ্গীর অর্গল বদ্ধ থাকে আর 'হ' স্থানে একটী বায়ু-ও-জলনির্গাণ-যন্ত্রের অর্গল বদ্ধ থাকে। সুতরাং সেই উভয় অর্গলেরই গতি সরল রেখাক্রমে হয়।



বাষ্পীয় চুঙ্গী এবং অর্গল।

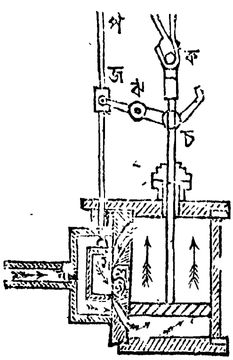
নিম্নবর্ত্তী প্রতিকৃতির দক্ষিণ ভাগে বাষ্পীয় চুঙ্গী এবং তাহার অর্গলের প্রতিরূপ প্রকাশিত আছে। এই চিত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ 'পত' চুঙ্গী এবং 'বত' তাহার অর্গল। ঐ চুঙ্গী লৌহ নির্ম্মিত এবং শূন্যগর্ভ। উহার ভিতর অর্গল এমতরূপে প্রবিষ্ট আছে যে, তাহাতে বায়ু বা বাষ্প কিছুরই গমনাগমনের পথ নাই। বিশেষতঃ



চুঙ্গীর মুখে 'ধ' নামক আর একটী পাত্র থাকে তাহা তৈল বসা প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য দ্বারা পরিষিক্ত সূত্রবস্ত্রে পরিপূর্ণ। উহারই ভিতর দিয়া অর্গল চুঙ্গীর মধ্যে প্রবেশ করে, সুতরাং বাষ্প বা বায়ু কিছুই ভিতর হইতে বাহিরে বা বাহির হইতে ভিতরে যাইতে পারে না। পূর্ব্বে যে বাষ্পীয় হাঁড়ির বিবরণ করা গিয়াছে সেই হাঁড়ি হইতে একটী নল আসিয়া চুঙ্গীর ভিতর প্রবিষ্ট হয়। বাষ্প ঐ নল দিয়া হাঁড়ি হইতে চুঙ্গীতে আইসে এবং একবার অর্গলের নীচে যাইয়া আপন প্রবলতর বিস্তারণ শক্তি প্রভাবে অর্গলকে ঠেলিয়া তুলে, আবার অর্গল কিয়দ্দূর উঠিলেই বাষ্প উহার উপরের দিকে যাইয়া অর্গলকে নামাইয়া দেয়। এইরূপে অর্গলটা একবার ঊর্দ্ধে এবং একবার নীচে আসিতে থাকে। সুতরাং আড়ার মুখও তদ্‌যোগে নতোন্নত হয়।

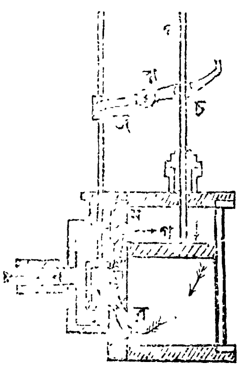
বাষ্প কি প্রকারে একবার অর্গলের নীচের দিকে যায় এবং

করিয়াই বা তৎপরক্ষণে উহার উপরের দিকে আইসে ইহা বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক। বাষ্পীয় যন্ত্রের সর্ব্বাবয়বই অতি সুকৌশল-সম্পন্ন বটে, কিন্তু অন্যাপেক্ষা এই ভাগটীর বিশেষ চমৎকারিত্ব আছে এবং ইহাকে কেবল চিত্র দ্বারা স্পষ্ট করাও অতি কঠিন। বাষ্পের ঊর্দ্ধাধোগতি দুইটী কবাট সংযোগে সম্পন্ন হয়, তাহার একটীর নাম, 'পিচ্ছিল-কবাট' এবং দ্বিতীয়টীর নাম 'ডি-কবাট'। উহাদিগের চিত্র নিম্নে এবং পর পৃষ্ঠে প্রদর্শিত হইতেছে :



পরবর্ত্তী (অর্থাৎ ২১০ এবং ২১১ পৃষ্ঠের) চিত্রদ্বয়ের প্রথমটীতে বাষ্প কি প্রকারে আসিলে অর্গলের ঊর্দ্ধ গতি হয় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। 'ন' উহার বাষ্পনলী, ঐ নলীর দ্বারা হাঁড়ি হইতে বাষ্প আসিতেছে, আসিয়া আর কোন দিকে পথ না পাইয়া 'ম' নামক পিচ্ছিল-কবাট এবং 'ল' নামক ডি-কবাটের নীচে যে বক্র শর চিহ্নিত ছিদ্র আছে তদ্দ্বারা চুঙ্গীর ভিতর প্রবেশ করিতেছে। বাষ্প অর্গলের নীচে আসিলেই তাহার বিস্তারণ শক্তি প্রভাবে অর্গলের মুখ উন্নত হইয়া উঠে। কিন্তু কিয়দ্দূর উঠিলেই উহার উপরিভাগে 'চ' স্থানে যে 'চজ' দণ্ড যন্ত্র বদ্ধ আছে তাহার 'চ' প্রান্ত উন্নত হয়। 'চ' উঠিলেই 'ঝ' অবলম্বেম অপর দিকস্থ বাহুর প্রান্ত অর্থাৎ 'জ' নামিতে থাকে। 'জ' নামিয়া আসিলে 'পম' দণ্ডটীও নামে কিন্তু উহা নামিলেই পিচ্ছিল-কবাট নামিয়া আসিয়া পরবর্ত্তী (২১১ পৃষ্ঠের) প্রতিকৃতিতে যে ভাবে আছে সেই ভাবে অবস্থিত হয়। সুতরাং উর্দ্ধ নিম্নস্থিত যে প্রণালীর মুখ মুক্ত ছিল তাহা রুদ্ধ হইয়া যায়।

অতএব বাষ্প আর ঐ দিক দিয়া প্রবিষ্ট হইতে পারে না। এইক্ষণে বাষ্প পূর্ব্ববৎ 'ন' দ্বারা আসিয়া পিচ্ছিল-কবাটের উপর দিক দিয়া 'ম' প্রণালী দ্বারা চুঙ্গীর ভিতর প্রবেশ করে এবং অর্গলের মুখের উপরিভাগে চাপ দেয়। সুতরাং অর্গল নামিয়া আসিতে থাকে। আবার অর্গল নামিতে নামিতে 'চ' নত এবং 'জ' উন্নত হয়। সুতরাং পিচ্ছিল-কবাট সেই সহযোগে ঊর্দ্ধে উঠে। কিয়দ্দূর উঠিলেই 'র' প্রণালী মুক্ত এবং 'ম' প্রণালী রুদ্ধ হয়। অতএব প্রথম



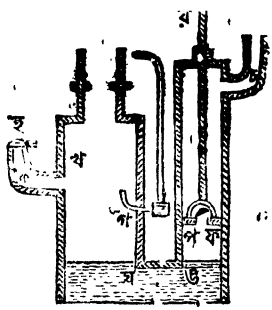
প্রতিকৃতিতে যে প্রকার কার্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে সেইরূপ ক্রিয়া হইতে থাকে। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে পুনঃ পুনঃ হওয়াতে অর্গলের ঊর্দ্ধাধোগতি সম্পাদিত হয়। পরন্তু যখন অর্গলের মুখ যে দিকে উঠিবে সেই সময় যদি উহার বিপরীত দিকে বাষ্প বদ্ধ থাকে তবে সেই বাষ্পের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত অর্গলের কোন দিকেই গতি হইতে পারে না। এই বৈষম্য নিবারণের জন্য অতি সুকৌশল পূর্ব্বক বাষ্প বহির্গমনের একটী পথ প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রতিকৃতিটী (২১০ পৃষ্ঠের) দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, যখন অর্গল উপরের দিকে উঠিতেছে, তখন উহার ঊর্দ্ধভাগে স্থিত বাষ্প শরাভিমুখে যাইয়া পিচ্ছিল-কবাট এবং ডি-কবাটের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হয়; কিন্তু পিচ্ছিল-কবাটের দ্বারা চতুর্দ্দিক আবৃত থাকাতে অন্য কোন দিকে পথ না পাইয়া ঐ ডি কবাটে যে 'হ' নামক ছিদ্র আছে তাহারই দ্বারা বাহির হইতে থাকে। আবার যখন অর্গল নামিয়া আইসে (২১১ পৃষ্ঠের) তখনও নীচের

বাষ্প 'র' প্রণালী দিয়া ডি-কবাটের পশ্চাদ্ভাগে যায় এবং তথা হইতে 'হ' ছিদ্র দ্বারা বাহির হয়।

বাষ্প চুঙ্গী হইতে বাহির হইয়া কি হয় তাহা পরে কথিত হইতেছে।

বাষ্প সংঘাতক।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, বাষ্পীয় যন্ত্রের অবান্তর ভেদ অনেক আছে। কিন্তু তন্মধ্যে প্রধান ভেদ দুইটী। এক প্রকার যন্ত্রে বাষ্প, চুঙ্গী হইতে বাহির হইয়া বায়ুতে যায় আর এক প্রকার যন্ত্রে বাষ্পের তাদৃশ অপব্যয় হয় না—বাষ্প চুঙ্গী হইতে বাহির হইয়া একটী বৃহৎ পাত্রের অন্তর্গত হয় এবং সেখানে সংহত হইয়া পুনর্ব্বার জল হইয়া থাকে। ঐ পাত্রের নাম বাষ্প-সংঘাতক।



'ক' নামক প্রণালী দ্বারা চুঙ্গীর বাষ্প 'খ' নামক একটী লৌহময় বৃহৎ-পাত্রে প্রবিষ্ট হয়। ঐ 'খ' এর চতুর্দ্দিকে শীতল জল থাকে এবং 'গ' নামক প্রণালী দ্বারা উহার ভিতরেও শীতল জল প্রবিষ্ট হইতে থাকে; বাষ্প সেই শীতল জল সংস্পর্শে তৎক্ষণাৎ ঘনীভূত হইয়া জল হইয়া যায়। 'খ' নামক বাষ্প-সংঘাতকের তলভাগে 'ঘ' নামক একটী কবাট সংস্থাপিত আছে। সেই কবাট এরূপ যে, কেবল বাহিরের দিকেই খুলে, কদাপি ভিতরের দিকে খুলে না। বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল হইলে 'ঘ' কবাট উন্মুক্ত হয় এবং জল তৎক্ষণাৎ ঐ দ্বার দিয়া 'ঙ' নামক চুঙ্গীর ভিতরে প্রবেশ করে।

বোমাযন্ত্র।

উক্ত 'ঙ' নামক চুঙ্গীর ভিতর (২১২ পৃষ্ঠে) 'পফর' নামক একটী অর্গল আছে। সেই অর্গলের মধ্যে 'প' এবং 'ফ' নামক দুইটী কবাট

থাকে। তাহারা কেবল ঊর্দ্ধদিকেই খুলিতে পারে নীচের দিকে খুলে না। 'পফর' অর্গলের অগ্রভাগ বাষ্পীয় যন্ত্রের আড়ার এক স্থানে সংযুক্ত থাকে। আড়াব সেই দিকে উঠিলেই ঐ অর্গল উঠে। উহা উঠিলেই 'ঘ' এর পশ্চাদ্ভাগী শূন্য হয়। সুতরাং ভিতরকার জল বাষ্পাদির চাপে ঐ কবাট খুলিয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ 'ঙ' স্থান ঐ সকল পদার্থে পরিপূর্ণ হয়। আবার যখন আড়ার নিম্নগতি বশতঃ বোমার অর্গল নামিয়া আসিতে থাকে তখন 'ঙ' পাত্রস্থিত জল-বাষ্পাদির প্রতি উপর হইতে চাপ পড়াতে বোমার মুখের 'প' এবং 'ফ' নামক দুইটী কবাট খুলিয়া যায়। সুতরাং 'ঙ' স্থিত যাবৎ দ্রব্য উপরে উঠে। উপরে উঠিয়া উহা 'চ নামক প্রণালী দ্বারা চলিয়া যায়। ঐ 'চ' ই বাষ্পীয় হাঁড়ির জল-যোজক প্রণালী। সুতরাং ইহাতে যে জল পড়ে, তাহা পুনর্ব্বার বাষ্পীয় হাঁড়িতেই যায়। কি চমৎকার! একবার যে জলকে বাষ্প করাতে সেই বাষ্পের বিস্তারণ-শক্তি প্রভাবে চুল্লীর অর্গল পরিচালিত হইয়াছিল, সেই জলই পুনর্ব্বার বাষ্প সংঘাতক-যন্ত্র মধ্যে আসিয়া জল হইল, এবং বোমা দ্বারা উত্তোলিত হইয়া প্রণালী সহকারে পুনর্ব্বার হাঁড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। এইরূপ বারম্বার হইতে থাকিল। অতএব যদি শীতল-জল-সেক ব্যতিরেকে বাষ্প সংঘাতের উপায়ান্তর থাকিত তবে এইরূপ বাষ্পীয় যন্ত্রে একবার জল লইলে পুনর্ব্বার জল গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন হইত না।

তৃতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্বে যাহা যাহা কথিত হইয়াছে তৎসমুদায় স্মরণ থাকিলে অবশ্যই বোধ হইবে যে, বাষ্পীয় যন্ত্র উক্ত সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমন্বিত হইলেই কার্য্যসাধনোপযোগী হয়। দেখ, চুল্লীর তাপে হাঁড়ির মধ্যে বাষ্প হইতে থাকিল. জলনিয়ামক-যন্ত্র ঐ

প্রয়োজনানুরূপ জল যোগাইতে লাগিল, বাষ্প-বাহিনীনলী দ্বারা বাষ্প, চুঙ্গীতে প্রবিষ্ট হইল এবং সেই চুঙ্গীর পিচ্ছিল-কবাট এবং ডি-কবাটের দ্বারা বাষ্প একবার চুঙ্গীর উপরের দিকে এবং পরে নিম্নভাগে যাইয়া চাপ প্রদান করিল। তাহাতেই চুঙ্গীর অর্গল উপর নীচে করিয়া পরিচালিত হইল, ও তৎসহযোগে আড়ার এক দিকের উর্দ্ধাধোগতি সম্পাদিত হওয়াতে উহার অপর দিকও চালিত হইল; সুতরাং যোজক এবং ঘূর্ণন দণ্ড সহকারে গক্ষের ও তৎ-সম্বন্ধ চক্রের ভ্রমণ হইতে লাগিল; আর বাষ্পও চুঙ্গী হইতে বাহির হইয়া সাংঘাতক-যন্ত্রে গিয়া পুনর্ব্বার জলরূপে পরিণত হইয়া বোমাযন্ত্র দ্বারা উত্তোলিত হইলেই পুনর্ব্বার জলযোজক প্রণালী দ্বারা বাষ্পের হাঁড়িতে আগমন করিল।

তবে আর বাকী কিছুই নাই, বোধ হয়। ফলতঃ তাহা নহে। বাষ্পীয় যন্ত্রের গতিনিয়ামক আর প্রধান তিনটী অঙ্গ আছে। তাহা-দিগের প্রকৃতি অবগত হওয়া আবশ্যক। না হইলে এই অতি সুকৌ-শল-সম্পন্ন যন্ত্রের সকল আশ্চর্য্য কৌশল অবগত হওয়া হয় না।

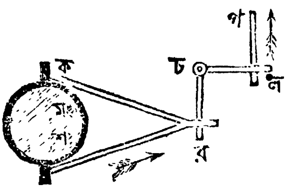
সেই তিনটীর মধ্যে একটীর নাম বিষম-কৈন্দ্র-চক্র—দ্বিতীয়টীর নাম 'গবর্ণর' এবং তৃতীয়টীর নাম উড্ডীনচক্র। ঐ তিনটীর বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশিত করা যাইতেছে।

বিষম কৈন্দ্র চক্র।

একটী চক্রাকার কাষ্ঠ খণ্ড লও, সেই কাষ্ঠ-খণ্ডের কেন্দ্রের কিয়দ্দূরে একটী ছিদ্র কর। পরে ঐ চক্রের চতুর্দ্দিকে একটী অঙ্গুরীয় পরিহিত করিয়া দেও। অঙ্গুরীয়টী যেন চক্রের গায়ে অধিক আঁটিয়া না বইসে অথচ পার্শ্বের দিকে এমন রূপে বদ্ধ থাকে যে কোন প্রকারে খসিয়া না পড়ে। পরে ঐ অঙ্গুরীয়ের দুই দিকে দুইটী দণ্ড বদ্ধ করিয়া সেই দণ্ড দ্বয়ের মুখ একত্র সংযুক্ত কর। এইরূপ করিয়া যদি চক্রের ছিদ্রে একটী কীলক বদ্ধ করিয়া তৎসহযোগে ঐ চক্রকে ঘূর্ণিত করিতে থাক

তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে যে, চক্রটী যত ঘুরিতে থাকিবে পূর্ব্বোক্ত দণ্ড দ্বয়ের মুখও সঞ্চালিত হইয়া একবার চক্রের দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া আসিবে আবার তাহার পর কিঞ্চিদ্দূরে গমন করিবে। সুতরাং চক্রটী ক্রমাগত এক দিকে ঘুরিলেও উক্ত দণ্ড দ্বয়ের মুখ ভাগ সরল রেখা ক্রমে গমনাগমন করিতে থাকিবে।

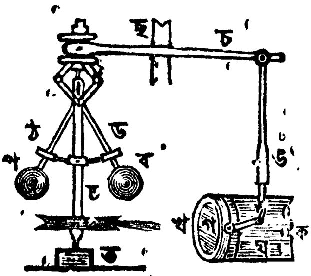
এইরূপ যন্ত্রকে বিষম-কেন্দ্র-চক্র বলা যায়। এই চক্র বাষ্পীয় যন্ত্রের অক্ষে নিবেশিত থাকে এবং সেই অক্ষের সহিত ঘুরে। ইহা দ্বারাই পিচ্ছিল-কবাটের গতি সম্পাদিত হয়। ইহার প্রতিকৃতি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। এই চিত্র দেখিলেই বোধ হইতে পারে



যে, ভিতরের চক্র খানির কীলক-স্থান যে 'ম' তাহা উহার বাস্তবিক কেন্দ্র নহে। চক্রটী 'ম'এর উপর ঘুরিলেই ক' এবং তন্নিম্নবর্ত্তী স্থানে যে দণ্ড দ্বয়ের দুই প্রান্ত সংলগ্ন আছে, তাহা একবার নীচে এবং তাহার পর উপরের দিকে উঠিতে থাকে, সুতরাং দণ্ডদ্বয়ের মুখ অর্থাৎ 'র' স্থান একবার সরিয়া আইসে আবার চলিয়া যায়, তাহাতেই 'রচলপ' মিশ্র-দণ্ড-যন্ত্রের 'লপ' ভাগের উর্দ্ধাধোগতি সম্পাদিত হইতে থাকে। ঐ 'লপ' স্থানেই বাষ্পীয় চুঙ্গীর অন্তর্গত পিচ্ছিল-কবাট সংযুক্ত হয়। সুতরাং উহাও তৎসহযোগে চলিতে থাকে।

গবর্ণর।

গতি-নিয়ামক গবর্ণর নামক দ্বিতীয় যন্ত্রের প্রকৃতি ইহা অপেক্ষাও অধিক চমৎকারজনক। গবর্ণর শব্দের অর্থ শাসনকর্ত্তা। বস্তুতঃ এই শক্তিটি সমুদায় বাষ্পীয় যন্ত্রের শাসনকর্ত্তা স্বরূপ হইয়া থাকে।



দ্বারা বাষ্প যথোচিত পরিমাণে চুল্লীর ভিতর যায়—একবার অধিক এবং একবার অল্প যাইতে পারে না, সুতরাং বাষ্পীয় যন্ত্রের গতিও বিষম বেগে নিষ্পন্ন হয় না। পার্শ্বভাগে ইহার একটী প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

এই চিত্রের দক্ষিণ ভাগে 'গবর্ণর' এবং বামভাগে 'কখ' নামক বাষ্প-বাহিনী নলী দৃষ্ট হইতেছে, ঐ নলীর মুখে 'গ' নামক একটী কবাট এমত ভাবে নিবেশিত আছে যে 'ঙ' নামক দণ্ডের ঊর্দ্ধ গতি হইলে সেই নলীর মুখে ক্রমশঃ বদ্ধ হইয়া যায় এবং 'ঙ'এর নিম্নগতি হইলে উহা অল্পে অল্পে খুলিতে থাকে। ঐ 'ঙ' নামক দণ্ড 'চছ' নামক অপর একটী দণ্ডের এক দিকে সংলগ্ন আছে এবং ঐ 'চছ' দণ্ডের অপর প্রান্ত চিত্রের দক্ষিণভাগে যে 'গবর্ণর' যন্ত্র দৃষ্ট হইতেছে তাহার শীর্ষদেশে সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং যদি গবর্ণরের শিরোদেশ কোন কারণে নতোন্নত হইতে থাকে, তবে 'চছ' দণ্ডের যোগে 'ঙ' দণ্ডও অবিপরীতভাবে পরিচালিত হইবে, সুতরাং তৎ সংশ্লিষ্ট 'গ' নামক কবাটও আপনা হইতেই কখন বা বদ্ধ এবং কখন বা উন্মুক্ত হইবে। পরন্তু 'গ' নামক কবাট বদ্ধ হইলেই বাষ্পের পথ রুদ্ধ হইয়া যন্ত্রের দ্রুত বেগ নিবারিত হয় এবং ঐ কবাট উন্মুক্ত থাকিলেই বাষ্পের পথ প্রশস্ত হওয়াতে যন্ত্রের গতিও দ্রুতবেগে সম্পাদিত হইতে পারে। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে 'গবর্ণরের' নিম্নভাগে যে চক্রটী আছে তাহাকে এবং বাষ্পীয় যন্ত্রের অক্ষকে এই উভয়কে পরিবেষ্টন করিয়া একটী রজ্জু আছে, সুতরাং অক্ষের ঘূর্ণনে ঐ রজ্জু সংযোগে চক্র এবং তৎসহ গবর্ণরের 'চ' নামক মেরুদণ্ডও ঘুরিতে থাকে। অতএব অক্ষটী অধিক বেগে ঘুরিলে উক্ত মেরু-

দণ্ডও সাতিশয় বেগসহকারে ঘূর্ণিত হয়। পরন্তু উহা হইলেই 'প' এবং 'ব' নামক দুইটী লৌহময় গোলাও ঘুরিতে ঘুরিতে চক্রভ্রমণ-জনিত কেন্দ্রাভিমুখ-বলের প্রাদুর্ভাবে মেরুদণ্ডের নিকট হইতে দূরে অপসৃত হইতে থাকে। কিন্তু যেমন কাঁচির মুখদ্বয় পরস্পর দূরবর্ত্তী হইলে তাহাদিগের শিরোভাগ অবনত হইয়া কীলকের নিকটে আইসে গবর্ণরের ঐ দুই গোলা পরস্পর দূরীভূত হইতে থাকিলেও উহাদিগের শীর্ষদেশ সেইরূপে নীচ হইয়া আইসে। সুতরাং 'চহ' দণ্ডের যে প্রান্ত সেই শীর্ষদেশে সম্বদ্ধ আছে, তাহাও নামিয়া পড়ে এবং তদ্দ্বারাই বাষ্পীয় নলীর মুখ 'গ' কবাট দ্বারা বদ্ধ হইয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ সেই কবাট রুদ্ধ থাকিলে চুল্লীর ভিতর বাষ্প অল্প হয়, সুতরাং অর্গলের এবং তৎসহ আড়ার ও তদ্দ্বারা ক্রাঙ্কের যোগে অক্ষের বেগ কমিয়া আইসে। অনন্তর অক্ষের বেগ রজ্জু দ্বারা সংক্রামিত হইয়া গবর্ণরের যে বেগ জন্মিয়াছিল তাহাও ন্যূন হয়, সুতরাং 'প' এবং 'ব' নামক গোলা দুইটী পরস্পর নিকটবর্ত্তী হয়, এবং তাহা হইলেই গবর্ণরের শীর্ষদেশ উন্নত হইয়া উঠে, আর তাহা উঠিলেই 'ছচ' দণ্ডের যোগে পুনর্ব্বার 'গ' খুলিয়া যায় এবং বাষ্পের পথ মুক্ত হইয়া যন্ত্রের বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকে।

উড্ডীনচক্র।

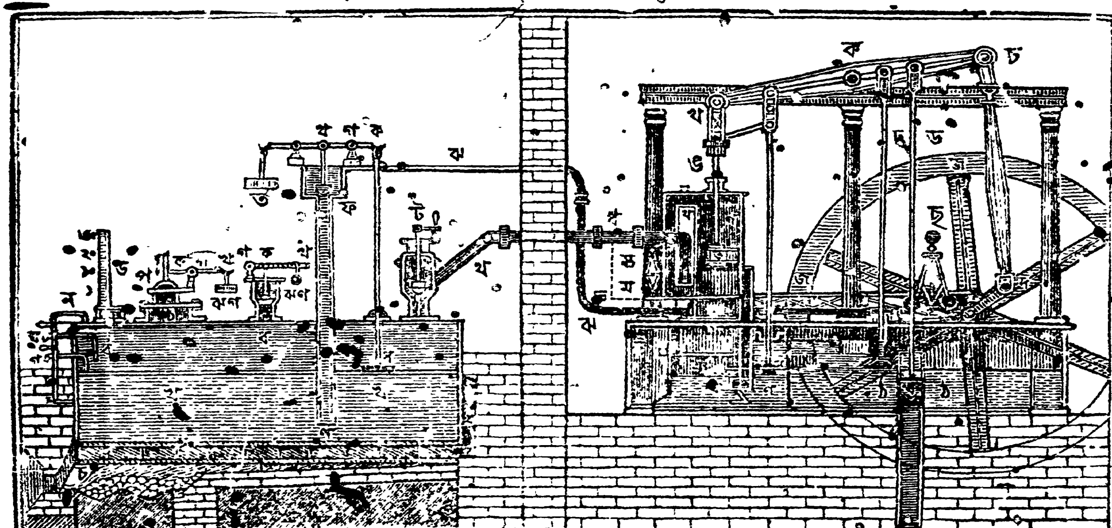
গতি-নিয়ামক তৃতীয় যন্ত্রের নাম উড্ডীন-চক্র। ইহা একটী লৌহময় সুবৃহৎ চক্র মাত্র। ইহা বাষ্পীয় যন্ত্রের অক্ষে সংলগ্ন থাকে এবং তাহার সহযোগে ভ্রামিত হয়। বাষ্পীয় যন্ত্রের অর্গলের গতি যদিও সর্ব্ব সময়ে সমবেগে নিষ্পাদিত না হইবার নানা কারণ উপস্থিত হয়, তথাপি এই সুবৃহৎ উড্ডীন-চক্রটী একবার ঘর্ণিত

হইয়া আছে। যখন বাষ্পীয় যন্ত্রের বল অধিক হয় তাহার অনেক ভাগ যেন এই সুবৃহৎ চক্রের ভ্রামণেই ন্যস্ত হইয়া থাকে, আবার যখন বাষ্পীয় যন্ত্রের বল হ্রস্ব হইয়া আইসে তখন এই চক্রের সমধিক গুরুতা প্রযুক্ত তাহার বল হঠাৎ হ্রস্ব না হওয়াতে তাহা হইতেই প্রয়োজনানুরূপ বল অক্ষে সঞ্চারিত হয়। ফলতঃ জড় পদার্থের যে স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চেষ্টতা গুণ আছে তাহাই যন্ত্রের কার্য্যকারিতার একমাত্র কারণ। উড্ডীন চক্রের প্রতিকৃতি ইহার পূর্ব্বে (২০৯ পৃষ্ঠে) আড়ার প্রতিকৃতির সঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে।

উপসংহার।

বাষ্পীয় যন্ত্রের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিবরণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে বলা হইয়াছে, এক্ষণে পুস্তকের শেষভাগে উক্ত যন্ত্রের একটী সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। ইহার 'চ' স্থানে চুল্লী 'খ' স্থানে বাষ্পীয় হাঁড়ি, 'গ' জল-মাপক, 'ঙ' বাষ্প-মাপক, 'ধ' স্থলে রক্ষ-রুবাট, 'বক' জল-নিয়ামক, 'থঘ' বাষ্পীয় নলী, 'ঝঝ' জলপ্রণালী, 'গ' চুঙ্গী, 'ত' অর্গলের মুখ, 'ঙথ' স্থলে সমান্তরাল-গতি-নিয়াম যন্ত্র, 'এঘ' অঙ্গ-সংঘাতক, 'ণ' বোমা, 'খকচ' আড়া, 'চদ' ক্রাঙ্ক, 'জজ' উড্ডীন চক্র, 'ছ' গবর্ণর, ইত্যাদি।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।



বাষ্পীয় যন্ত্র

শ্রীরামধন দাস সরকারের খোদিত কাং বেনিয়াটোলা হেদুয়ার দক্ষিণে দোকান